আল আ'রাফ

৭

নামকরণ

এ সূরার ৪৬ ও ৪৭নং আয়াতে (পঞ্চম রুকূ'তে) "আসহাবে আ'রাফ" বা আরাফবাসীদের উল্লেখ করা হয়েছে। সেই জন্য এর নামকরণ করা হয়েছে "আল আ'রাফ"। অন্য কথায় বলা যায়, এ সূরাকে সূরা আরাফ বলার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যে সূরার মধ্যে আ'রাফের কথা বলা হয়েছে, এটা সেই সূরা।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরার আলোচ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, এ সূরাটি সূরা আন'আমের প্রায় সমসময়ে নাযিল হয়। অবশ্য এটি আগে না আন'আম আগে নাযিল হয় তা নিশ্চয়তার সাথে চিহ্নিত করা যাবে না। তবে এ সূরায় প্রদত্ত ভাষণের বাচনভংগী থেকে এটি যে ঐ সময়ের সাথে সম্পর্কিত তা পরিষ্কার বুঝা যায়। কাজেই এর ঐতিহাসিক পটভূমি অনুধাবন করার জন্য সূরা আন'আমের শুরুতে যে ভূমিকা লেখা হয়েছে তার ওপর একবার নজর বুলিয়ে নেয়া যথেষ্ট হবে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার ভাষণের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত। আল্লাহ প্রেরিত রসূলের আনুগত্য করার জন্য শ্রোতাদেরকে উদ্বুদ্ধ করাই এর সমগ্র আলোচনার মৌল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু এ দাওয়াতে সতর্ক করার ও ভয় দেখানোর ভাবধারাই ফুটে উঠেছে বেশী করে। কারণ এখানে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে (অর্থাৎ মক্কাবাসী) তাদেরকে বুঝাতে বুঝাতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তাদের স্থূল শ্রবণ ও অনুধাবন শক্তি, হঠকারিতা, গোয়ার্তুমী ও একগুঁয়ে মনোভাব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। যার ফলে রসূলের প্রতি তাদেরকে সম্বোধন করা বন্ধ করে দিয়ে অন্যদেরকে সম্বোধন করার হুকুম অচিরেই নাযিল হতে যাচ্ছিল। তাই বুঝাবার ভংগীতে নবুওয়াত ও রিসালাতের দাওয়াত পেশ করার সাথে সাথে তাদেরকে একথাও জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, নবীর মোকাবিলায় তোমরা যে কর্মনীতি অবলম্বন করেছো তোমাদের আগের বিভিন্ন মানব সম্প্রদায়ও নিজেদের নবীদের সাথে অনুরূপ আচরণ অবলম্বন করে অত্যন্ত মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল। তারপর বর্তমানে যেহেতু তাদেরকে যুক্তি প্রমাণ সহকারে দাওয়াত দেবার প্রচেষ্টা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে চলেছে। তাই ভাষণের শেষ অংশে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আহলি কিতাবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

আর এক জায়গায় সারা দুনিয়ার মানুষকে সাধারণভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। এ থেকে এরূপ আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, এখন হিজরত নিকটবর্তী এবং নবীর জন্য তার নিকটতর লোকদেরকে সম্বোধন করার যুগ শেষ হয়ে আসছে।

এ ভাষণের এক পর্যায়ে ইহুদিদেরকেও 'সম্বোধন করা হয়েছে। তাই এই সাথে রিসালাত ও নবুওয়াতের দাওয়াতের আর একটি দিকও সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। নবীর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর সাথে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করার, আনুগত্য ও অনুসৃতির অংগীকার করার পর তা ভংগ করার এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাওয়ার পর মিথ্যার প্রতি সাহায্য সহযোগিতা দানের কাজে আপাদমস্তক ডুবে থাকার পরিণাম কি, তাও এতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

সূরার শেষের দিকে ইসলাম প্রচারের কৌশল সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীদের উত্তেজনা সৃষ্টি এবং নিপীড়ন ও দমনমূলক কার্যকলাপের মোকাবিলায় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন এবং আবেগ-উত্তেজনার বশে মূল উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করার জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

الٓمّٓصٓ ﴿১﴾ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿২﴾ اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿৩﴾ وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ﴿৪﴾ فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿৫﴾

আলিফ, লাম, মীম, সোয়াদ। এটি তোমার প্রতি নাযিল করা একটি কিতাব।[১] কাজেই তোমার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন সংকোচ না থাকে।[২] এটি নাযিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর মাধ্যমে তুমি (অস্বীকারকারীদেরকে) ভয় দেখাবে এবং মুমিনদের জন্য এটি হবে একটি স্মারক।[৩]

হে মানব সমাজ! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর যাকিছু নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করো এবং নিজেদের রবকে বাদ দিয়ে অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না।[৪] কিন্তু তোমরা খুব কমই উপদেশ মেনে থাকো।

কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের ওপর আমার আযাব অকস্মাত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাতের বেলা অথবা দিনের বেলা যখন তারা বিশ্রামরত ছিল। আর যখন আমার আযাব তাদের ওপর আপতিত হয়েছিল তখন তাদের মুখে এ ছাড়া আর কোন কথাই ছিল না যে, "সত্যিই আমরা জালেম ছিলাম।"[৫]

১. কিতাব বলতে এখানে এই সূরা আ'রাফকেই বুঝানো হয়েছে।

২. অর্থাৎ কোন প্রকার সংকোচ, ইতস্ততভাব ও ভীতি ছাড়াই একে মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। বিরুদ্ধবাদীরা একে কিভাবে গ্রহণ করবে তার কোন পরোয়া করবে না।

তারা ক্ষেপে যায় যাক, বিদ্রূপ করে করুক, নানান আজেবাজে কথা বলে বলুক এবং তাদের শত্রুতা আরো বেড়ে যায় যাক। তোমরা নিশ্চিন্তে ও নিসংকোচে তাদের কাছে এ পয়গাম পৌছিয়ে দাও। এর প্রচারে একটুও গড়িমসি করো না।

এখানে যে অর্থে আমরা সংকোচ শব্দটি ব্যবহার করেছি, মূল ইবারতে তার জন্য حرج শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'হারজ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, এমন একটি ঘন ঝোপঝাড়, যার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলা কঠিন। মনে 'হারজ' হবার মানে হচ্ছে এই যে, বিরোধিতা ও বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে নিজের পথ পরিষ্কার না দেখে মানুষের মন সামনে এগিয়ে চলতে পারে না, থেমে যায়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়বস্তুকে ضيق صدر শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ

"হে মুহাম্মাদ! আমি জানি এরা যেসব কথা বলে বেড়াচ্ছে তাতে তোমার মন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।" অর্থাৎ যারা জিদ, হঠকারিতা ও সত্য বিরোধিতায় এ পর্যায়ে নেমে এসেছে যে, তাদেরকে কিভাবে সোজা পথে আনা যাবে, এ চিন্তায় তুমি পেরেশান হয়ে পড়েছো। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَايُوْحَى اِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلاَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ (هود : ١٢)

"এমন যেন না হয় যে, তোমার দাওয়াতের জবাবে তারা তোমার কাছে কোন ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ হয়নি কেন? তোমার সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন? একথা বলবে ভেবে তুমি তোমার প্রতি নাযিল করা কোন কোন অহী প্রচার করা বাদ দিয়ে দেবে এবং বিব্রত বোধ করবে।"

৩. এর অর্থ হচ্ছে, এ সূরার আসল উদ্দেশ্য তো ভয় দেখানো। অর্থাৎ রসূলের দাওয়াত গ্রহণ না করার পরিণাম সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করা ও ভয় দেখানো এবং গাফেলদেরকে সজাগ করা। তবে এটি যে মুমিনদের জন্য স্মারকও, (অর্থাৎ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়) সেটি এর একটি আনুসঙ্গিক লাভ, ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে এটি আপনা আপনিই অর্জিত হয়ে যায়।

৪. এটি হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। এ ভাষণটিতে যে আসল দাওয়াত দেয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে ঃ দুনিয়ায় মানুষের জীবন যাপনের জন্য যে হেদায়াত ও পথ-নির্দেশনার প্রয়োজন, নিজের ও বিশ্বজাহানের স্বরূপ এবং নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুধাবন করার জন্য তার যে জ্ঞানের প্রয়োজন এবং নিজের আচার-আচরণ, চরিত্র-নৈতিকতা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারাকে সঠিক ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সে যেসব মূলনীতির মুখাপেক্ষী সেগুলোর জন্য তাকে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনকেই নিজের পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং আল্লাহ তাঁর রসূলদের মাধ্যমে যে হেদায়াত ও পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন একমাত্র তারই অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর দিকে পথ-নির্দেশনা লাভ করার

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾ فَلَنَقُصَّنَّ
عَلَيْهِم بِعِلْمٍ ۖ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿٧﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتْ
مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ
فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

কাজেই যাদের কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি তাদেরকে অবশ্যি জিজ্ঞাসাবাদ করবো[৬] এবং রসূলদেরকেও জিজ্ঞেস করবো (তারা পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্ব কতটুকু সম্পাদন করেছে এবং এর কি জবাব পেয়েছে)।[৭] তারপর আমি নিজেই পূর্ণ জ্ঞান সহকারে সমুদয় কার্যবিবরণী তাদের সামনে পেশ করবো। আমি তো আর সেখানে অনুপস্থিত ছিলাম না! আর ওজন হবে সেদিন যথার্থ সত্য।[৮] যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা নিজেরাই হবে নিজেদের ক্ষতি সাধনকারী।[৯] কারণ তারা আমার আয়াতের সাথে জালেম সুলভ আচরণ চালিয়ে গিয়েছিল।

তোমাদেরকে আমি ক্ষমতা-ইখতিয়ার সহকারে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য এখানে জীবন ধারণের উপকরণ সরবরাহ করেছি। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর গুজারী করে থাকো।

জন্য মুখ ফিরানো এবং তার নেতৃত্বের আওতায় নিজেকে সমর্পণ করা মানুষের একটি মৌলিক ভ্রান্ত কর্মপদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পরিণামে মানুষকে সব সময় ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তাকে সবসময় এই একই পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে।

এখানে "আউলিয়া" (অভিভাবকগণ) শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে, মানুষ সাধারণত যার নির্দেশে ও নেতৃত্বে চলে তাকে আসলে নিজের 'ওলি' তথা অভিভাবকে পরিণত করে। মুখে সে তার প্রশংসা করতে পারে বা তার প্রতি অভিশাপও বর্ষণ করতে পারে, আবার তার অভিভাবকত্বের স্বীকৃতি দিতে পারে বা কঠোরভাবে তা অস্বীকারও করতে পারে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আশ্‌শূরা, টীকা নং ৬)।

৫. অর্থাৎ তোমাদের শিক্ষার জন্য এমন সব জাতির দৃষ্টান্ত রয়েছে যারা আল্লাহর হেদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ ও শয়তানের নেতৃত্বে জীবন পথে এগিয়ে

চলেছে। অবশেষে তারা এমনভাবে বিপথগামী ও বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছে যার ফলে পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব এক দুঃসহ অভিশাপে পরিণত হয়েছে এবং আল্লাহর আযাব এসে তাদের নাপাক অস্তিত্ব থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করেছে।

শেষ বাক্যটির উদ্দেশ্য দু'টি বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া ঃ এক, সংশোধনের সময় অতিক্রান্ত হবার পর কারোর সচেতন হওয়া এবং নিজের ভুল স্বীকার করা অর্থহীন। যে ব্যক্তি ও জাতি গাফিলতিতে লিপ্ত ও ভোগের নেশায় মত্ত হয়ে স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে আল্লাহর দেয়া অবকাশ ও সুযোগ হারিয়ে বসে, সত্যের আহবায়কদের আওয়াজ যাদের অসচেতন কানের পর্দায় একটুও সাড়া জাগায় না এবং আল্লাহর হাত মজবুতভাবে পাকড়াও করার পরই যারা সচেতন হয় তাদের চাইতে বড় নাদান ও মূর্খ আর কেউ নেই। দুই, ব্যক্তি ও জাতিদের জীবনের দু'–একটি নয়, অসংখ্য দৃষ্টান্ত তোমাদের সামনে এসে গেছে। কারোর অসৎ কর্মের পেয়ালা যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং তার অবকাশের সীমা শেষ হয়ে যায় তখন অকস্মাৎ এক সময় আল্লাহ তাকে পাকড়াও করেন। আর আল্লাহ একবার কাউকে পাকড়াও করার পর আর তার মুক্তি লাভের কোন পথই থাকে না। তাছাড়া মানব জাতির ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এক দু'–বার নয়, শত শত বার, হাজার হাজার বার ঘটে গেছে। এ ক্ষেত্রে মানুষের জন্য বারবার সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করার যৌক্তিকতা কোথায়? সচেতন হবার জন্য সে কেনই বা সেই শেষ মুহূর্তেরই অপেক্ষা করতে থাকবে যখন কেবলমাত্র আক্ষেপ করা ও মর্মজ্বালা ভোগ করা ছাড়া সচেতন হবার আর কোন স্বার্থকতাই থাকে না।

৬. এখানে জিজ্ঞাসাবাদ বলতে কিয়ামতের হিসেব–নিকেশ বুঝানো হয়েছে। অসৎ ব্যক্তি ও জাতিদের ওপর দুনিয়ায় যেসব আযাব আসে সেগুলো আসলে তাদের অসৎকর্মের চূড়ান্ত ফল নয় এবং সেগুলো তাদের অপরাধের পূর্ণ শাস্তিও নয়। বরং এটাকে এ অবস্থার পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে যে, একজন অপরাধী স্বাধীনভাবে অপরাধ করে বেড়াচ্ছিল, তাকে অকস্মাত গ্রেফতার করে তার আরো বেশী জুলুম, অন্যায় ও ফিতনা–ফাসাদ সৃষ্টি করার সুযোগ ছিনিয়ে নেয়া হলো। মানব জাতির ইতিহাসে এ ধরনের গ্রেফতারীর অসংখ্য নজীর পাওয়া যায়। এ নজীরগুলো এ কথারই এক একটি সুস্পষ্ট আলামত যে, মানুষকে এ দুনিয়ায় যেখানে সেখানে চরে বেড়াবার এবং যাচ্ছে তাই করে বেড়াবার জন্য লাগামহীন উটের মতো স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়নি। বরং সবার ওপরে কোন এক শক্তি আছে যে একটি বিশেষ সীমারেখা পর্যন্ত তার রশি আলগা করে রাখে। অসৎ প্রবণতা থেকে ফিরে আসার জন্য একের পর এক সতর্ক সিগন্যাল দিয়ে যেতে থাকে। আর যখন দেখা যায়, সে কোনক্রমেই সৎ পথে ফিরে আসছে না তখন হঠাৎ এক সময় তাকে পাকড়াও করে ফেলে। তারপর এ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ওপর চিন্তা–ভাবনা করলে কোন ব্যক্তি সহজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে, এ বিশ্ব জাহানের ওপর যে শাসনকর্তার শাসন চলছে তিনি নিশ্চয়ই এমন একটি সময় নির্ধারিত করে রেখে থাকবেন যখন এসব অপরাধীদের বিচার করা হবে এবং নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। এ কারণে ওপরের যে আয়াতটিতে পার্থিব আযাবের কথা বলা হয়েছে, তাকে "কাজেই" শব্দটি দ্বারা পরবর্তী আয়াতের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ পার্থিব আযাব বার বার আসা যেন আখেরাতে জবাবদিহির নিশ্চয়তার একটি প্রমাণ।

৭. এ থেকে জানা গেলো, আখেরাতে জিজ্ঞাসাবাদ সরাসরি রিসালাতের ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হবে। একদিকে নবীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, মানব সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌছিয়ে দেবার জন্য তোমরা কি কি কাজ করেছো? অন্যদিকে যাদের কাছে, রসূলের দাওয়াত পৌছে গেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, এ দাওয়াতের সাথে তোমরা কি ব্যবহার করেছো? যেসব ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের কাছে নবীদের বাণী পৌছেনি তাদের মামলার নিষ্পত্তি কিভাবে হবে, সে সম্পর্কে কুরআন মজীদ আমাদের কিছুই বলেনি। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর ফায়সালা সংরক্ষিত করে রেখেছেন। কিন্তু যেসব ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের কাছে নবীদের শিক্ষা পৌছে গেছে তাদের সম্পর্কে কুরআন পরিষ্কার ঘোষণা করছে যে, তারা নিজেদের কুফরী, অবাধ্যতা, অস্বীকৃতি, ফাসেকী ও নাফরমানীর স্বপক্ষে কোন যুক্তি–প্রমাণ পেশ করতে পারবে না। আর লজ্জায়, আক্ষেপে ও অনুতাপে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে জাহান্নামের পথে এগিয়ে চলা ছাড়া কিয়ামতের দিন তাদের জন্য দ্বিতীয় কোন পথ থাকবে না।

৮. অর্থাৎ আল্লাহর ন্যায়ের তুলাদণ্ডে সেদিন 'ওজন' ও 'সত্য' হবে পরস্পরের সমার্থক। সত্য বা হক ছাড়া কোন জিনিসের সেখানে কোন ওজন থাকবে না। আর ওজন ছাড়াও কোন জিনিস সত্য সাব্যস্ত হবে না। যার সাথে যতটুকু সত্য থাকবে সে হবে ততটুকু ওজনদার ও ভারী। ওজনের পরিপ্রেক্ষিতেই সব কিছুর ফায়সালা হবে। অন্য কোন জিনিসের বিন্দুমাত্রও মর্যাদা ও মূল্য দেয়া হবে না। মিথ্যা ও বাতিলের স্থিতিকাল দুনিয়ায় যতই দীর্ঘ ও বিস্তৃত থাকুক না কেন এবং আপাতদৃষ্টিতে তার পেছনে যতই জাঁকজমক, শান–শওকত ও আড়ম্বর শোভা পাক না কেন, এ তুলাদণ্ডে তা একেবারেই ওজনহীন প্রমাণিত হবে। বাতিলপন্থীদেরকে যখন এ তুলাদণ্ডে ওজন করা হবে, তারা নিজেদের চোখেই দেখে নেবে দুনিয়ায় দীর্ঘকাল ধরে তারা যা কিছু করেছিল তার ওজন একটি মাছির ডানার সমানও নয়। সূরা কাহাফের শেষ তিনটি আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যারা দুনিয়ার জীবনে সবকিছু দুনিয়ারই জন্য করে গেছে এবং আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে এ ভেবে কাজ করেছে যে, পরকাল বলে কিছু নেই, কাজেই কারোর কাছে নিজের কাজের হিসেব দিতে হবে না, আখেরাতে আমি তাদের কার্যকলাপের কোন ওজন দেবো না।

৯. এ বিষয়টিকে এভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে যে, মানুষের জীবনের সমগ্র কার্যাবলী দু'টি অংশে বিভক্ত হবে। একটি ইতিবাচক বা সৎ কাজ এবং অন্যটি নেতিবাচক বা অসৎ কাজ। ইতিবাচক অংশের অন্তর্ভূক্ত হবে সত্যকে জানা ও মেনে নেয়া এবং সত্যের অনুসরণ করে সত্যের খাতিরে কাজ করা। আখেরাতে একমাত্র এটিই হবে ওজনদার, ভারী ও মূল্যবান। অন্যদিকে সত্য থেকে গাফিল হয়ে অথবা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ নিজের নফস–প্রবৃত্তি বা অন্য মানুষের ও শয়তানের অনুসরণ করে অসত্য পথে যা কিছুই করে, তা সবই নেতিবাচক অংশে স্থান লাভ করবে। আর এ নেতিবাচক অংশটি কেবল যে, মূল্যহীনই হবে তাই নয় বরং এটি মানুষের ইতিবাচক অংশের মর্যাদাও কমিয়ে দেবে।

কাজেই মানুষের জীবনের সমুদয় কার্যাবলীর ভাল অংশ যদি তার মন্দ অংশের ওপর বিজয় লাভ করে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে অনেক কিছু দেবার পরও তার হিসেবে কিছু না

وَلَقَدْ خَلَقْنَٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿١١﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّٰغِرِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ أَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾

২ রুকূ'

আমি তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করলাম তারপর তোমাদের আকৃতি দান করলাম অতপর ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো।[১০] এ নির্দেশ অনুযায়ী সবাই সিজদা করলো। কিন্তু ইবলীস সিজদাকারীদের অন্তরভুক্ত হলো না।

আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন। "আমি যখন তোকে হুকুম দিয়েছিলাম তখন সিজদা করতে তোকে বাধা দিয়েছিল কিসে"?

সে জবাব দিল ঃ "আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো এবং ওকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে।"

তিনি বললেন ঃ "ঠিক আছে, তুই এখান থেকে নীচে নেমে যা। এখানে অহংকার করার অধিকার তোর নেই। বের হয়ে যা। আসলে তুই এমন লোকদের অন্তরভুক্ত, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে লাঞ্ছিত করতে চায়।"[১১]

সে বললো ঃ "আমাকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যখন এদের সবাইকে পুনর্বার ওঠানো হবে।"

তিনি বললেন ঃ "তোকে অবকাশ দেয়া হলো।"

কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবেই আখেরাতে তার সাফল্য লাভ করা সম্ভব। আর যে ব্যক্তির জীবনের মন্দ কাজ তার সমস্ত ভাল কাজকে মূল্যহীন করে দেবে তার অবস্থা হবে সেই দেউলিয়া ব্যবসায়ীর মত যার সমুদয় পুঁজি ক্ষতিপূরণ ও দাবী পূরণ করতে করতেই শেষ হয়ে যায় এবং এরপরও কিছু কিছু দাবী তার জিম্মায় অনাদায়ী থেকে যায়।

১০. তুলনামূলক পাঠের জন্য সূরা বাকারার ৪ রুকূ' দেখুন (আয়াত ৩০ থেকে ৩৯)।

সূরা বাকারায় যেসব শব্দ সমন্বয়ে সিজদার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে সন্দেহ হতে পারে যে, নিছক এক ব্যক্তি হিসেবেই আদম আলাইহিস সালামের সামনে ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এখান থেকে সে সন্দেহ দূর হয়ে যায়। এখানে যে বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা থেকে পরিষ্কার জানা যায়, আদম আলাইহিস সালামকে আদম হিসেবে নয় বরং মানব জাতির প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে সিজদা করানো হয়েছিল।

আর "আমি তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করলাম তারপর তোমাদের আকৃতিদান করলাম অতপর ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো" একথার অর্থ হচ্ছে আমি প্রথমে তোমাদের সৃষ্টির পরিকল্পনা প্রণয়ন করলাম, তোমাদের সৃষ্টির মৌলিক উপাদান তৈরী করলাম তারপর সেই উপাদানকে মানবিক আকৃতি দান করলাম অতপর আদম যখন একজন জীবিত মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো তখন তাকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিলাম। কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও এ আয়াতটির এরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন সূরা "সোয়াদ"–এর পঞ্চম রুকূ'তে বলা হয়েছে ঃ

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ۝ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝

"সেই সময়ের কথা চিন্তা করো যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি মাটি থেকে একটি মানুষ তৈরী করবো। তারপর যখন আমি সেটি পুরোপুরি তৈরী করে ফেলবো এবং তার মধ্যে নিজের রূহ থেকে কিছু ফুঁকে দেবো তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদানত হবে।"

এ আয়াতটিতে ঐ তিনটি পর্যায় বর্ণিত হয়েছে অন্য এক ভংগীমায়। এখানে বলা হয়েছে ঃ প্রথমে মাটি থেকে একটি মানুষ সৃষ্টি করা হবে, তারপর তার "তাসবীয়া" করা হবে অর্থাৎ তাকে আকার–আকৃতি দান করা হবে এবং তার দেহ–সৌষ্ঠব ও শক্তি–সামর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে এবং সবশেষে নিজের রূহ থেকে কিছু ফুঁকে দিয়ে আদমকে অস্তিত্ব দান করা হবে। এ বিষয়বস্তুটিকেই সূরা হিজ্‌র–এর তৃতীয় রুকূ'তে নিম্নলিখিত শব্দাবলীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۝ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝

"আর সেই সময়টির কথা ভাবো যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে একটি মানুষ সৃষ্টি করবো, তারপর যখন তাকে পুরোপুরি তৈরী করে ফেলবো এবং তার মধ্যে নিজের রূহ থেকে কিছু ফুঁকে দেবো তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদানত হবে।"

মানব সৃষ্টির এ সূচনা পর্বের বিস্তারিত অবস্থা অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে কঠিন। মাটির পিণ্ড থেকে কিভাবে মানুষ বানানো হলো তারপর কিভাবে তাকে আকার আকৃতি

দান ও তার মধ্যে ভাবসাম্য কায়েম করা হলো এবং তার মধ্যে প্রাণ বায়ু ফুঁকে দেবার ধরনটিই বা কি ছিল—এসবের পূর্ণ তাৎপর্য বিশ্লেষণ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও একথা সুস্পষ্ট যে, বর্তমান যুগে ডারউইনের অনুসারীরা বিজ্ঞানের নামে যেসব মতবাদ পেশ করছে মানব সৃষ্টির সূচনা পর্বের অবস্থা সম্পর্কে কুরআন মজীদ তার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অবস্থার বর্ণনা দিয়েছে। এসব মতবাদের দৃষ্টিতে মানুষ একটি সম্পূর্ণ অমানবিক বা অর্ধমানবিক অবস্থার বিভিন্ন স্তর থেকে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে মানবিক স্তরে উপনীত হয়েছে। আর এ ক্রমবিবর্তন ধারার সুদীর্ঘ পথে এমন কোন বিশেষ বিন্দু নেই যেখান থেকে অমানবিক অবস্থার ইতি ঘোষণা করে মানব জাতির সূচনা হয়েছে বলে দাবী করা যেতে পারে। বিপরীত পক্ষে কুরআন আমাদের জানাচ্ছে, মানব বংশধারার সূচনা হয়েছে নির্ভেজাল মানবিক অস্তিত্ব থেকেই। কোন অমানবিক ধারার সাথে তার ইতিহাসের কোন কালেও কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রথম দিন থেকে তাকে মানুষ হিসেবেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। আল্লাহ পরিপূর্ণ মানবিক চেতনা সহকারে পূর্ণ আলোকে তার পার্থিব জীবনের সূচনা করেছিলেন।

মানুষের ইতিহাস সম্পর্কে এ দু'টি ভিন্ন ধর্মী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ সম্পর্কে দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী চিন্তাধারার উদ্ভব হয়। একটি চিন্তাধারা মানুষকে জীব-জন্তু ও পশু জগতের একটি শাখা হিসেবে পেশ করে। তার জীবনের সমস্ত আইন-কানুন এমন কি নৈতিক ও চারিত্রিক আইনের জন্যও মূলনীতির সন্ধান করা হয় ইতর প্রাণীসমূহের জীবন রীতিতে ও পশুদের জীবন ধারায়। তার জন্য পশুদের ন্যায় কর্মপদ্ধতি একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতি মনে হয়। সেখানে মানবিক কর্মপদ্ধতি ও পাশবিক কর্মপদ্ধতির মধ্যে বড় জোর এতটুকু পার্থক্য দেখার প্রত্যাশা করা হয় যে, মানুষ যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, শিল্প-সভ্যতা-সংস্কৃতির সূক্ষ্ম ও নিপুন কারুকার্য অবলম্বনে কাজ করে। পক্ষান্তরে পশুরা কাজ করে ঐসবের সহায়তা ছাড়াই। বিপরীত পক্ষে অন্য চিন্তাধারাটি মানুষকে পশুর পরিবর্তে "মানুষ" হিসেবেই উপস্থাপন করে। সেখানে মানুষ "বাকশক্তি সম্পন্ন পশু" বা "সামাজিক ও সংস্কৃতিবান জন্তু" (Social animal) নয় বরং পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। সেখানে বাকশক্তি বা সামাজিকতাবোধ তাকে অন্যান্য জীব ও প্রাণী থেকে আলাদা করে না। বরং তাকে আলাদা করে তার নৈতিক দায়িত্ব এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ার যা আল্লাহ তাকে দান করেছেন এবং যার ভিত্তিতে তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। এভাবে এখানে মানুষ ও তার সাথে সম্পৃক্ত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ পূর্ববর্তী দৃষ্টিকোণটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। এখানে মানুষের জন্য অন্য একটি জীবন দর্শন এবং অন্য একটি নৈতিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক জীবন ও আইন বিধানের প্রত্যাশা করা হবে। এ জীবন দর্শন ও নৈতিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মূলনীতি অনুসন্ধান করার জন্য মানুষের দৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিম্ন জগতের পরিবর্তে উর্ধ জগতের দিকে উঠতে থাকবে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, মানুষ সম্পর্কিত এ দ্বিতীয় ধারণাটি নৈতিক ও মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে যতই উন্নত পর্যায়ের হোক না কেন, নিছক কল্পনার ওপর নির্ভর করে যুক্তি-তথ্য দ্বারা প্রমাণিত একটি মতাবাদকে কেমন করে রদ করা যেতে পারে? কিন্তু যারা এ ধরনের প্রশ্ন করেন, তাদের কাছে আমার পাল্টা প্রশ্ন, সত্যিই কি ডারউইনের বিবর্তনবাদ বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তথ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত? বিজ্ঞান সম্পর্কে নিছক ভাসা ভাসা

قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَءَاتِيَنَّهُم مِّنۢ
بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ
أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ
مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾ وَيَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ
وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ
فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُۥرِىَ
عَنْهُمَا مِن سَوْءَٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ
أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَٰلِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّى لَكُمَا
لَمِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ ﴿٢١﴾

সে বললো ঃ "তুমি যেমন আমাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছো তেমনি আমিও এখন তোমার সরল–সত্য পথে এ লোকদের জন্য ওঁত পেতে বসে থাকবো, সামনে–পেছনে, ডাইনে–বাঁয়ে, সবদিক থেকে এদেরকে ঘিরে ধরবো এবং এদের অধিকাংশকে তুমি শোকর গুজার পাবে না।"[১২]

আল্লাহ বললেন ঃ "বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও ধিকৃত অবস্থায়। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখিস, এদের মধ্য থেকে যারাই তোর অনুসরণ করবে তাদেরকে এবং তোকে দিয়ে আমি জাহান্নাম ভরে দেবো। আর হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী তোমরা দু'জনাই এ জান্নাতে থাকো। যেখানে যা তোমাদের ইচ্ছা হয় খাও, কিন্তু এ গাছটির কাছে যেয়ো না, অন্যথায় তোমরা জালেমদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।"

তারপর তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের পরস্পর থেকে গোপন রাখা হয়েছিল, তাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল। সে তাদেরকে বললো ঃ "তোমাদের রব যে, তোমাদের এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করেছেন তার পেছনে এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, পাছে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাও অথবা তোমরা চিরন্তন জীবনের অধিকারী হয়ে পড়ো।" আর সে কসম খেয়ে তাদেরকে বললো, আমি তোমাদের যথার্থ কল্যাণকামী।

ও স্থূল জ্ঞান রাখে এমন ধরনের লোকেরা অবশ্যি এ মতবাদকে একটি প্রমাণিত তাত্বিক সত্য মনে করার ভ্রান্তিতে লিপ্ত। কিন্তু বিশেষজ্ঞ ও অনুসন্ধান বিশারদরা জানেন, গুটিকয় শব্দ ও হাড়গোড়ের লম্বা চওড়া ফিরিস্তি সত্ত্বেও এখনো এটি একটি মতবাদের পর্যায়েই রয়ে গেছে এবং এর যেসব যুক্তি–তথ্যকে ভুলক্রমে প্রামাণ্য বলা হচ্ছে সেগুলো নিছক সম্ভাব্যতার যুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ সেগুলোর ভিত্তিতে বড় জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, ডারউইনের বিবর্তনবাদের সম্ভাবনা ঠিক ততটুকুই যতটুকু সম্ভাবনা আছে সরাসরি সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে এক একটি শ্রেণীর পৃথক অস্তিত্ব লাভের।

১১. মূলে صَاغِرِيْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। صَاغِرٌ মানে হচ্ছে লাঞ্ছনা ও অবমাননার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেই লাঞ্ছনা, অবমাননা ও নিকৃষ্টতর অবস্থা অবলম্বন করে। কাজেই আল্লাহর বাণীর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর বান্দা ও সৃষ্টি হয়েও তোমার অহংকারে মত্ত হওয়া এবং তুমি নিজের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের যে ধারণা নিজেই তৈরী করে নিয়েছো তার দৃষ্টিতে তোমার রবের হুকুম তোমার জন্য অবমাননাকর মনে হওয়া ও সে জন্য তা অমান্য করার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তুমি নিজেই নিজেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতে দাও। শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা অহমিকা, মর্যাদার ভিত্তিহীন দাবী এবং কোন জন্মগত ও স্বতসিদ্ধ অধিকার ছাড়াই নিজেকে অযথা শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন মনে করা তোমাকে বড়, শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাশালী করতে পারে না। বরং এর ফলে তুমি মিথ্যুক লাঞ্ছিত ও অপমানিতই হবে এবং তোমার এ লাঞ্ছনা ও অবমাননার কারণ হবে তুমি নিজেই।

১২. এটি ছিল ইবলীসের চ্যালেঞ্জ। সে আল্লাহকে এ চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল। তার এ বক্তব্যের অর্থ ছিল এই যে, তুমি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত এই যে অবকাশ দিয়েছো তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে আমি একথা প্রমাণ করার জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করবো যে, তুমি মানুষকে আমার মোকাবিলায় যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছো সে তার যোগ্য নয়। মানুষ যে কতবড় নাফরমান, নিমক হারাম ও অকৃতজ্ঞ তা আমি দেখিয়ে দেবো।

শয়তান যে অবকাশ চেয়েছিল এবং আল্লাহ তাকে যে অবকাশ দিয়েছিলেন সেটি নিছক সময়ের অবকাশ ছিল না বরং সে যে কাজ করতে চাচ্ছিল সে কাজটি করার সুযোগও এর অন্তরভুক্ত ছিল। অর্থাৎ তার দাবী ছিল, মানুষকে বিভ্রান্ত করে তার দুর্বলতাসমূহকে কাজে লাগিয়ে তাকে অযোগ্য প্রমাণ করার সুযোগ দিতে হবে। এ সুযোগ আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। সূরা বনী ইসরাঈলের সপ্তম রুকূ'তে (আয়াত ৬১–৬৫) এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেখানে আল্লাহ শয়তানকে এ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দেবার কথা বলেছেন যে, আদমকে ও তার সন্তান–সন্ততিদেরকে সত্য–সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য সে নিজের ইচ্ছা মত যে কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারে। এসব কৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রে তাকে কোন প্রকার বাধা দেয়া হবে না। বরং যেসব পথে সে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে সেই সমস্ত পথই খোলা থাকবে। কিন্তু এই সংগে এ শর্তটিও জুড়ে দেয়া হয়েছে–

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

অর্থাৎ "আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।" তুমি কেবল এতটুকু করতে পারবে, তাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারবে। মিথ্যা আশার ছলনে ভুলাতে পারবে, অসৎ কাজ ও গোমরাহীকে সুশোভন করে তাদের সামনে পেশ

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ٚ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٥﴾

এভাবে প্রতারণা করে সে তাদের দু'জনকে ধীরে ধীরে নিজের পথে নিয়ে এলো। অবশেষে যখন তারা সেই গাছের ফল আস্বাদন করলো, তাদের লজ্জা স্থান পরস্পরের সামনে খুলে গেলো এবং তারা নিজেদের শরীর ঢাকতে লাগলো জান্নাতের পাতা দিয়ে।

তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললো ঃ "আমি কি তোমাদের এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি এবং তোমাদের বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?"

তারা দু'জন বলে উঠলো ঃ "হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। এখন যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি রহম না করো, তাহলে নিসন্দেহে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।"[১৩]

তিনি বললেন ঃ "নেমে যাও,[১৪] তোমরা পরস্পরের শত্রু এবং তোমাদের জন্য একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত পৃথিবীতেই রয়েছে বসবাসের জায়গা ও জীবন যাপনের উপকরণ।" আর বললেন ঃ "সেখানেই তোমাদের জীবন যাপন করতে এবং সেখানেই মরতে হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের সবশেষে আবার বের করে আনা হবে।

পারবে, ভোগের আনন্দ ও স্বার্থের লোভ দেখিয়ে তাদেরকে ভুল পথের দিকে আহবান জানাতে পারবে। কিন্তু তাদের হাত ধরে জবরদস্তি তাদেরকে তোমার পথের দিকে টেনে আনবে এবং তারা যদি সত্য–সঠিক পথে চলতে চায় তাহলেও তুমি তা থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে, সে ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হবে না। সূরা ইবরাহীমের চতুর্থ রুকূ'তেও এ

একই কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালত থেকে ফায়সালা শুনিয়ে দেবার পর শয়তান তার অনুসারী মানুষদেরকে বলবে ঃ

وَمَا كَانَ لِىْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ فَلَا تَلُوْمُوْنِىْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ-

"তোমাদের ওপর আমার তো কোন জবরদস্তি ছিল না, আমার অনুসরণ করার জন্য আমি তোমাদের বাধ্য করিনি। আমি তোমাদেরকে আমার পথের দিকে আহবান জানিয়েছিলাম, এর বেশী আমি কিছুই করিনি। আর তোমরা আমার আহবান গ্রহণ করেছিলে। কাজেই এখন আমাকে তিরস্কার করো না বরং তোমাদের নিজেদেরকেই তিরস্কার করো।"

আর শয়তান যে এখানে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যে, তুমিই আমাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছো, এর অর্থ হচ্ছে এই যে, শয়তান নিজের গোনাহের দায়–দায়িত্ব আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। তার অভিযোগ হচ্ছে, আদমের সামনে সিজদা করার হুকুম দিয়ে তুমি আমাকে বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছো এবং আমার আত্মাভিমান ও আত্মম্ভরিতায় আঘাত দিয়ে আমাকে এমন অবস্থার সম্মুখীন করেছো যার ফলে আমি তোমার নাফরমানী করেছি। অন্য কথায় বলা যায়, নির্বোধ শয়তান চাচ্ছিল, তার মনের গোপন ইচ্ছা যেন ধরা না পড়ে। বরং যে মিথ্যা অহমিকা ও বিদ্রোহ সে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল, তাকে সে পর্দার অন্তরালে সংগোপন করে রাখতে চাচ্ছিল। এটা ছিল একটা হীন ও নির্বোধসুলভ আচরণ। এহেন আচরণের জবাব দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাই মহান আল্লাহ তার এ অভিযোগের আদৌ কোন গুরুত্বই দেননি।

১৩. এ কাহিনীটি থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় ঃ

এক ঃ লজ্জা মানুষের একটি প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক অনুভূতি। মানুষ নিজের শরীরের বিশেষ স্থানগুলোকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করার ব্যাপারে প্রকৃতিগতভাবে যে লজ্জা অনুভব করে সেটি ঐ স্বাভাবিক অনুভূতির প্রাথমিক প্রকাশ। কুরআন আমাদের জানায়, সভ্যতার ক্রমোন্নতির ফলে মানুষের মধ্যে কৃত্রিমভাবে এ লজ্জার সৃষ্টি হয়নি বা এটি বাইরের থেকে অর্জিত কোন জিনিসও নয়, যেমন শয়তানের কোন কোন সুচতুর শিষ্য ও অনুসারী অনুমান করে থাকে। বরং জন্মের প্রথম দিন থেকেই এ প্রকৃতিগত গুণটি মানুষের মধ্যে রয়েছে।

দুইঃ মানুষকে তার স্বভাবসুলভ সোজা–সরল পথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য শয়তানের প্রথম কৌশলটি ছিল তার এ লজ্জার অনুভূতিতে আঘাত করা, উলংগতার পথ দিয়ে তার জন্য নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার দরজা খুলে দেয়া এবং যৌন বিষয়ে তাকে খারাপ পথে পরিচালিত করা। অন্য কথায় বলা যায়, প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য তার যে দুর্বলতম স্থানটিকে সে বেছে নিয়েছিল সেটি ছিল তার জীবনের যৌন বিষয়ক দিক। যে লজ্জাকে মানবীয় প্রকৃতির দুর্গরক্ষক হিসেবে মহান আল্লাহ নিযুক্ত করেছিলেন তারই ওপর হেনেছে সে প্রথম আঘাতটি। শয়তান ও তার শিষ্যবর্গের এ কর্মনীতি আজো

অপরিবর্তিত রয়েছে। মেয়েদেরকে উলংগ করে প্রকাশ্য বাজারে না দাঁড় করানো পর্যন্ত তাদের "প্রগতি"র কোন কার্যক্রম শুরুই হতে পারে না।

তিন ঃ অসৎকাজ করার প্রকাশ্য আহবানকে মানুষ খুব কমই গ্রহণ করে, এটাও মানুষের স্বভাবসুলভ প্রবণতা। সাধারণত তাকে নিজের জালে আবদ্ধ করার জন্য তাই প্রত্যেক অসৎকর্মের আহবায়ককে কল্যাণকামীর ছদ্মবেশে আসতে হয়।

চার ঃ মানুষের মধ্যে উচ্চতর বিষয়াবলী যেমন মানবিক পর্যায় থেকে উন্নতি করে উচ্চতর মার্গে পৌছার বা চিরন্তন জীবনলাভের স্বাভাবিক আকাংখা থাকে। আর শয়তান তাকে ধোঁকা দেবার ক্ষেত্রে প্রথম সাফল্য অর্জন করে এ পথেই। সে মানুষের এ আকাংখাটির কাছে আবেদন জানায়। শয়তানের সবচেয়ে সফল অস্ত্র হচ্ছে, সে মানুষের সামনে তাকে উন্নতির উচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়ার এবং বর্তমান অবস্থা থেকে উন্নততর অবস্থায় পৌছিয়ে দেবার টোপ ফেলে, তারপর তাকে এমন পথের সন্ধান দেয়, যা তাকে নীচের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

পাঁচ ঃ সাধারণভাবে একথাটি প্রচলিত হয়ে গেছে যে, শয়তান প্রথমে হযরত হাওয়াকে তার প্রতারণা জালে আবদ্ধ করে, তারপর হযরত আদমকে জালে আটকাবার জন্য তাকে ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু কুরআন এ ধারণা খণ্ডন করে। কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে, শয়তান তাদের উভয়কেই ধোঁকা দেয় এবং তারা উভয়েই শয়তানের ধোঁকায় বিভ্রান্ত হয়। আপাতদৃষ্টিতে এটা একটা মামুলী কথা বলে মনে হয়। কিন্তু যারা জানেন, হযরত হাওয়া সম্পর্কিত এ সাধারণ্যে প্রচলিত বক্তব্যটি সারা দুনিয়ায় নারীর নৈতিক, সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা হ্রাস করার ক্ষেত্রে কত বড় ভূমিকা পালন করেছে একমাত্র তারাই কুরআনের এ বর্ণনার যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

ছয় ঃ এরূপ ধারণা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই যে, নিষিদ্ধ গাছের এমন কোন বিশেষ গুণ ছিল, যে কারণে তার ফল মুখে দেবার সাথে সাথেই হযরত আদম ও হাওয়ার লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে গিয়েছিল। আসলে এটি কেবল আল্লাহর নাফরমানীরই ফলশ্রুতি ছিল। আল্লাহ ইতিপূর্বে নিজের ব্যবস্থাপনায় তাদের লজ্জাস্থান আবৃত করেছিলেন। তারা তাঁর নির্দেশ অমান্য করার সাথে সাথেই তিনি তাদের ওপর থেকে নিজের হেফাজত ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে নিয়েছিলেন, তাদের আবরণ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তারা যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে নিজেরাই নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করার ব্যবস্থা করুক। এ কাজের দায়িত্ব তাদের নিজেদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর যদি তারা প্রয়োজন মনে না করে অথবা এ জন্য প্রচেষ্টা না চালায় তাহলে তারা যেভাবেই বিচরণ করুক না কেন, তাতে আল্লাহর কিছু এসে যায় না। এভাবে যেন চিরকালের জন্য এ সত্যটি প্রকাশ করে দেয়া হলো যে, মানুষ আল্লাহর নাফরমানী করলে একদিন না একদিন তার আবরণ উন্মুক্ত হয়ে যাবেই এবং মানুষের প্রতি আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা ততদিন থাকবে যতদিন সে থাকবে আল্লাহর হুকুমের অনুগত। আনুগত্যের সীমানার বাইরে পা রাখার সাথে সাথেই সে আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে পারবে না। বরং তখন তাকে তার নিজের হাতেই সঁপে দেয়া হবে। বিভিন্ন হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে তিনি দোয়া করেছেন।

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমতের আশা করি। কাজেই এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের হাতে সোপর্দ করে দিয়ো না।"

সাত ঃ শয়তান একথা প্রমাণ করতে চাচ্ছিল যে, তার মোকাবিলায় মানুষকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে সে তার যোগ্য নয়। কিন্তু প্রথম মোকাবিলায় সে পরাজিত হলো। সন্দেহ নেই, এ মোকাবিলায় মানুষ তার রবের নির্দেশ মেনে চলার ব্যাপারে পূর্ণ সফলকাম হতে পারেনি এবং তার এ দুর্বলতাটিও প্রকাশ হয়ে পড়লো যে, তার পক্ষে নিজের প্রতিপক্ষের প্রতারণা জালে আবদ্ধ হয়ে তার আনুগত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া সম্ভব। কিন্তু এ প্রথম মোকাবিলায় একথাও চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, মানুষ তার নৈতিক মর্যাদার দিক দিয়ে একটি উন্নত ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। প্রথমত শয়তান নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার ছিল। আর মানুষ নিজে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেনি বরং শ্রেষ্ঠত্ব তাকে দান করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত শয়তান নির্জলা অহংকার ও আত্মম্ভরিতার ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে। অন্যদিকে মানুষ স্বেচ্ছায় ও স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেনি। বরং শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে এতে প্রবৃত্ত হয়। অসৎকাজের প্রকাশ্য আহবানে সে সাড়া দেয়নি। বরং অসৎকাজের আহবায়ককে সৎকাজের আহবায়ক সেজে তার সামনে আসতে হয়েছিল। সে নীচের দিকে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে নীচের দিকে যায়নি বরং এ পথটি তাকে উপরের দিকে নিয়ে যাবে এ ধোঁকায় পড়ে সে নীচের দিকে যায়। তৃতীয়ত শয়তানকে সতর্ক করার পর সে নিজের ভুল স্বীকার করে বন্দেগীর দিকে ফিরে আসার পরিবর্তে নাফরমানীর ওপর আরো বেশী অবিচল হয়ে যায়। অন্যদিকে মানুষকে তার ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করে দেবার পর সে শয়তানের মত বিদ্রোহ করেনি বরং নিজের ভুল বুঝতে পারার সাথে সাথেই লজ্জিত হয়ে পড়ে, নিজের ত্রুটি স্বীকার করে, বিদ্রোহ থেকে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজের রবের রহমতের ছত্রছায়ায় আশ্রয় খুঁজতে থাকে।

আট ঃ এভাবে শয়তানের পথ ও মানুষের উপযোগী পথ দু'টি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। আল্লাহর বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাঁর মোকাবিলায় বিদ্রোহের ঝাণ্ডা বুলন্দ করা, সতর্ক করে দেয়া সত্বেও সগর্বে নিজের বিদ্রোহাত্মক কর্মপদ্ধতির ওপর অটল হয়ে থাকা এবং যারা আল্লাহর আনুগত্যের পথে চলে তাদেরকেও বিভ্রান্ত ও প্ররোচিত করে গোনাহ ও নাফরমানীর পথে টেনে আনার চেষ্টা করাই হচ্ছে নির্ভেজাল শয়তানের পথ। বিপরীত পক্ষে মানুষের উপযোগী পথটি হচ্ছে ঃ প্রথমত শয়তানের প্ররোচনা ও অপহরণ প্রচেষ্টার মোকাবিলা করতে হবে। তার এ প্রচেষ্টায় বাধা দিতে হবে। নিজের শত্রুর চাল ও কৌশল বুঝতে হবে এবং তার হাত থেকে বাঁচার জন্য সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু এরপর যদি কখনো তার পা বন্দেগী ও আনুগত্যের পথ থেকে সরেও যায় তাহলে নিজের ভুল উপলব্ধি করার সাথে সাথেই লজ্জায় অধোবদন হয়ে তাকে নিজের রবের দিকে ফিরে আসতে হবে এবং নিজের অপরাধ ও ভুলের প্রতিকার ও সংশোধন করতে হবে। এ কাহিনী থেকে মহান আল্লাহ এ মৌল শিক্ষাটিই দিতে চান। এখানে মানুষের মনে তিনি একথাগুলো বদ্ধমূল করে দিতে চান যে, তোমরা যে পথে চলছো সেটি শয়তানের পথ। এভাবে আল্লাহর হেদায়াতের পরোয়া না করে জিন ও

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۭ
وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۭ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ
يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ
الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۭ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ
مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۭ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۗءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

৩ রুকূ'

হে বনী আদম![১৫] তোমাদের শরীরের লজ্জাস্থানগুলো ঢাকার এবং তোমাদের দেহের সংরক্ষণ ও সৌন্দর্য বিধানের উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের জন্য পোশাক নাযিল করেছি। আর তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম, সম্ভবত লোকেরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে আবার ঠিক তেমনিভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ না করে যেমনভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল এবং তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত করে দেবার জন্য তাদেরকে বিবস্ত্র করেছিল। সে ও তার সাথীরা তোমাদেরকে এমন জায়গা থেকে দেখে যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। এ শয়তানদেরকে আমি যারা ঈমান আনে না তাদের অভিভাবক করে দিয়েছি।[১৬]

মানুষের মধ্যকার শয়তানদেরকে নিজেদের বন্ধু ও অভিভাবকে পরিণত করা এবং ক্রমাগত সতর্ক বাণী উচ্চারণ করার পরও তোমাদের এভাবে নিজেদের ভুলের ওপর অবিচল থাকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া মূলত নির্ভেজাল শয়তানী কর্মনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা নিজেদের আদি ও চিরন্তন দুশমনের ফাঁদে আটকা পড়েছো। এবং তার কাছে পূর্ণ পরাজয় বরণ করছো। শয়তান যে পরিণতির মুখোমুখি হতে চলছে, তোমাদের এ বিভ্রান্তির পরিণামও তাই হবে। যদি তোমরা সত্যিই নিজেরা নিজেদের শত্রু না হয়ে গিয়ে থাকো এবং তোমাদের মধ্যে সামান্যতম চেতনাও থেকে থাকে, তাহলে তোমরা নিজেদের ভুল শুধরিয়ে নাও, সতর্ক হয়ে যাও এবং তোমাদের বাপ আদম ও মা হাওয়া পরিশেষে যে পথ অবলম্বন করেছিলেন তোমরাও সেই একই পথ অবলম্বন করো।

১৪. হযরত আদম ও হযরত হাওয়া আলাইহিমাস সালামকে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার এ হুকুম দেয়া হয়েছিল শাস্তি হিসেবে—এরূপ ধারণা পোষণ করার কোন কারণ নেই। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ

তাঁদের তাওবা কবুল করে: এবং তাঁদেরকে মা'ফ করে দেন। কাজেই এ নির্দেশের মধ্যে শাস্তির কোন ব্যাপার থাকতে পারে না। বরং যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এর মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যটিই পূর্ণ হয়েছে। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আল বাকারার ৪৮ ও ৫৩ নম্বর টীকা)।

১৫. এবার আদম ও হাওয়ার ঘটনার একটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরববাসীদের সামনে তাদের নিজেদের জীবনে শয়তানী ভ্রষ্টতা–প্রতারণার একটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট প্রভাবের প্রতি অংগুলী নির্দেশ করা হয়েছে। তারা কেবলমাত্র সৌন্দর্য সামগ্রী হিসেবে ও বিভিন্ন ঋতুর প্রভাব থেকে শারীরিকভাবে আত্মরক্ষা করার জন্য পোশাক ব্যবহার করতো। কিন্তু এর যে প্রাথমিক ও মৌলিক উদ্দেশ্য শরীরের লজ্জাস্থানগুলোকে আবৃত করা, সেটি তাদের কাছে কোন গুরুত্ব লাভ করেনি। নিজেদের লজ্জাস্থানগুলোকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করে দিতে তারা মোটেই ইতস্তত করতো না। প্রকাশ্য স্থানে উলংগ হয়ে গোসল করা, পথে ঘাটে যেখানে সেখানে প্রকাশ্য জায়গায় প্রকৃতির ডাকে উদোম হয়ে বসে পড়া, পরণের কাপড় খুলে পড়ে যেতে এবং লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যেতে থাকলেও তার পরোয়া না করা ইত্যাদি ছিল তাদের প্রতিদিনের অভ্যাস। সবচেয়ে মারাত্মক ছিল হজ্জের সময় তাদের অসংখ্য লোকের কাবার চারদিকে উলংগ হয়ে তাওয়াফ করা। এ ব্যাপারে তাদের পুরষদের চেয়ে মেয়েরাই ছিল কিছু বেশী নির্লজ্জ। তাদের দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি ধর্মীয় কাজ এবং সৎকাজ মনে করেই তারা এটি করতো। আর যেহেতু এটি কেবল আরবদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল না বরং দুনিয়ার অধিকাংশ জাতি এ নির্লজ্জ বেহায়াপনায় লিপ্ত ছিল এবং আজো আছে, তাই এখানে কেবলমাত্র আরববাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়নি বরং ব্যাপকভাবে সারা দুনিয়ার মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে সমগ্র মানব জাতিকে এই বলে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে, দেখো শয়তানী প্রতারণার একটি সুস্পষ্ট আলামত তোমাদের নিজেদের জীবনেই রয়েছে। তোমরা নিজেদের রবের পথনির্দেশনার তোয়াক্কা না করে এবং নিজেদের নবী–রসূলদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেরাই নিজেদেরকে শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছো। আর সে তোমাদেরকে মানবিক প্রকৃতির পথ থেকে বিচ্যুত করে সেই একই নির্লজ্জতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে যার মধ্যে ইতিপূর্বে সে তোমাদের প্রথম পিতা–মাতাকে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল। এ ব্যাপারে চিন্তা করলে প্রকৃত সত্য তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে। অর্থাৎ রসূলদের নেতৃত্ব ও পথনির্দেশনা ছাড়া তোমরা নিজেদের প্রকৃতির প্রাথমিক দাবীগুলো পর্যন্তও বুঝতে এবং তা পূর্ণ করতে অক্ষম।

১৬. এ আয়াতগুলোতে যে কথাগুলো বলা হয়েছে তা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে সামনে ভেসে উঠেছে ঃ

এক ঃ পোশাক মানুষের জন্য কোন কৃত্রিম জিনিস নয়। বরং এটি মানব প্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবী। আল্লাহ মানুষের দেহের বহির্ভাগে পশুদের মত কোন লোমশ আচ্ছাদন জন্মগতভাবে তৈরী করে দেননি। বরং লজ্জার অনুভূতি তার প্রকৃতির মধ্যে গচ্ছিত রেখে দিয়েছেন। তিনি মানুষের যৌন অংগগুলোকে কেবলামাত্র যৌনাংগ হিসেবেই তৈরী করেননি বরং এগুলোকে "সাওআত"ও বানিয়েছেন। আরবী ভাষায় "সাওআত" এমন

জিনিসকে বলা হয় যার প্রকাশকে মানুষ খারাপ মনে করে। আবার এ প্রকৃতিগত লজ্জার দাবী পূরণ করার জন্য তিনি মানুষকে কোন তৈরী করা পোশাক দেননি। বরং তার প্রকৃতিকে পোশাক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেছেন, (اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا) যাতে নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করে সে প্রকৃতির এ দাবীটি উপলব্ধি করতে পারে এবং আল্লাহর সৃষ্ট উপাদান ও উপকরণসমূহ কাজে লাগিয়ে নিজের জন্য পোশাক তৈরী করতে সক্ষম হয়।

দুই ঃ এ প্রাকৃতিক ও জন্মগত উপলব্ধির প্রেক্ষিতে মানুষের জন্য পোশাকের নৈতিক প্রয়োজনই অগ্রগণ্য। অর্থাৎ প্রথমে সে 'সাওআত' তথা নিজের লজ্জাস্থান আবৃত করবে। আর তার স্বভাবগত চাহিদা ও প্রয়োজন দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ তারপর তার পোশাক তার জন্য 'রীশ' অর্থাৎ তার দৈহিক সৌন্দর্য বিধান করবে এবং আবহাওয়ার প্রভাব থেকে তার দেহ সৌষ্ঠবকে রক্ষা করবে। এ পর্যায়েও মানুষ ও পশুর ব্যাপার স্বভাবতই সম্পূর্ণ ভিন্ন। পশুর শরীরের লোমশ আচ্ছাদন মূলত তার জন্য "রীশ' অর্থাৎ তার শরীরের শোভা বর্ধন ও ঋতুর প্রভাব থেকে তাকে রক্ষা করে। তার লোমশ আচ্ছাদন তার লজ্জাস্থান ঢাকার কাজ করে না। কারণ তার যৌনাংগ আদতে তার "সাওআত" বা লজ্জাস্থান নয়। কাজেই তাকে আবৃত করার জন্য পশুর স্বভাব ও প্রকৃতিতে কোন অনুভূতি ও চাহিদা থাকে না এবং তার চাহিদা পূরণ করার উদ্দেশ্যে তার জন্য কোন পোশাকও সৃষ্টি করা হয় না। কিন্তু মানুষ যখন শয়তানের নেতৃত্ব গ্রহণ করলো তখন ব্যাপারটি আবার উল্টে গেলো। শয়তান তার এ শিষ্যদেরকে এভাবে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হলো যে, তোমাদের জন্য পোশাকের প্রয়োজন পশুদের জন্য পোশাকের প্রয়োজনের সমপর্যায়ভুক্ত, আর পোশাক দিয়ে লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার ব্যাপারটি মোটেই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বরং পশুদের অংগ–প্রত্যংগ যেমন তাদের লজ্জাস্থান হিসেবে বিবেচিত হয় না, ঠিক তেমনি তোমাদের এ অংগ–প্রত্যংগগুলোও লজ্জাস্থান নয় বরং এগুলো নিছক যৌনাংগ।

তিন ঃ মানুষের পোশাক কেবলমাত্র তার লজ্জাস্থান আবৃত করার এবং তার শারীরিক শোভাবর্ধন ও দেহ সংরক্ষণের উপায় হবে, এতটুকুই যথেষ্ট নয়। বরং আসলে এ ব্যাপারে তাকে অন্তত এতটুকু মহত্তর মানে পৌঁছতে হবে, যার ফলে তার পোশাক তাকওয়ার পোশাকে পরিণত হয়। অর্থাৎ তার পোশাক দিয়ে সে পুরোপুরি 'সতর' তথা লজ্জাস্থান ঢেকে ফেলবে। সৌন্দর্য চর্চা ও সাজসজ্জার মাধ্যমে শরীরের শোভা বর্ধন করার ক্ষেত্রে তা সীমা অতিক্রম করে যাবে না বা ব্যক্তির মর্যাদার চেয়ে নিম্ন মানেরও হবে না। তার মধ্যে গর্ব, অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কোন প্রদর্শনী থাকবে না। আবার এমন কোন মানসিক রোগের প্রতিফলনও তাতে থাকবে না যার আক্রমণের ফলে পুরুষ নারীসুলভ আচরণ করতে থাকে, নারী করতে থাকে পুরুষসুলভ আচরণ এবং এক জাতি নিজেকে অন্য এক জাতির সদৃশ বানাবার প্রচেষ্টায় নিজেই নিজের হীনতা ও লাঞ্ছনার জীবন্ত প্রতীকে পরিণত হয়। যেসব লোক নবীদের প্রতি ঈমান এনে নিজেদেরকে পুরোপুরি আল্লাহর পথনির্দেশনার আওতাধীন করে দেয়নি তাদের পক্ষে পোশাকের ব্যাপারে এ কাংখিত মহত্তর মানে উপনীত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যখন তারা আল্লাহর পথনির্দেশনা গ্রহণে অসম্মতি জানায় তখন শয়তানদেরকে তাদের পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক বানিয়ে দেয়া হয় এবং এ শয়তানরা তাদেরকে কোন না কোনভাবে ভুল–ভ্রান্তি ও অসৎকাজে লিপ্ত করেই ছাড়ে।

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ
قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾
قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ
وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ
عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, আমাদের বাপ–দাদাদেরকে আমরা এভাবেই করতে দেখেছি এবং আল্লাহই আমাদের এমনটি করার হুকুম দিয়েছেন।[১৭] তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ কখনো নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার হুকুম দেন না।[১৮] তোমরা কি আল্লাহর নাম নিয়ে এমন কথা বলো যাকে তোমরা আল্লাহর কথা বলে জানো না? হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও, আমার রব তো সততা ও ইনসাফের হুকুম দিয়েছেন। তাঁর হুকুম হচ্ছে, প্রত্যেক ইবাদাতে নিজের লক্ষ্য ঠিক রাখো এবং নিজের দীনকে একান্তভাবে তাঁর জন্য করে নিয়ে তাঁকেই ডাকো। যেভাবে তিনি এখন তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের আবার সৃষ্টি করা হবে।[১৯] একটি দলকে তিনি সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন কিন্তু অন্য দলটির ওপর গোমরাহী সত্য হয়ে চেপেই বসেছে। কারণ তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানদেরকে নিজেদের অভিভাবকে পরিণত করেছে এবং তারা মনে করছে, আমরা সঠিক পথেই আছি।

হে বনী আদম! প্রত্যেক ইবাদাতের সময় তোমরা নিজ নিজ সুন্দর সাজে সজ্জিত হও।[২০] আর খাও ও পান করো কিন্তু সীমা অতিক্রম করে যেয়ো না, আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।[২১]

চার ঃ দুনিয়ার চারদিকে আল্লাহর যেসব অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে এবং যেগুলো মহাসত্যের সন্ধানলাভের ব্যাপারে মানুষকে সাহায্য করে, পোশাকের ব্যাপারটিও তার অন্যতম। তবে এখানে শর্ত হচ্ছে, মানুষের নিজের তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ওপরে আমি যেসব সত্যের দিকে ইংগিত করেছি সেগুলোকে একটু গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে পোশাক কোন্ দৃষ্টিতে আল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন তা সহজেই অনুধাবন করা যেতে পারে।

১৭. এখানে আরববাসীদের উলংগ অবস্থায় কাবা শরীফ তাওয়াফ করার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। একটি ধর্মীয় কাজ মনে করেই তারা এটি করতো। তারা মনে করতো, আল্লাহ তাদেরকে এমনটি করার হুকুম দিয়েছেন।

১৮. আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি অতি সংক্ষিপ্ত বাক্য। কিন্তু আসলে এর মধ্যে কুরআন মজীদ উলংগ তাওয়াফকারীদের জাহেলী আকীদার বিরুদ্ধে একটি মস্তবড় যুক্তি পেশ করেছে। এ যুক্তি উপস্থাপন পদ্ধতিটি অনুধাবন করতে হলে ভূমিকা স্বরূপ দু'টি কথা অবশ্যি বুঝে নিতে হবে ঃ

এক ঃ আরববাসীরা যদিও নিজেদের কোন কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের সময় উলংগ হতো এবং একে একটি পবিত্র ধর্মীয় কাজ মনে করতো। কিন্তু উলংগ হওয়াটাকে তারা এমনিতে একটি লজ্জাজনক কাজ বলে মনে করতো এবং এটি তাদের নিকট স্বীকৃত ছিল। তাই কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্র ও অভিজাত আরব কোন সংস্কৃতিবান মজলিসে বা কোন বাজারে অথবা নিজের আত্মীয়–স্বজনদের মধ্যে উলংগ হওয়াটাকে কোনক্রমেই পছন্দ করতো না।

দুই ঃ উলংগপনাকে লজ্জাজনক জানা সত্ত্বেও তারা একটি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে নিজেদের ইবাদাতের সময় উলংগ হতো। আর যেহেতু নিজেদের ধর্মকে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ধর্ম বলে মনে করতো তাই তারা মনে করতো এ আনুষ্ঠানিকতাটিও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। এরই ভিত্তিতে কুরআন মজীদ এখানে এ যুক্তি উপস্থাপন করেছে যে, যে কাজটি অশ্লীল এবং যাকে তোমরা নিজেরাও অশ্লীল বলে জানো ও স্বীকার করো সে সম্পর্কে তোমরা কেমন করে একথা বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ এর হুকুম দিয়ে থাকবেন? আল্লাহর পক্ষ থেকে কখনো কোন অশ্লীল কাজের হুকুম আসতে পারে না। আর যদি তোমাদের ধর্মে এমন কোন হুকুম পাওয়া যায় তাহলে তোমাদের ধর্ম যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়, এটিই তার অকাট্য প্রমাণ।

১৯. এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের এসব অর্থহীন রীতি–আনুষ্ঠানিকতার সাথে আল্লাহর দীনের কি সম্পর্ক? তিনি যে দীনের শিক্ষা দিয়েছেন তার মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ মানুষের নিজের জীবনকে সত্য, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

দুই ঃ ইবাদাতের ক্ষেত্রে সঠিক লক্ষ্যের ওপর অবিচল থাকতে হবে অর্থাৎ তার ইবাদাতে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর বন্দেগীর সামান্যতম স্পর্শও থাকবে না। আসল মাবুদ আল্লাহর দিকে ফিরে ছাড়া আর কোন দিকে ফিরে তার আনুগত্য, দাসত্ব, হীনতা ও দীনতার সামান্যতম প্রকাশও ঘটতে পারবে না।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ
قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ
كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ
مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ
أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

৪ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব সৌন্দর্য সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো কে হারাম করেছে? আর আল্লাহর দেয়া পবিত্র জিনিসগুলো কে নিষিদ্ধ করেছে?[২২] বলো, দুনিয়ার জীবনেও এ সমস্ত জিনিস ঈমানদারদের জন্য, আর কিয়ামতের দিনে এগুলো তো একান্তভাবে তাদেরই জন্য হবে।[২৩] এভাবে যারা জ্ঞানের অধিকারী তাদের জন্য আমার কথাগুলো আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করে থাকি।

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন সেগুলো হচ্ছে ঃ প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা,[২৪] গোনাহ,[২৫] সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি,[২৬] আল্লাহর সাথে তোমাদের কাউকে শরীক করা, যার স্বপক্ষে তিনি কোন সনদ পাঠাননি এবং আল্লাহর নামে তোমাদের এমন কোন কথা বলা, যা মূলত তিনি বলেছেন বলে তোমাদের জানা নেই।

প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। তারপর যখন কোন জাতির সময় পূর্ণ হয়ে যাবে তখন এক মুহূর্তকালের জন্যও তাকে বিলম্বিত বা ত্বরান্বিত করা হবে না।[২৭]

তিন ঃ পথনির্দেশনা, সাহায্য, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষকতা, হেফাজত ও সংরক্ষণের জন্য একমাত্র আল্লাহরই কাছে দোয়া চাইতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, এসব বিষয়ের জন্য দোয়া প্রার্থীকে পূর্বাহ্নেই নিজের দীনকে একান্তভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে। জীবনের সমগ্র ব্যবস্থা কুফরী, শিরক, গোনাহ ও অন্যের বন্দেগীর ভিত্তিতে পরিচালিত

হবে। কিন্তু সাহায্য চাওয়া হবে আল্লাহর কাছে এ বলে, 'হে আল্লাহ! তোমার বিরুদ্ধে আমার এ বিদ্রোহে আমাকে সাহায্য করো', এমনটি যেন না হয়।

চার ঃ এ মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, এ দুনিয়ায় সে যেভাবে জন্ম নিয়েছে ঠিক তেমনিভাবে অন্য একটি জগতেও তার জন্ম হবে এবং সেখানে আল্লাহর কাছে তার সমস্ত কাজের হিসেব দিতে হবে।

২০. এখানে সুন্দর সাজ বলতে পূর্ণ পোশাক–পরিচ্ছদের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য দাঁড়াবার সময় কেবল মাত্র লজ্জাস্থান ঢাকাই যথেষ্ট হবে না বরং একই সংগে সামর্থ অনুযায়ী নিজের পূর্ণ পোশাক পরে নিতে হবে, যার মাধ্যমে লজ্জাস্থান আবৃত হবার সাথে সাথে সৌন্দর্যের প্রকাশও ঘটবে। মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা নিজেদের ভ্রান্তনীতির ভিত্তিতে ইবাদাতের ক্ষেত্রে যেসব কাজ করতো এবং এখনো করে চলছে, এ নির্দেশে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা মনে করতো উলংগ বা অর্ধ–উলংগ হয়ে এবং নিজেদের আকার আকৃতি ও বেশভূষা বিকৃত করে আল্লাহর ইবাদাত করা উচিত। আল্লাহ বলেন, নিজেকে সুন্দর সাজে সজ্জিত করে এমন আকার আকৃতি ধারণ করে ইবাদাত করতে হবে যার মধ্যে উলংগপনা তো দূরের কতা অশ্লীলতার লেশমাত্রও যেন না পাওয়া যায়।

২১. অর্থাৎ তোমাদের দৈন্যদশা, অনাহারক্লিষ্ট জীবন এবং হালাল জীবিকা থেকে বঞ্চিত থাকা আল্লাহর কাছে প্রিয় নয়। তাঁর বন্দেগী করার জন্য তোমাদের কোন পর্যায়ে এসবের শিকার হতে হোক—এটা তিনি চান না। বরং তোমরা তাঁর দেয়া উত্তম পোশাক পরলে এবং পবিত্র ও হালাল খাবার খেলে তিনি খুশী। মানুষ যখন হালালকে হারাম করার বা হারামকে হালাল করার জন্য তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে তখনি সেটা তাঁর শরীয়াতে আসল গোনাহ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

২২. এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তো তাঁর দুনিয়ার সমস্ত শোভা–সৌন্দর্য এবং সমস্ত পাক–পবিত্র জিনিস তাঁর বান্দাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। কাজেই এগুলো বান্দাদের জন্য হারাম করে দেয়া কখনো তাঁর উদ্দেশ্য হতে পারে না। এখন যদি কোন ধর্ম বা নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা এগুলোকে হারাম, ঘৃণ্য অথবা আত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক গণ্য করে তাহলে তার এ কাজটিই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সেটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি। বাতিল ধর্মমতগুলোর বিরুদ্ধে কুরআন যেসব যুক্তি–প্রমাণ পেশ করেছে এটি তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি। বস্তুত কুরআনের যুক্তি উপস্থাপন পদ্ধতি অনুধাবন করার জন্য এ যুক্তিটি অনুধাবন করা একান্ত অপরিহার্য।

২৩. অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সৃষ্ট সমস্ত জিনিস দুনিয়ার জীবনেও ঈমানদারদের জন্যই। কারণ তারাই আল্লাহর বিশ্বস্ত প্রজা। আর একমাত্র নিমকহালাল, বিশ্বস্ত ও অনুগত লোকেরাই অনুগ্রহলাভের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু দুনিয়ার বর্তমান ব্যবস্থাপনা যেহেতু পরীক্ষা ও অবকাশদানের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাই এখানে অধিকাংশ সময় আল্লাহর অনুগ্রহগুলো নিমকহারাম ও অকৃতজ্ঞদের মধ্যেও বন্টিত হতে থাকে। আর অনেক সময় বিশ্বস্ত ও নিমকহালালদের তুলনায় তাদের ওপরই বেশী অনুগ্রহ বর্ষণ করা হয়ে থাকে। তবে আখেরাত (যেখানকার সমস্ত ব্যবস্থাপনা হক, সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِى ۙ
فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٣٥ وَٱلَّذِينَ
كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ٣٦ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ
بِـَٔايَٰتِهِۦٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمْ
رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوٓا۟ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُوا۟
ضَلُّوا۟ عَنَّا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَٰفِرِينَ ٣٧

(আর সৃষ্টির সূচনাপর্বেই আল্লাহ একথা পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন ঃ) হে বনী আদম! মনে রেখো, যদি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে কোন রসূল এসে তোমাদেরকে আমার আয়াত শুনাতে থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকবে এবং নিজের কর্মনীতির সংশোধন করে নেবে, তার কোন ভয় এবং দুঃখের কারণ নেই। আর যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলবে এবং তার সাথে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করবে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।[২৮] একথা সুস্পষ্ট, যে ব্যক্তি ডাহা মিথ্যা কথা বানিয়ে আল্লাহর কথা হিসেবে প্রচার করে অথবা আল্লাহর সত্য আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে? এ ধরনের লোকেরা নিজেদের তকদীরের লিখন অনুযায়ী তাদের অংশ পেতে থাকবে,[২৯] অবশেষে সেই সময় উপস্থিত হবে যখন আমার পাঠানো ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করার জন্য তাদের কাছে এসে যাবে। সে সময় তারা (ফেরেশতারা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, বলো, এখন তোমাদের সেই মাবুদরা কোথায়, যাদেরকে তোমরা ডাকতে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে? তারা বলবে, "সবাই আমাদের কাছ থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে" এবং তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, বাস্তবিক পক্ষেই তারা সত্য অস্বীকারকারী ছিল।

হবে) জীবনের আরাম আয়েশের সমস্ত উপকরণ এবং সমস্ত পবিত্র খাদ্য ও পানীয় একমাত্র অনুগত, কৃতজ্ঞ ও নিমকহালাল বান্দাদের জন্যই নির্ধারিত থাকবে। যেসব

নিমকহারাম বান্দা তাদের রবের দেয়া খাদ্য–পানীয়ে জীবন ধারণ করার পরও তাঁরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়েছে তারা এর থেকে কোন অংশই পাবে না।

২৪. বাখ্যার জন্য সূরা আন'আমের ১২৮ ও ১৩১ টীকা দেখুন।

২৫. এখানে মূল শব্দ হচ্ছে اثم (ইস্‌ম)। এর আসল অর্থ হচ্ছে, ত্রুটি–বিচ্যুতি। اثمة এমন এক ধরনের উটনীকে বলা হয়, যে দ্রুত চলতে পারে কিন্তু জেনে বুঝে অলসভাবে চলে। এ থেকেই এ শব্দের মধ্যে গোনাহের ভাবধারা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ যখন নিজের রবের আনুগত্য করার ও তাঁর হুকুম মেনে চলার ক্ষমতা ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও গড়িমসি ও গাফলতী করে এবং জেনে বুঝে ভুল–ত্রুটি করে তাঁর সন্তুষ্টিলাভে অসমর্থ হয়, তখন সেই আচরণটিকেই গোনাহ বলা হয়।

২৬. অর্থাৎ নিজের সীমানা অতিক্রম করে এমন একটি সীমানায় পদার্পণ করা যেখানে প্রবেশ করার অধিকার মানুষের নেই। এ সংজ্ঞার আলোকে বিচার করলে যারা বন্দেগীর সীমানা পেরিয়ে আল্লাহর রাজ্যে স্বেচ্ছাচারী মনোভাব ও আচরণ গ্রহণ করে, যারা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে থেকেও নিজেদের অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের ডংকা বাজায় এবং যারা মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, তারা সবাই বিদ্রোহী গণ্য হয়।

২৭. অবকাশের সময় নির্দিষ্ট করার মানে এ নয়, যে, প্রত্যেক জাতির জন্য বছর, মাস, দিন ধরে একটি আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট করা হয় এবং এ সময়টি শেষ হয়ে যেতেই তাকে অবশ্যিই খতম করে দেয়া হয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক জাতিকে দুনিয়ায় কাজ করার যে সুযোগ দেয়া হয়, তার কর্মকাণ্ডের মধ্যে ভাল ও মন্দের আনুপাতিক হার কমপক্ষে কতটুকু বরদাশত করা যেতে পারে, এ অর্থে তার কাজ করার একটি নৈতিক সীমানা চিহ্নিত করা হয়। যতদিন একটি জাতির মন্দ গুণগুলো তার ভাল গুণাবলীর তুলনায় ঐ আনুপাতিক হারের সর্বশেষ সীমার মধ্যে অবস্থান করতে থাকে ততদিন তাকে তার সমস্ত অসৎকর্ম সত্ত্বেও অবকাশ দেয়া হয়, আর যখন তা ঐ সর্বশেষ সীমানা পার হয়ে যায় তখন এ ধরনের অসৎ বৃত্তিসম্পন্ন ও অসৎকর্মশীল জাতিকে আর কোন বাড়তি অবকাশ দেয়া হয় না। (সূরা নূহের ৪–১০–১২ আয়াত দ্রষ্টব্য)।

২৮. কুরআন মজীদের যেখানেই আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামের জান্নাত থেকে নামিয়ে দেবার ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। (যেমন দেখুন সূরা আল বাকারার ৪ রুকূ ও সূরা তা–হা–এর ৬ রুকূ) সেখানেই একথা বলা হয়েছে। কাজেই এখানেও এটিকে এই একই ঘটনার সাথে সম্পর্কিত মনে করা হবে। অর্থাৎ যখন মানব জাতির জীবনের সূচনা হচ্ছিল ঠিক তখনই একথাটি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল। (দেখুন সূরা আলে ইমরান, ৬৯ টীকা)।

২৯. অর্থাৎ দুনিয়ায় যতদিন তাদের অবকাশের মেয়াদ নির্ধারিত থাকবে ততদিন তারা এখানে থাকবে এবং যে ধরনের ভাল বা মন্দ জীবন যাপন করার কথা তাদের নসীবে লেখা থাকবে, সেই ধরনের জীবন তারা যাপন করবে।

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ۭ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ۭ حَتّٰٓي اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَاۗءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ڛ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ۝৩৮ وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝৩৯

আল্লাহ বলবেন ঃ যাও, তোমারাও সেই জাহান্নামে চলে যাও, যেখানে চলে গেছে তোমাদের পূর্বের অতিক্রান্ত জিন ও মানবগোষ্ঠী। প্রত্যেকটি দলই নিজের পূর্ববর্তী দলের প্রতি অভিসম্পাত করতে করতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অবশেষে যখন সবাই সেখানে একত্র হয়ে যাবে তখন পরবর্তী প্রত্যেকটি দল পূর্ববর্তী দলের ব্যাপারে বলবে, হে আমাদের রব! এরাই আমাদের গোমরাহ করেছে, কাজেই এদেরকে আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি দাও। জওয়াবে বলা হবে, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ শাস্তিই রয়েছে কিন্তু তোমরা জানো না।[৩০] প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলকে বলবে ঃ (যদি আমরা দোষী হয়ে থাকি) তাহলে তোমরা 'কোন্ দিক দিয়ে আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলে? এখন নিজেদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।[৩১]

৩০. অর্থাৎ সর্বাবস্থায় তোমাদের প্রত্যেকটি দল কোন না কোন দলের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী দল ছিল। কোন দলের পূর্ববর্তী দল উত্তরাধিকার হিসেবে যদি তার জন্য ভুল ও বিপথগামী চিন্তা ও কর্ম রেখে গিয়ে থাকে, তাহলে সে নিজেও তো তার পরবর্তীদের জন্য একই ধরনের উত্তরাধিকার রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। যদি একটি দলের পথভ্রষ্ট হবার কিছুটা দায়–দায়িত্ব তার পূর্ববর্তীদের ওপর বর্তায়। তাহলে তার পরবর্তীদের পথভ্রষ্ট হবার বেশ কিছু দায়–দায়িত্ব তার নিজের ওপরও বর্তায়। তাই বলা হয়েছে, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ শাস্তিই রয়েছে। একটি শাস্তি হচ্ছে, নিজে ভুল পথ অবলম্বনের এবং অন্য শাস্তিটি অন্যদেরকে ভুল পথ দেখাবার। একটি শাস্তি নিজের অপরাধের এবং অন্য শাস্তিটি অন্যদের জন্য পূর্বাহ্নেই অপরাধের উত্তরাধিকার রেখে আসার।

এ বিষয়বস্তুটিকে হাদীসে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلَ اٰثَامِ مَّنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا –

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূল অপছন্দ করেন এমন কোন নতুন বিভ্রান্তিকর কাজের সূচনা করে, তার ঘাড়ে সেই সমস্ত লোকের পথভ্রষ্টতার গোনাহও চেপে বসবে। যারা তার উদ্ভাবিত পথে চলেছে। তবে এ জন্য ঐ লোকদের নিজেদের দায়-দায়িত্ব মোটেই লাঘব হবে না।"

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلَّا كَانَ عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ –

"এই দুনিয়ায় যে ব্যক্তিকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, সেই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের পাপের একটি অংশ হযরত আদমের সেই প্রথম সন্তানটির আমলনামায় লিখিত হয়, যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল। কারণ মানুষ হত্যার পথ সে-ই সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করেছিল।"

এ থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি বা দল কোন ভুল চিন্তা বা কর্মনীতির ভিত্ রচনা করে সে কেবল নিজের ভুলের ও গোনাহের জন্য দায়ী হয় না বরং দুনিয়ায় যতগুলো লোক তার দ্বারা প্রভাবিত হয় তাদের সবার গোনাহের দায়িত্বের একটি অংশও তার আমলনামায় লিখিত হতে থাকে। যতদিন তার এ গোনাহের প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে ততদিন তার আমলনামায় গোনাহ লিখিত হতে থাকে। তাছাড়া এ থেকে একথাও জানা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নেকী বা গোনাহের দায়-দায়িত্ব কেবল তার নিজের ওপরই বর্তায় না বরং অন্যান্য লোকদের জীবনে তার নেকী ও গোনাহের কি প্রভাব পড়ে সে জন্যও তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ একজন ব্যভিচারীর কথাই ধরা যাক। যাদের শিক্ষা ও অনুশীলনের দোষে, যাদের সাহচর্যের প্রভাবে, যাদের খারাপ দৃষ্টান্ত দেখে এবং যাদের উৎসাহ দানের ফলে ঐ ব্যক্তির মধ্যে যিনা করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়, তারা সবাই তার যিনাকারী হয়ে গড়ে ওঠার ব্যাপারে অংশীদার। আবার ঐ লোকগুলোও পূর্ববর্তী যেসব লোকদের কাছ থেকেই কুদৃষ্টি, কুচিন্তা, কুসংকল্প ও কুকর্মের প্ররোচনা উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করে তাদের কাঁধে পর্যন্তও তার দায়-দায়িত্ব গিয়ে পৌঁছায়। এমন কি এ ধারা অগ্রসর হতে হতে সেই প্রথম ব্যক্তিতে গিয়ে ঠেকে যে সর্বপ্রথম ভ্রান্ত পথে যৌন লালসা চরিতার্থ করে মানব জাতিকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিল। এ যিনাকারীর আমলনামার এ অংশটি তার সমকালীনদের ও পূর্ববর্তী লোকদের সাথে সম্পর্কিত। এছাড়া সে নিজেও নিজের যিনা ও ব্যভিচারের জন্য দায়ী। তাকে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, তাকে যে বিবেকবোধ দান করা হয়েছিল, আত্মসংযমের যে শক্তি তার মধ্যে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল, সৎলোকদের কাছ থেকে সে ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের যে জ্ঞান লাভ করেছিল, তার সামনে সৎলোকদের যেসব দৃষ্টান্ত সমুজ্জ্বল ছিল, যৌন

অসদাচারের অশুভ পরিণামের ব্যাপারে তার যেসব তথ্য জানা ছিল—সে সবের কোনটিকেও সে কাজে লাগায়নি। উপরন্তু সে নিজেকে কামনা–বাসনার এমন একটি অন্ধ আবেগের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছিল যে কোন প্রকারে নিজের আকাংখা চরিতার্থ করাই ছিল যার অভিপ্রায়। তার আমলনামার এ অংশটি তার নিজের সাথে সম্পর্কিত। তারপর এ ব্যক্তি যে গোনাহ নিজে করেছে এবং যাকে স্বকীয় প্রচেষ্টায় লালন করে চলেছে, তাকে অন্য লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। কোথাও থেকে কোন যৌন রোগের জীবাণু নিজের মধ্যে বহন করে আনে, তারপর তাকে নিজের বংশধরদের মধ্যে এবং নাজানি আরো যে কত শত বংশদরদের মধ্যে ছড়িয়ে কত শত লোকদের জীবন ধ্বংস করে তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। কোথাও নিজের শুক্রবীজ রেখে আসে। যে শিশুটির লালন–পালনের দায়িত্ব তারই বহন করা উচিত ছিল, তাকে অন্য একজনের উপার্জনের অবৈধ অংশীদার, তার সন্তানদের অধিকার থেকে জোরপূর্বক হিস্‌সা গ্রহণকারী এবং তার উত্তরাধিকারে অবৈধ শরীক বানিয়ে দেয়। এ অধিকার হরণের ধারা চলতে থাকে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত। কোন কুমারী মেয়েকে ফুসলিয়ে ব্যভিচারের পথে টেনে আনে এবং তার মধ্যে এমন অসৎ গুণাবলী সৃষ্টি করে যা তার থেকে অন্যদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে নাজানি আরো কত দূর, কত পরিবার ও কত বংশধরদের মধ্যে পৌঁছে যায় এবং কত পরিবারে বিকৃতি আনে। নিজের সন্তান–সন্তুতি, আত্মীয়–স্বজন, বন্ধু–বান্ধব ও সমাজের অন্যান্য লোকদের সামনে সে নিজের চরিত্রের একটি কুদৃষ্টান্ত পেশ করে এবং অসংখ্য লোকের চরিত্র নষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে এর প্রভাব চলতে থাকে দীর্ঘকালব্যাপী। ইনসাফের দাবী হচ্ছে, এ ব্যক্তি সমাজ দেহে যেসব বিকৃতি সৃষ্টি করলো সেগুলো তারই আমলনামায় লিখিত হওয়া উচিত এবং ততদিন পর্যন্ত লিখিত হওয়া উচিত যতদিন তার সরবরাহ করা অসৎ বৃত্তি ও অসৎকাজের ধারা দুনিয়ায় চলতে থাকে।

সৎকাজ ও পুণ্যকর্মের ব্যাপারটিও অনুরূপ। আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে আমরা নেকীর ও সৎকাজের যে উত্তরাধিকার লাভ করেছি তার প্রতিদান তাদের সবার পাওয়া উচিত, যারা সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে আমাদের যুগ পর্যন্ত এগুলো আমাদের কাছে হস্তান্তর করার ব্যাপারে অংশ নিয়েছেন। এ উত্তরাধিকার নিয়ে তাকে সযত্নে হেফাজত করার ও তার উন্নতি বিধানের জন্য আমরা যেসব প্রচেষ্টা চালাবো ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবো তার প্রতিদান আমাদেরও পাওয়া উচিত। তারপর নিজেদের সৎ প্রচেষ্টার যেসব চিহ্ন ও প্রভাব আমরা দুনিয়ায় রেখে যাবো সেগুলোও আমাদের সৎকাজের হিসেবের খাতায় ততদিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে লিখিত হওয়া উচিত যতদিন এ চিহ্ন ও প্রভাবগুলো দুনিয়ার বুকে অক্ষত থাকবে, মানব জাতির বংশধরদের মধ্যে এর ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকূল এর দ্বারা লাভবান হতে থাকবে।

প্রতিটি বিবেকবান ব্যক্তিই একথা স্বীকার করবেন যে, কুরআন মজীদ প্রতিদানের এই যে পদ্ধতি উপস্থাপন করেছে একমাত্র এ পদ্ধতিতেই সঠিক ও পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ সত্যটি ভালভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হলে যারা প্রতিদানের জন্য এ দুনিয়ার বর্তমান জীবনকেই যথেষ্ট মনে করেছে এবং যারা মনে করেছে যে, জন্মান্তরের মাধ্যমে মানুষকে তার কাজের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া যেতে পারে তাদের সবার

বিভ্রান্তিও সহজে দূর হয়ে যেতে পারে। আসলে এ উভয় দলই মানুষের কার্যকলাপ, তার প্রভাব, ফলাফল ও পরিণতির ব্যাপ্তি এবং ন্যায়সংগত প্রতিদান ও তার দাবীসমূহ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। একজন লোকের বয়স এখন ষাট বছর। সে তার এ ষাট বছরের জীবনে ভাল–মন্দ যা কিছু কাজ করেছে নাজানি উপরের দিকে কত দূর পর্যন্ত তার পূর্ব–পুরুষরা এ কাজের সাথে জড়িত এবং তাদের ওপর এর দায়িত্ব বর্তায়। আর তাদেরকে এর পুরস্কার বা শাস্তি দান করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তারপর এ ব্যক্তি আজ যে ভাল বা মন্দ কাজ করছে তার মৃত্যু সাথে সাথেই তা বন্ধ হয়ে যাবে না বরং তার প্রভাব চলতে থাকবে আগামী শত শত বছর পর্যন্ত। হাজার হাজার, লাখো লাখো বরং কোটি কোটি মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে। এর প্রভাব চলা ও বিস্তৃত হওয়া পর্যন্ত তার আমলনামার পাতা খোলা থাকবে। এ অবস্থায় আজই এ দুনিয়ার জীবনে এ ব্যক্তিকে তার উপার্জনের সম্পূর্ণ ফসল প্রদান করা কেমন করে সম্ভব? কারণ তার উপার্জনের এক লাখ ভাগের এক ভাগও এখনো অর্জিত হয়নি। তাছাড়া এ দুনিয়ার সীমিত জীবন ও এর সীমিত সম্ভাবনা আদতে এমন কোন অবকাশই রাখেনি যার ফলে এখানে কোন ব্যক্তি তার উপার্জনের পূর্ণ ফসল লাভ করতে পারে। মনে করুন, কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় এক মহাযুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং তার এ মারাত্মক অপকর্মের বিপুল বিষময় কুফল হাজার বছর পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এ ব্যক্তির এ ধরনের অপরাধের কথা একবার কল্পনা করুন। এ দুনিয়ায় যত বড় ধরনের দৈহিক, নৈতিক, মানসিক অথবা বস্তুগত শাস্তি দেয়া সম্ভব, তার কোনটিও কি তার এ অপরাধের ন্যায়সংগত পরিপূর্ণ শাস্তি হতে পারে? অনুরূপভাবে দুনিয়ার সবচাইতে বড় যে পুরস্কারের কথা কল্পনা করা যেতে পারে, তার কোনটিও কি এমন এক ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হতে পারে, যে সারা জীবন মানবজাতির কল্যাণার্থে কাজ করে গেছে এবং হাজার হাজার বছর পর্যন্ত অসংখ্য মানব সন্তান যার প্রচেষ্টার ফসল থেকে লাভবান হয়ে চলেছে? যে ব্যক্তি কর্ম ও প্রতিদানের বিষয়টিকে এ দৃষ্টিতে বিচার করবে সে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবে যে, কর্মফলের জন্য আসলে আর একটি জগতের প্রয়োজন, যেখানে পূর্বের ও পরের সমগ্র মানব গোষ্ঠী একত্র হবে, সকল মানুষের আমলনামা বন্ধ হয়ে যাবে, হিসেব গ্রহণ করার জন্য একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানময় আল্লাহ বিচারের আসনে বসবেন এবং কর্মের পুরোপুরি প্রতিদান লাভ করার জন্য মানুষের কাছে সীমাহীন জীবন ও তার চারদিকে পুরস্কার ও শাস্তির অঢেল সম্ভাবনা বিরাজিত থাকবে।

আবার এই একই দিক সম্পর্কে চিন্তা করলে জন্মান্তরবাদীদের আর একটি মৌলিক ভ্রান্তির অপনোদনও হতে পারে। এ ভ্রান্তিটিই তাদের পুনর্জন্মের ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। তারা এ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারেনি যে, মাত্র একটি সংক্ষিপ্ত পঞ্চাশ বছরের জীবনের কর্মফল ভোগের জন্য তার চাইতে হাজার গুণ বেশী দীর্ঘ জীবনের প্রয়োজন হয়। অথচ পুনর্জন্মবাদের ধারণা মতে তার পরিবর্তে পঞ্চাশ বছরের জীবন শেষ হতেই দ্বিতীয় আর একটি দায়িত্বপূর্ণ জীবন, তারপর তৃতীয় জীবন এ দুনিয়াতেই শুরু হয়ে যায়। আবার এসব জীবনে পুনরায় শাস্তিযোগ্য বা পুরস্কারযোগ্য বহু কাজ করা হতে থাকে। এভাবে তো হিসেব চুকে যাওয়ার পরিবর্তে আরো বাড়তেই থাকবে এবং কোন দিন তা খতম হওয়া সম্ভব হবে না।

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ
السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ
غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾

৫ রুকূ'

নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের জন্য কখনো আকাশের দরজা খুলবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ এমনই অসম্ভব ব্যাপার যেমন সুঁচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করানো। অপরাধীরা আমার কাছে এভাবেই বদলা পেয়ে থাকে। তাদের জন্য বিছানাও হবে জাহান্নামের এবং ওপরের আচ্ছাদনও হবে জাহান্নামের। এ প্রতিফল আমি জালেমদেরকে দিয়ে থাকি। অন্যদিকে যারা আমার আয়াত মেনে নিয়েছে এবং সৎকাজ করেছে—আর এ পর্যায়ে আমি কাউকে তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করি না—তারা হচ্ছে জান্নাতবাসী। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

৩১. জাহান্নামবাসীদের এ পারস্পরিক সংলাপ ও তর্ক–বিতর্ক কুরআন মজীদের আরো কয়েকটি স্থানে বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা সাবা'র ৪ রুকূ'তে বলা হয়েছে ঃ "হায়! তোমরা যদি সেই সময়টি দেখতে পেতে যখন এ জালেমরা নিজেদের রবের সামনে দাঁড়াবে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে থাকবে। যাদেরকে দুনিয়ায় দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা বড় ও শক্তিশালীর আসনে যারা বসেছিল তাদেরকে বলবে ঃ তোমরা না থাকলে আমরা মু'মিন হতাম। বড় ও শক্তিশালীর আসনে যারা বসেছিল, তারা দুর্বল করে রাখা লোকদেরকে জবাব দেবে ঃ তোমাদের কাছে যখন হেদায়াত এসেছিল তখন আমরা কি তা গ্রহণ করতে তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম? না, তা নয়, বরং তোমরা নিজেরাই অপরাধী ছিলে।" এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা আবার কবে হেদায়াতের প্রত্যাশী ছিলে? আমরা যদি তোমাদেরকে দুনিয়ার লোভ দেখিয়ে নিজেদের দাসে পরিণত করে থাকি, তাহলে তোমরা লোভী ছিলে বলেই তো আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছিলে। যদি আমরা তোমাদেরকে কিনে নিয়ে থাকি, তাহলে তোমরা নিজেরাই তো বিকোবার জন্য তৈরী ছিলে,

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۟ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَاۤ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ وَنُوْدُوْۤا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۴۳﴾

তাদের মনে পরস্পরের বিরুদ্ধে যা কিছু গ্লানি থাকবে তা আমি বের করে দেবো।[৩২] তাদের নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা বলবে ঃ "প্রশংসা সব আল্লাহরই জন্য, যিনি আমাদের এ পথ দেখিয়েছেন। আমরা নিজেরা পথের সন্ধান পেতাম না যদি না আল্লাহ আমাদের পথ দেখাতেন। আমাদের রবের পাঠানো রসূলগণ যথার্থ সত্য নিয়েই এসেছিলেন।" সে সময় আওয়াজ ধ্বনিত হবে ঃ "তোমাদেরকে এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে, এটি তোমরা লাভ করেছো সেই সমস্ত কাজের প্রতিদানে যেগুলো তোমরা অব্যাহতভাবে করতে।"[৩৩]

তবেই না আমরা কিনতে পেরেছিলাম। যদি আমরা তোমাদেরকে বস্তুবাদ, বৈষয়িক লালসা, জাতিপূজা এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন প্রকার গোমরাহী ও অসৎকাজে লিপ্ত করে থাকি, তাহলে তোমরা নিজেরাই তো আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দুনিয়ার পূজারী সেজেছিলে, তবেই না তোমরা আল্লাহর আনুগত্য ও আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহবানকারীদেরকে ত্যাগ করে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। যদি আমরা তোমাদেরকে ধর্মের আবরণে প্রতারিত করে থাকি, তাহলে যে জিনিসগুলো আমরা পেশ করছিলাম এবং তোমরা লুফে নিচ্ছিলে, সেগুলোর চাহিদা তো তোমাদের নিজেদের মধ্যেই ছিল। তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমনসব প্রয়োজন পূরণকারী খুঁজে বেড়াচ্ছিলে, যারা তোমাদের কাছে কোন নৈতিক বিধানের আনুগত্যের দাবী না করেই কেবলমাত্র তোমাদের ইপ্সিত কাজই করে যেতে থাকতো। আমরা সেই সব প্রয়োজন পূরণকারী তৈরী করে তোমাদেরকে দিয়েছিলাম। তোমরা আল্লাহর আদেশ নিষেধ থেকে বেপরোয়া হয়ে দুনিয়ার কুকুর হয়ে গিয়েছিলে এবং তোমাদের পাপ মোচনের জন্য এমন এক ধরনের সুপারিশকারী খুঁজে বেড়াচ্ছিলে যারা তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়ে দেয়ার সমস্ত দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়ে নেবে। আমরা সেই সব সুপারিশকারী তৈরী করে তোমাদের কাছে সরবরাহ করেছিলাম। তোমরা নিরস ও স্বাদ-গন্ধহীন দীনদারী, পরহেজগারী, কুরবানী এবং প্রচেষ্টা ও সাধনার পরিবর্তে নাজাতলাভের জন্য অন্য কোন পথের সন্ধান চাচ্ছিলে। তোমরা চাচ্ছিলে এ পথে তোমাদের প্রবৃত্তি ও লালসা চরিতার্থ করতে, নানা প্রকার স্বাদ আহরণ করতে কোন বাধা না থাকে এবং প্রবৃত্তি ও লালসা যেন সব রকমের বিধি-নিষেধের আওতামুক্ত থাকে। আমরা এ ধরনের সুদৃশ্য ধর্ম উদ্ভাবন করে তোমাদের সামনে রেখেছিলাম। মোটকথা দায়-দায়িত্ব কেবল আমাদের একার নয়। তোমরাও এতে

সমান অংশীদার। আমরা যদি গোমরাহী সরবরাহ করে থাকি, তাহলে তোমরা ছিলে তার খরিদ্দার।

৩২. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে এ সৎলোকদের মধ্যে কিছু পারস্পরিক তিক্ততা, মনোমালিন্য ও ভুল বুঝাবুঝি থেকে থাকলেও আখেরাতের জীবনে তা সব দূর করে দেয়া হবে। তাদের মন পরস্পরের ব্যাপারে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারা পরস্পর আন্তরিকতা সম্পন্ন অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। দুনিয়ায় যে ব্যক্তি তাদের বিরোধী ছিল, যে তাদের সাথে লড়াই করেছিল এবং তাদের বিরূপ সমালোচনা করেছিল, তাকে তাদের সাথে জান্নাতের আপ্যায়নে শামিল থাকতে দেখে তাদের কারোর মনে কোন প্রকার কষ্টের উদ্রেক হবে না। এ আয়াতটি পড়ে হযরত আলী (রা) বলেছিলেন ঃ আমি আশা করি, আল্লাহ আমার, উসমানের, তাল্‌হার ও যোবাইরের মধ্যে সাফাই করে দেবেন।

এ আয়াতটিকে ব্যাপকতর দৃষ্টিতে দেখলে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এ দুনিয়ায় সৎলোকদের গায়ে ঘটনাক্রমে যেসব দাগ বা কলংক লেগে যায়, সেই দাগগুলো সহকারে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন না। বরং সেখানে প্রবেশ করার আগে নিজের বিশেষ অনুগ্রহে তাদেরকে একেবারে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে নেবেন এবং একটি নিরেট নিষ্কলংক জীবন নিয়ে তারা সেখানে উপস্থিত হবেন।

৩৩. বেহেশ্‌তে এ ধরনের একটি মজার ব্যাপার ঘটবে। জান্নাতবাসীরা নিজেদের কাজের জন্য অহংকারে মেতে উঠবে না। তারা একথা মনে করবে না যে, তারা এমন কাজ করেছিল যার বিনিময়ে তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গিয়েছিল। বরং তারা আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। তারা বলবে, এসব আমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ, নয়তো আমরা এর যোগ্য ছিলাম না। অন্যদিকে আল্লাহ তাদের ওপর নিজের অনুগ্রহের বড়াই করবেন না। বরং জবাবে বলবেন, তোমরা নিজেদের কাজের বিনিময়ে এ মর্যাদার অধিকারী হয়েছো। তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হচ্ছে সবই তোমাদের মেহনতের ফসল। এগুলো ভিক্ষে করে পাওয়া নয় বরং তোমাদের প্রচেষ্টার ফল এবং তোমাদের কাজের মজুরী। নিজেদের মেহনতের বিনিময়ে তোমরা এসব সম্মানজনক জীবিকা অর্জনের অধিকার লাভ করেছো। অপর দিকে আল্লাহ তাঁর জবাবের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন না যে, "আমি একথা বলবো" বরং তিনি বলছেন, "আওয়াজ ধ্বনিত হবে"—এভাবে বর্ণনা করার কারণে বিষয়টি আরো বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

আসলে এই একই ধরনের সম্পর্ক দুনিয়ায় আল্লাহ ও তাঁর নেক বান্দাদের মধ্যেও রয়েছে। দুরাচারী লোকেরা দুনিয়ায় যে অনুগ্রহ লাভ করে থাকে তারা সে জন্য গর্ব করে বেড়ায়। তারা বলে থাকে, এসব আমাদের যোগ্যতা, প্রচেষ্টা–সাধনা ও কর্মের ফল। আর এ জন্যই তারা প্রত্যেকটি অনুগ্রহলাভের কারণে আরো বেশী অহংকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীতে পরিণত হতে থাকে। বিপরীত পক্ষে সৎলোকেরা যে কোন অনুগ্রহ লাভ করুক না কেন তাকে অবশ্যি আল্লাহর দান মনে করে। সে জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আল্লাহর দান যতই বাড়তে থাকে ততই তারা বিনয় প্রকাশ করতে থাকে এবং ততই তাদের দয়া, স্নেহ ও বদান্যতা বেড়ে যেতে থাকে। তারপর আখেরাতের ব্যাপারেও তারা নিজেদের সৎকর্মের জন্য অহংকারে মত্ত হয় না। তারা একথা বলে না

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿৪৪﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿৪৫﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمٰىهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۟ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ﴿৪৬﴾ وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿৪৭﴾

৫

তারপর জান্নাতের অধিবাসীরা জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে : "আমাদের রব আমাদের সাথে যে সমস্ত ওয়াদা করেছিলেন তার সবগুলোকেই আমরা সঠিক পেয়েছি, তোমাদের রব যেসব ওয়াদা করেছিলেন তোমরাও কি সেগুলোকে সঠিক পেয়েছো?" তারা জবাবে বলবে : "হাঁ", তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে : "আল্লাহর লানত সেই জালেমদের ওপর, যারা মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিতো এবং তাকে বাঁকা করে দিতে চাইতো আর তারা ছিল আখেরাত অস্বীকারকারী।"

এ উভয় দলের মাঝখানে থাকবে একটি অন্তরাল। এর উঁচু স্থানে (আ'রাফ) অপর কিছু লোক থাকবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করেনি ঠিকই কিন্তু তারা হবে তার প্রার্থী।[৩৪] তারা প্রত্যেককে তার লক্ষণের সাহায্যে চিনে নেবে। জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে তারা বলবে : "তোমাদের প্রতি শান্তি হোক!" আর যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামবাসীদের দিকে ফিরবে, তারা বলবে : "হে আমাদের রব! এ জালেমদের সাথে আমাদের শামিল করো না।

যে, তাদের গুনাহখাতা নিশ্চিতভাবেই মাফ করে দেয়া হবে। বরং নিজেদের ভুল-ত্রুটির জন্য তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকে। নিজেদের কর্মফলের পরিবর্তে আল্লাহর করুণা ও মেহেরবানীর ওপর পূর্ণ আস্থাশীল হয়। তারা সবসময় ভয় করতে থাকে,

وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَاۤ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ اَهٰۤؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾

৬ রুকূ'

আবার এ আ'রাফের লোকেরা জাহান্নামের কয়েকজন বড় বড় ব্যক্তিকে তাদের আলামত দেখে চিনে নিয়ে ডেকে বলবে ঃ "দেখলে তো তোমরা, আজ তোমাদের দলবলও তোমাদের কোন কাজে লাগলো না। আর তোমাদের যেই সাজ–সরঞ্জামকে তোমরা অনেক বড় মনে করতে তাও কোন উপকারে আসলো না। আর এ জান্নাতের অধিবাসীরা কি তারাই নয়, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে, এদেরকে তো আল্লাহ তাঁর রহমত থেকে কিছুই দেবেন না? আজ তাদেরকেই বলা হয়েছে, প্রবেশ করো জান্নাতে—তোমাদের কোন ভয়ও নেই, দুঃখও নেই।"

তাদের আমলনামায় প্রাপ্যের পরিবর্তে কোন দেনার খাত বের হয়ে না আসে। বুখারী ও মুসলিম উভয় হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِعْلَمُوْا اَنَّ اَحَدَكُمْ لَنْ يُّدْخِلَهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ

"খুব ভালভাবেই জেনে রাখো, তোমরা নিছক নিজেদের কর্মকাণ্ডের জোরে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! আপনিও? জবাব দিলেন, হাঁ আমিও–

اِلَّا اَنْ يَّتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ عَنْهُ وَفَضْلٍ

"হাঁ, তবে যদি আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের আবরণে ঢেকে নেন।"

৩৪. অর্থাৎ এ আ'রাফাবাসীরা হবে এমন একদল লোক, যাদের জীবনের ও কর্মকাণ্ডের ইতিবাচক বা ভাল দিক এত বেশী শক্তিশালী হবে না, যার ফলে তারা জান্নাতলাভ করতে সক্ষম হয়, আবার এর নেতিবাচক বা খারাপ দিকও এত বেশী খারাপ হবে না, যার ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা যেতে পারে। তাই তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করবে।

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ
اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۗ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾
الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ
نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٥١﴾

আর জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবে ঃ সামান্য একটু পানি আমাদের উপর ঢেলে দাও না। অথবা আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দান করেছেন তা থেকেই কিছু ফেলে দাও না। তারা জবাবে বলবে ঃ আল্লাহ এ দু'টি জিনিসই সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য হারাম করেছেন, যারা নিজেদের দীনকে খেলা ও কৌতুকের ব্যাপার বানিয়ে নিয়েছিল এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারণায় নিমজ্জিত করেছিল। আল্লাহ বলেন, আজ আমিও তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে ভুলে যাবো যেভাবে তারা এ দিনটির মুখোমুখী হওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিল এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল।[৩৫]

৩৫. জান্নাতবাসী, জাহান্নামবাসী ও আ'রাফবাসীদের এ পারস্পরিক সংলাপ থেকে পরকালীন জীবনে মানুষের শক্তির সীমানা কতদূর বিস্তৃত হবে তা কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। সেখানে দৃষ্টিশক্তি এতটা প্রসারিত হবে যার ফলে জান্নাত, জাহান্নাম বা আ'রাফের লোকেরা যখন ইচ্ছা পরস্পরকে দেখতে পারবে। সেখানে আওয়াজ ও শ্রবণশক্তিও হবে বহু দূরপাল্লার। ফলে এ পৃথক পৃথক জগতের লোকেরা পরস্পরের সাথে অতি সহজেই কথাবার্তা বলতে পারবে। পরকালীন জগত সম্পর্কে এ বর্ণনা এবং এ ধরনের আরো যেসব বর্ণনা কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে তা এ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট যে, সেখানকার জীবন যাপনের বিধান আমাদের এ দুনিয়ার প্রাকৃতিক বিধান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হবে। অবশ্যি এখানে আমাদের যে ব্যক্তি–সত্তা রয়েছে সেখানেও তাই থাকবে। তবে যেসব লোকের মস্তিষ্ক এ প্রাকৃতিক জগতের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়ে গেছে এবং বর্তমান জীবন ও এর সংক্ষিপ্ত পরিমাপগুলো ছাড়া ব্যাপকতর কোন জিনিসের ধারণা যাদের মস্তিষ্কে সংকুলান হয় না, তারা কুরআন ও হাদীসের এ ধরনের বর্ণনাগুলোকে অবাক দৃষ্টিতে দেখে থাকে এবং কখনো কখনো এগুলোকে বিদ্রূপও করে থাকে। এভাবে তারা তাদের বুদ্ধির স্বল্পতারই প্রমাণ দিয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের বুদ্ধির পরিসর যতটা সংকীর্ণ, জগত ও জীবনের সম্ভাবনাগুলো ততটা সংকীর্ণ নয়।

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾
هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِىْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ
مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا
لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

আমি এদের কাছে এমন একটি কিতাব নিয়ে এসেছি যাকে পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশদ ব্যাখ্যামূলক করেছি[৩৬] এবং যা ঈমানদারদের জন্য পথনির্দেশনা ও রহমতস্বরূপ[৩৭] এখন এরা কি এর পরিবর্তে এ কিতাব যে পরিণামের খবর দিচ্ছে তার প্রতীক্ষায় আছে?[৩৮] যেদিন সেই পরিণাম সামনে এসে যাবে সেদিন যারা তাকে উপেক্ষা করেছিল তারাই বলবে ঃ "যথার্থই আমাদের রবের রসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন। এখন কি আমরা এমন কিছু সুপারিশকারী পাবো যারা আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে? অথবা আমাদের পুনরায় ফিরে যেতে দেয়া হবে, যাতে পূর্বে আমরা যা কিছু করতাম তার পরিবর্তে এখন অন্য পদ্ধতিতে কাজ করে দেখাতে পারি?"[৩৯] তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং যে মিথ্যা তারা রচনা করেছিল তার সবটুকুই আজ তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে।

৩৬. অর্থাৎ এতে পরিপূর্ণ বিশদ বিবরণ সহকারে যথার্থ সত্য, মানুষের জন্য দুনিয়ার জীবনে সঠিক কর্মনীতি এবং সঠিক জীবন পদ্ধতির মূল নীতিগুলো কি কি, তা বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর নিছক আন্দাজ–অনুমান বা ধারণা–কল্পনার ভিত্তিতে এ বিস্তারিত বিবরণগুলো দেয়া হয়নি। বরং নির্ভেজাল ও নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে।

৩৭. অর্থ হচ্ছে, প্রথমত এ কিতাবের বিষয়বস্তু ও এর শিক্ষাবলী এত বেশী স্পষ্ট যে, এ নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করলে যে কোন মানুষের সামনে সত্য পথ পরিষ্কারভাবে ভেসে উঠতে পারে। তাছাড়া যারা এ কিতাবকে মানে, এ কিতাবটি তাদের জীবনে কেমন সঠিক পথনির্দেশনা দেয় এবং এটি যে কতবড় অনুগ্রহ তা তাদের জীবনের ঘটনাবলী থেকে কার্যত প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। এর প্রভাব গ্রহণ করার সাথে সাথেই মানুষের মন–মানস, নৈতিক বৃত্তি ও চরিত্রে সর্বোত্তম বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনার পর সাহাবায়ে কেরামের জীবনে যে বিস্ময়কর পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তার দিকে এখানে ইশারা করা হয়েছে।

৩৮. এ বিষয়বস্তুটিকে অন্য কথায় এভাবে বলা যেতে পারে, এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে সত্য–মিথ্যার পার্থক্য পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয় কিন্তু এরপরও

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَٰرَكَ
اللَّهُ رَبُّ الْعَٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَادْعُوهُ
خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

৭ রুকূ'

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদের রব, যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।[৪০] তারপর তিনি নিজের কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হন।[৪১] তিনি রাত দিয়ে দিনকে ঢেকে দেন তারপর রাতের পেছনে দিন দৌড়িয়ে চলে আসে। তিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি সৃষ্টি করেন। সবাই তাঁর নির্দেশের অনুগত। জেনে রাখো, সৃষ্টি তাঁরই এবং নির্দেশও তাঁরই।[৪২] আল্লাহ বড়ই বরকতের অধিকারী[৪৩] তিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের মালিক ও প্রতিপালক। তোমাদের রবকে ডাকো কান্নাজড়িত কণ্ঠে ও চুপে চুপে। অবশ্যি তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। দুনিয়ায় সুস্থ পরিবেশ বহাল করার পর আর সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।[৪৪] আল্লাহকেই ডাকো ভীতি ও আশা সহকারে।[৪৫] নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীল লোকদের নিকটবর্তী।

সে তা মানতে প্রস্তুত হয় না। তারপর তার সামনে কিছু লোক সঠিক পথে চলে দেখিয়েও দেয় যে, ভুল পথে চলার সময় তারা কেমন ছিল এবং এখন সঠিক পথ অবলম্বন করার পর তাদের জীবনে কত ভাল পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু এ থেকেও ঐ ব্যক্তি কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, এখন ঐ ব্যক্তি নিজের ভুল পথে চলার শাস্তি লাভ করার পরই কেবল একথা মেনে নেবে যে, সে ভুল পথে ছিল। যে ব্যক্তি ডাক্তারের জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ গ্রহণ করে না এবং নিজের মত অসংখ্য রোগীকে ডাক্তারের পরামর্শ মত চলে রোগমুক্ত হতে দেখেও তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না, সে এখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়েই কেবল একথা স্বীকার করবে যে, যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে সে জীবন যাপন করে আসছিল তা সত্যিই তার জন্য ধ্বংসকর ছিল।

৩৯. অর্থাৎ তারা পুনর্বার এ দুনিয়ায় ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করবে। তারা বলবে, আমাদের যে সত্যের খবর দেয়া হয়েছিল এবং তখন আমরা যে সত্যটি মেনে নেইনি, এখন চাক্ষুষ দেখার পর আমরা সে ব্যাপারে জেনে গেছি। কাজেই এখন যদি আমাদের আবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয় তাহলে এখন আমাদের কর্মপদ্ধতি আর আগের মত হবে না। (এ মিনতি এবং এর কি জবাব দেয়া হবে তা জানার জন্য দেখুন সূরা আন'আম আয়াত ২৭-২৮, ইবরাহীম ৪৪-৪৫, সাজ্‌দা ১২-১৩, ফাতের ৩৭, যুমার ৫৬-৫৯, মুমিন ১১-১২)।

৪০. এখানে দিন শব্দটি প্রচলিত ২৪ ঘন্টার দিন অর্থে অথবা যুগ বা কাল (PERIOD) অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। শেষোক্ত অর্থে কুরআনে একাধিক ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন সূরা হজ্জের ৬ রুকূতে (আয়াত ৪৭) বলা হয়েছে ঃ

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ○

(আর প্রকৃতপক্ষে তোমরা যে হিসাব কষে থাকো সেই দৃষ্টিতে তোমার রবের এখানে একটি দিন এক হাজার বছরের সমান)।

আবার সূরা মা'আরিজ-এর ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

(ফেরেশতারা ও জিব্রীল তাঁর দিকে আরোহণ করে একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর)। তবে এখানে 'দিন' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য কি, তা আল্লাহই ভাল জানেন। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা হামীম সাজদা-টীকা ১১--১৫)

৪১. আল্লাহর "ইস্তিওয়া আলাল আরশ" (কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়া")-এর বিস্তারিত স্বরূপ অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে কঠিন। খুব সম্ভবত সমগ্র বিশ্ব-জাহান সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ কোন একটি স্থানকে তাঁর এ অসীম সাম্রাজ্যের কেন্দ্র নির্ধারণ করেন এবং সেখানে নিজের আলোক রশ্মীর বিচ্ছুরণকে কেন্দ্রীভূত করে দেন আর তারই নাম দেন "আরশ" (কর্তৃত্বের আসন)। সেখান থেকে সমগ্র বিশ্ব-জাহানে নব নব সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে ও ক্রমাগত শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটছে, সেই সাথে সৃষ্টি জগতের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাও অব্যাহত রয়েছে। আবার এও সম্ভব হতে পারে যে, আরশ অর্থ শাসন কর্তৃত্ব এবং আরশের ওপর সমাসীন হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করার পর এর শাসন দণ্ড নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। মোটকথা আরশের ওপর সমাসীন হওয়ার বিস্তারিত অর্থ যাই হোক না কেন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে, এ বিশ্ব-জগতের নিছক স্রষ্টাই নন বরং এর পরিচালক ও ব্যবস্থাপকও একথা ভালভাবে হৃদয়ংগম করানোই কুরআনে এর উল্লেখের আসল উদ্দেশ্য। তিনি এ দুনিয়াকে অস্তিত্বশীল করার পর এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে কোথাও বসে যাননি। বরং কার্যত তিনিই সারা বিশ্ব-জাহানের ছোট বড় প্রত্যেকটি বস্তুর ওপর কর্তৃত্ব করছেন। পরিচালনা ও শাসন কর্তৃত্বের যাবতীয় ক্ষমতা কার্যত তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। প্রতিটি বস্তু তাঁর নির্দেশের অনুগত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণাও তাঁর নির্দেশ মেনে চলে। প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীর ভাগ্যই চিরন্তনভাবে তাঁর নির্দেশের সাথে যুক্ত। যে মৌলিক বিভ্রান্তিটির কারণে মানুষ কখনো শিরকের

গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে আবার কখনো নিজেকে স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন ঘোষণা করার মতো ভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, কুরআন এভাবে তার মূলোৎপাটন করতে চায়। বিশ্ব-জাহানের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা থেকে আল্লাহকে কার্যত সম্পর্কহীন মনে করার অনিবার্য ফল দাঁড়ায় দু'টি। মানুষ নিজের ভাগ্যকে অন্যের হাতে বন্দী মনে করবে এবং তার সামনে মাথা নত করে দেবে অথবা নিজেকেই নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা মনে করবে এবং নিজেকে সর্বময় কর্তৃত্বশালী স্বাধীন সত্তা মনে করে কাজ করে যেতে থাকবে।

এখানে আরো একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক সুস্পষ্ট করার জন্য কুরআন মজীদে মানুষের ভাষা থেকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এমন সব শব্দ, পরিভাষা, উপমা ও বর্ণনাভংগী গ্রহণ করা হয়েছে, যা রাজত্ব ও বাদশাহীর সাথে সম্পর্ক রাখে। এ বর্ণনাভংগী কুরআনে এত বেশী স্পষ্ট যে, অর্থ বুঝে কুরআন পাঠকারী যে কোন ব্যক্তিই এ বিষয়টি অনুভব না করে থাকতে পারবেন না। কোন কোন অর্বাচীন সমালোচক স্বীয় বিকৃত চিন্তা ও মানসিকতার কারণে এ বাচনভংগী থেকে বুঝেছেন যে, এ কিতাবটি যে যুগের "রচনা" সে যুগে মানুষের মন-মস্তিষ্কে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল। তাই এ কিতাবের রচয়িতা (এ বিবেকহীন নিন্দুকদের মতে এর রচয়িতা নাকি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহকে একজন রাজা ও বাদশাহ হিসেবেই পেশ করেছেন। অথচ কুরআন যে শাশ্বত ও অনাদি-অনন্ত সত্য উপস্থাপন করছে তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে সত্যটি হচ্ছে, ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে একমাত্র আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) বলতে যা বুঝায় তা একমাত্র তারই সত্তার একচেটিয়া অধিকার ও বৈশিষ্ট। আর বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থাপনা একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বিশেষ, যেখানে ঐ একক সত্তা সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। কাজেই এ ব্যবস্থার মধ্যে যে ব্যক্তি বা দল নিজের বা অন্য কারুর আংশিক বা পূর্ণ কর্তৃত্বের দাবীদার হয়, সে নিজেকে নিছক প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাছাড়া এ ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান করে মানুষের পক্ষে ঐ একক সত্তাকে একই সাথে ধর্মীয় অর্থেও একমাত্র মাবুদ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অর্থেও একমাত্র শাসক (Sovereign) হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন সঠিক দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি হতে পারে না।

৪২. "আরশের উপর সমাসীন হলেন" বাক্যটির মাধ্যমে সংক্ষেপে যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছিল এখানে তারই কিছুটা অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ নিছক স্রষ্টাই নন, তিনি হুকুমকর্তা এবং শাসকও। তিনি সৃষ্টি করার পর নিজের সৃষ্ট বস্তুসমূহকে অন্যের কর্তৃত্বে সোপর্দ করে দেননি অথবা সমগ্র সৃষ্টিকে বা তার অংশ বিশেষকে ইচ্ছামত চলার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেননি। বরং কার্যত সমগ্র বিশ্ব-জগতের পরিচালন ব্যবস্থা আল্লাহর নিজের হাতেই কেন্দ্রীভূত রয়েছে। দিন-রাত্রির আবর্তন আপনা আপনিই হচ্ছে না। বরং আল্লাহর হুকুমে হচ্ছে। তিনি যখনই চাইবেন দিন ও রাতকে থামিয়ে দেবেন আবার যখনই চাইবেন এ ব্যবস্থা বদলে দেবেন। সূর্য, চন্দ্র, তারকা এরা কেউ নিজস্ব কোন শক্তির অধিকারী নয়। বরং এরা সবাই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। এরা একান্ত অনুগত দাসের মত সেই কাজই করে যাচ্ছে যে কাজে আল্লাহ এদেরকে নিযুক্ত করেছেন।

৪৩. বরকতের আসল অর্থ হচ্ছে, বৃদ্ধি, উন্নতি, বিকাশ। এই সংগে এ শব্দটির মধ্যে একদিকে উচ্চতা ও মহত্বের ভাবধারা নিহিত রয়েছে এবং অন্যদিকে রয়েছে স্থীতিশীলতা ও অবিচলতার ভাবধারাও। আবার মংগল ও কল্যাণের ভাবধারাও নিশ্চিতভাবে এসব অর্থের অন্তরভুক্ত রয়েছে। কাজেই আল্লাহর বড়ই বরকতের অধিকারী হবার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, তাঁর মংগল ও কল্যাণের কোন সীমা নেই। তাঁর সত্তা থেকে সীমাহীন কল্যাণ চতুর্দিকে বিস্তৃত হচ্ছে এবং তিনি অতি উন্নত ও শ্রেষ্ঠ এক সত্তা। তাঁর মহত্বের কোন শেষ নেই। আর তাঁর এ কল্যাণ, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব চিরস্থায়ী ও অনন্তকালীন—সাময়িক নয়। এর ক্ষয়ও নেই। পতনও নেই। (আল–ফুরকান, টীকা ১–১৯ দ্রষ্টব্য)।

৪৪. "পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।"—অর্থাৎ পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত ও বিনষ্ট করো না। মানুষ যখন আল্লাহর বন্দেগী না করে নিজের বা অন্য কারোর তাবেদারী করে এবং আল্লাহর পথনির্দেশনা গ্রহণ না করে নিজের সমাজ, সংস্কৃতি ও নৈতিকতাকে এমনসব মূলনীতি ও আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে যা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর পথনির্দেশনা থেকে গৃহীত, তখন এমন একটি মৌলিক ও সার্বিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, যা পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থাকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই বিপর্যয়ের পথরোধ করাই কুরআনের উদ্দেশ্য। এই সংগে কুরআন এ সত্যটি সম্পর্কেও সজাগ করতে চায় যে, 'বিপর্যয়' পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় মৌল বিষয় নয় এবং 'সুস্থতা' তার সাথে সাময়িকভাবে সংযুক্ত হয়নি। বরং 'সুস্থতা' হচ্ছে এ ব্যবস্থাপনার মৌল বিষয় এবং নিছক মানুষের মূর্খতা, অজ্ঞতা ও বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপের ফলে 'বিপর্যয়' তার ওপর সাময়িকভাবে আপতিত হয়। অন্য কথায় বলা যায়, এখানে মূর্খতা, অজ্ঞতা, অসভ্যতা, শিরক, বিদ্রোহ ও নৈতিক বিশৃংখলার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের সূচনা হয়নি এবং এগুলো দূর করার জন্য পরবর্তীকালে ক্রমাগত সংশোধন, সংস্কার ও সুস্থতা বিধানের কাজ চলেনি। বরং প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের সূচনা হয়েছে সুস্থ ও সুসভ্য ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে এবং পরবর্তীকালে দুষ্কর্মশীল লোকেরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও দুষ্ট মনোবৃত্তির সাহায্যে এ সুস্থ ব্যবস্থাটিকে ক্রমান্বয়ে বিনষ্ট ও বিপর্যস্ত করেছে। এ বিপর্যয় নির্মূল করে জীবন ব্যবস্থাকে আবার নতুন করে সংশোধিত ও সুস্থ করে তোলার জন্যই মহান আল্লাহ যুগে যুগে ধারাবাহিকভাবে নবী পাঠিয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেক যুগে মানুষকে এ একই দাওয়াত দিয়ে এসেছেন যে, যে সুস্থ ও সভ্য বিধানের ভিত্তিতে দুনিয়ার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল তার মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকো।

সভ্যতার বিবর্তন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে একটি মহল যে উদ্ভট মতাদর্শ পেশ করেছেন, কুরআনের দৃষ্টিভংগী তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁরা বলছেন, মানুষ অন্ধকার থেকে বের হয়ে ধীরে ধীরে ও পর্যায়ক্রমে আলোর মধ্যে এসেছে। বিকৃতি, অসভ্যতা ও বর্বরতা থেকে তার জীবনের সূচনা হয়েছে। তারপর পর্যায়ক্রমে তা সুস্থতা ও সভ্যতার দিকে এসেছে। বিপরীতপক্ষে কুরআন বলছে, আল্লাহ মানুষকে পূর্ণ আলোকের মধ্যে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। পূর্ণ আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে একটি সুস্থ জীবন ব্যবস্থার আওতাধীনে তার জীবন পথে চলা শুরু হয়েছিল। তারপর মানুষ নিজেই শয়তানের নেতৃত্ব গ্রহণ করে বারবার অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং এ সুস্থ জীবন ব্যবস্থায় বিপর্যয় ডেকে এনেছে। অন্যদিকে আল্লাহ বারবার নিজের নবী ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। তাঁরা

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِىْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ۝

আর আল্লাহই বায়ুকে নিজের অনুগ্রহের পূর্বাহ্নে সুসংবাদবাহীরূপে পাঠান। তারপর যখন সে পানি ভরা মেঘ বহন করে তখন কোন মৃত ভূখণ্ডের দিকে তাকে চালিয়ে দেন এবং সেখানে বারি বর্ষণ করে (সেই মৃত ভূখণ্ড থেকে) নানা প্রকার ফল উৎপাদন করেন। দেখো, এভাবে আমি মৃতদেরকে মৃত্যুর অবস্থা থেকে বের করে আনি। হয়তো এ চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ থেকে তোমরা শিক্ষা লাভ করবে। উৎকৃষ্ট ভূমি নিজের রবের নির্দেশে প্রচুর ফসল উৎপন্ন করে এবং নিকৃষ্ট ভূমি থেকে নিকৃষ্ট ধরনের ফসল ছাড়া আর কিছুই ফলে না।[৪৬] এভাবেই আমি কৃতজ্ঞ জনগোষ্ঠীর জন্য বারবার নিদর্শনসমূহ পেশ করে থাকি।

মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আসার এবং বিপর্যয় সৃষ্টি থেকে বিরত থাকার জন্য আহবান জানিয়েছেন। (দেখুন সূরা বাকারা ২৩০ টীকা)।

৪৫. এ বাক্যটি থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ওপরের বাক্যে যাকে "বিপর্যয়" বলা হয়েছিল তা হচ্ছে আসলে মানুষের আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে নিজের অভিভাবক, বন্ধু ও কার্য সম্পাদনকারী গণ্য করে সাহায্যের জন্য তাকে ডাকা। অন্যদিকে মানুষের এ ডাক একমাত্র আল্লাহর সত্তাকে কেন্দ্র করে উচ্চারিত হওয়ার নামই 'সুস্থতা' ও বিশুদ্ধতা।

ভীতি ও আশা সহকারে ডাকার অর্থ হচ্ছে, তোমাদের ভয় করতে হলে একমাত্র আল্লাহকেই করতে হবে এবং কোন আশা পোষণ করতে হলে তাও করতে হবে একমাত্র আল্লাহরই কাছ থেকে। এ অনুভূতি সহকারে আল্লাহকে ডাকতে হবে যে, তোমাদের ভাগ্য পুরোপুরি তাঁরই করুণা নির্ভর। সৌভাগ্য, সাফল্য ও মুক্তিলাভ একমাত্র তাঁরই সাহায্য ও পথনির্দেশনায় সম্ভব। অন্যথায় তাঁর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলে তোমাদের জন্য ব্যর্থতা ও ধ্বংস অনিবার্য।

৪৬. এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। মূল বক্তব্য বিষয়টি অনুধাবন করার জন্যে এ সম্পর্কে অবহিত হওয়া অপরিহার্য। এখানে বৃষ্টি ও তার বরকতের

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِى ضَلَٰلَةٌ وَلَٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦١﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

৮ রুকূ'

নূহকে আমি তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই।[৪৭] সে বলে ঃ "হে আমার স্বগোত্রীয় ভাইয়েরা! আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।[৪৮] আমি তোমাদের জন্য একটি ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা করছি।" তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা জবাব দেয় ঃ "আমরা তো দেখতে পাচ্ছি তুমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছো।" নূহ বলে ঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! আমি কোন গোমরাহীতে লিপ্ত হইনি বরং আমি রব্বুল আলামীনের রসূল। তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী পৌছে দিচ্ছি। আমি তোমাদের কল্যাণকামী। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি এমন সব কিছু জানি যা তোমরা জান না।

উল্লেখ করার উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর অসীম ক্ষমতা বর্ণনা ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের প্রমাণ তুলে ধরাই নয়, বরং সেই সাথে একটি উপমার সাহায্যে রিসালাত ও তার বরকতসমূহ এবং তার মাধ্যমে ভাল ও মন্দের মধ্যে এবং উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের মধ্যে পার্থক্যের চিত্র অংকন করাও এর লক্ষ। রসূলের আগমন এবং আল্লাহর শিক্ষা ও পথনির্দেশনা নাযিল হওয়াকে জলকণা বহনকারী বায়ু প্রবাহ ও রহমতের মেঘমালায় আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া এবং অমৃতধারাপূর্ণ বারিবিন্দু বর্ষণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আবার বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মৃত পতিত ভূমির অকস্মাত সঞ্জীবিত হওয়া এবং তার উদর থেকে জীবনের অঢেল সম্পদরাজি উৎসারিত হবার ঘটনাকে নবীর শিক্ষা, অনুশীলন ও নেতৃত্বে মৃত ভূপতিত মানবতার অকস্মাত জেগে ওঠার এবং তার বক্ষদেশ থেকে কল্যাণের স্রোতস্বিনী উৎসারিত হবার পরিস্থিতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, বৃষ্টি বর্ষণের ফলে এসব বরকত কেবলমাত্র এমনসব ভূমি লাভ করে, যা মূলত উর্বর কিন্তু নিছক পানির অভাবে যার শস্য উৎপাদনের যোগ্যতা চাপা পড়েছিল। ঠিক তেমনি রিসালাতের এ কল্যাণধারা থেকেও কেবলমাত্র সেই সব লোক লাভবান হতে পারে যারা মূলত মৃৎবৃত্তির অধিকারী এবং কেবলমাত্র নেতৃত্ব ও পথনির্দেশনা না পাওয়ার কারণে

যাদের যোগ্যতা ও সুস্থ মনোবৃত্তি সুস্পষ্ট রূপলাভ করার ও কর্মতৎপর হবার সুযোগ পায় না। অন্যদিকে দুষ্ট মনোবৃত্তির অধিকারী ও দুষ্কর্মশীল মানুষেরা হচ্ছে এমন ধরনের অনুর্বর জমির মত, যা রহমতের বারি বর্ষণে কোনক্রমেই লাভবান হয় না বরং বৃষ্টির পানি পড়ার সাথে সাথেই যার পেটের সমস্ত বিষ কাঁটা গাছ ও ঝোপ ঝাড়ের আকারে বের হয়ে আসে। অনুরূপভাবে রিসালাতের আবির্ভাবে তাদের কোন ফায়দা হয় না বরং উলটো তাদের অভ্যন্তরের সমস্ত দুষ্কৃতি ও শয়তানী মনোবৃত্তি পূর্ণোদ্যমে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

পরবর্তী কয়েকটি রুকূ'তে ধারাবাহিকভাবে ঐতিহাসিক প্রমাণ সহকারে এ উপমাটিকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, প্রত্যেক যুগে নবীর আগমনের পর মানব জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি ভাগ হচ্ছে সুস্থ ও সৎ চেতনা সম্পন্ন লোকদের। রিসালাতের অমিয় ধারায় অবগাহন করে তারা পরিপুষ্ট হয় এবং উন্নতি ও উত্তম ফলে ফুলে সুশোভিত হয়। আর দ্বিতীয় ভাগটি হচ্ছে দুষ্ট চেতনা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর। কষ্টিপাথরের সামনে আসার সাথে সাথেই তারা নিজেদের সমস্ত অসৎ প্রবণতার ডালি উন্মুক্ত করে দেয়। তাদের সমস্ত দুষ্কৃতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশেষে তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে ছেঁটে দূরে নিক্ষেপ করা হয় যেভাবে স্বর্ণকার রূপা ও সোনার ভেজাল অংশটুকু ছেঁটে দূরে নিক্ষেপ করে।

৪৭. হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায় থেকে এ ঐতিহাসিক বিবরণের সূচনা করা হয়েছে। কারণ কুরআনের দৃষ্টিতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম তাঁর সন্তানদের যে সৎ ও সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে যান, তাতে প্রথম বিকৃতি দেখা দেয় হযরত নূহের যুগে এবং এরি সংশোধন ও এ জীবন ব্যবস্থাকে আবার সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য মহান আল্লাহ হযরত নূহকে পাঠান।

কুরআনের ইংগিত ও বাইবেলের সুস্পষ্ট বর্ণনার পর একথা আজ নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে যে, বর্তমান ইরাকেই হযরত নূহের সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। বেবিলনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের অভ্যন্তরে বাইবেলের চাইতেও যে প্রাচীন লিপি পাওয়া গেছে তা থেকেও এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কুরআনে ও তাওরাতে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, ঐ প্রাচীন লিপিতেও তদ্রূপ এক কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঘটনাটি মুসেল–এর আশেপাশে ঘটেছিল বলে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কুর্দিস্তান ও আরমেনিয়া এলাকায় প্রাচীনকাল থেকে বংশ পরম্পরায় যেসব কিংবদন্তী চলে আসছে তা থেকেও জানা যায় যে, প্লাবনের পর হযরত নূহের নৌকা এ এলাকার কোন এক স্থানে থেমেছিল। আজো মুসেলের উত্তরে ইবনে উমর দ্বীপের আশেপাশে এবং আরমেনিয়া সীমান্তে 'আরারাত' পাহাড়ের আশেপাশে নূহ আলাইহিস সালামের বিভিন্ন নিদর্শন চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। 'নখচীওয়ান' শহরের অধিবাসীদের মধ্যে আজো এ প্রবাদ প্রচলিত যে, হযরত নূহ এ শহরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

নূহের প্লাবনের মত প্রায় একই ধরনের ঘটনার কথা গ্রীক, মিসর, ভারত ও চীনের প্রাচীন সাহিত্যেও পাওয়া যায়। এছাড়াও বার্মা, মালয়েশিয়া, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া, নিউগিনি এবং আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন এলাকায়ও এ একই ধরনের কিংবদন্তী প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এ ঘটনাটি এমন এক সময়ের সাথে সম্পর্কিত যখন সমগ্র মানব জাতি দুনিয়ার একই এলাকায়

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾

তোমরা কি এ জন্য অবাক হচ্ছো যে, তোমাদের কাছে তোমাদের স্বীয় সম্প্রদায়েরই এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের রবের স্মারক এসেছে, তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য যাতে তোমরা ভুল পথে চলা থেকে রক্ষা পাও এবং তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়?[৪৯] কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো। অবশেষে আমি তাকে ও তার সাথীদেরকে একটি নৌকায় (আরোহণ করিয়ে) রক্ষা করি এবং আমার আয়াতকে যারা মিথ্যা বলেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দেই।[৫০] নিসন্দেহে তারা ছিল দৃষ্টিশক্তিহীন জনগোষ্ঠী।

অবস্থান করতো, তারপর সেখান থেকে তাদের বংশধরেরা দুনিয়ার চতুরদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সকল জাতি তাদের উন্মেষকালীন ইতিহাসে একটি সর্বব্যাপী প্লাবনের ঘটনা নির্দেশ করেছে। অবশ্য কালের আবর্তনে এর যথার্থ বিস্তারিত তথ্যাদি তারা বিস্মৃত হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকে নিজের চিন্তা–ভাবনা অনুযায়ী আসল ঘটনার গায়ে প্রলেপ লাগিয়ে এক একটা বিরাট কল্পকাহিনী তৈরী করে নিয়েছে।

৪৮. কুরআন মজীদের এ স্থানে ও অন্যান্য স্থানে হযরত নূহ ও তাঁর সম্প্রদায়ের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এ সম্প্রদায়টি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না, তাঁর সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞও ছিল না এবং তাঁর ইবাদাত করতেও তারা অস্বীকার করতো না। বরং তারা প্রকৃতপক্ষে যে গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল সেটি ছিল শিরক। অর্থাৎ তারা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে অন্যান্য সত্তাকেও শরীক করতো এবং ইবাদাতলাভের অধিকারে তাদেরকে তাঁর সাথে হিস্‌সাদার মনে করতো। তারপর এ মৌলিক গোমরাহী থেকে এ জাতির মধ্যে অসংখ্য ত্রুটি ও দুষ্কৃতির জন্ম নেয়। যেসব মনগড়া মাবুদকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে অংশীদার গণ্য করা হয়েছিল, তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য জাতির মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্ম হয়। এ শ্রেণীটি সমস্ত ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসে। জাতিকে তারা উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে। সমাজ জীবন জুলুম ও বিপর্যয়ে ভরপুর করে তোলে। নৈতিক উচ্ছৃংখলতা, চারিত্রিক নৈরাজ্য ও পাপাচারের মাধ্যমে মানবতার মূলে কুঠারাঘাত করে। এ অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য হযরত নূহ আলাইহিস সালাম অত্যন্ত সবর, সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে দীর্ঘকাল প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালান। কিন্তু সাধারণ মানুষকে তারা নিজেদের প্রতারণা জালে এমনভাবে আবদ্ধ করে নেয় যার ফলে সংশোধনের কোন কৌশল কার্যকর প্রমাণিত হয়নি। অবশেষে হযরত নূহ (আ) আল্লাহর

কাছে এ মর্মে দোয়া করেন। হে আল্লাহ! এ কাফেরদের একজনকেও পৃথিবীর বুকে জীবিত ছেড়ে দিয়ো না। কারণ এদের কাউকে জীবিত ছেড়ে দিলে এরা তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করতে থাকবে এবং এদের বংশে যাদেরই জন্ম হবে তারাই হবে অসৎকর্মশীল, দুশ্চরিত্র ও বিশ্বাসঘাতক। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা হুদ ৩ রুকূ, সূরা শূ'আরা ৬ রুকূ ও সমগ্র সূরা নূহ)।

৪৯. এ ব্যাপারটি ঘটেছিল হযরত নূহ (আ) ও তাঁর জাতির মধ্যে। ঠিক এ একই ধরনের ঘটনা ঘটছিল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হযরত নূহের (আ) মত একই বাণী এনেছিলেন। মক্কার সরদাররা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ প্রকাশ করছিল সেই একই ধরনের সন্দেহ হাজার হাজার বছর আগে হযরত নূহের সম্প্রদায়ের প্রধানরাও পেশ করেছিল। আবার এসবের জবাবে হযরত নূহ (আ) যেসব কথা বলতেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেই একই কথা বলতেন। পরবর্তীতে অন্যান্য নবীদের ও তাদের জাতির যেসব ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে সেখানেও এটাই দেখানো হয়েছে যে, প্রত্যেক নবীর জাতির ভূমিকা মক্কাবাসীদের ভূমিকার সাথে এবং প্রত্যেক নবীর ভাষণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষণের সাথে পুরাপুরি সাদৃশ্য রাখে। এর সাহায্যে কুরআন তার পাঠক ও শ্রোতাদেরকে একথা বুঝাতে চায় যে, প্রতি যুগে মানুষের গোমরাহী মূলগতভাবে একই ধরনের ছিল এবং আল্লাহর পাঠানো মানবতার শিক্ষকদের দাওয়াতও প্রতিযুগে প্রত্যেকটি দেশে একই রকম ছিল। অনুরূপভাবে যারা নবীদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং নিজেদের গোমরাহীর নীতিতে অবিচল থেকেছে তাদের পরিণামও একই হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

৫০. কুরআনের বর্ণনাভংগীর সাথে যাদের ভাল পরিচয় নেই তারা অনেক সময় এ সন্দেহে পড়ে যান যে, সম্ভবত এই সমগ্র ব্যাপারটি একটি বা দু'টি বৈঠকেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। গোটা কার্যধারা এরূপ ছিল বলে মনে হয় যে, নবী এলেন এবং তিনি নিজের দাওয়াত পেশ করলেন। লোকেরা আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপন করলো এবং তিনি তার জবাব দিলেন। তারপর লোকেরা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো আর অমনি আল্লাহ আযাব পাঠিয়ে দিলেন। অথচ ব্যাপারটি ঠিক এমন নয়। যেসব ঘটনাকে যুথবদ্ধ করে এখানে মাত্র কয়েকটি বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো সংঘটিত হতে সুদীর্ঘকাল ও বছরের পর বছর সময় লেগেছিল। কুরআনের একটি বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতি হচ্ছে, কুরআন শুধুমাত্র গল্প বলার জন্য ঘটনা বা কাহিনী বর্ণনা করে যায় না বরং শিক্ষা দেবার জন্য বর্ণনা করে যায়। তাই সর্বত্র ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করার সময় কাহিনীর কেবলমাত্র সেই অংশটুকুই কুরআন উপস্থাপন করে, যার সাথে উদ্দেশ্য ও মূল বিষয়বস্তুর কোন সম্পর্ক থাকে। এ ছাড়া কাহিনীর অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়। আবার যদি কোন কাহিনীকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে থাকে তাহলে সর্বত্র উদ্দেশ্যর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন বিস্তারিত বিবরণও পেশ করে থাকে। যেমন এই নূহ আলাইহিস সালামের কাহিনীটির কথাই ধরা যাক। নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার ও তাকে মিথ্যুক বলার পরিণাম বর্ণনা করাই এখানে এর উদ্দেশ্য। কাজেই নবী যত দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিজের

জাতিকে দাওয়াত দিতে থেকেছেন, সে কথা বলার এখানে কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যেখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদেরকে সবর করার উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যে এ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে বিশেষভাবে নূহ আলাইহিস সালামের দাওয়াতের দীর্ঘ সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীগণ নিজেদের মাত্র কয়েক বছরের প্রচেষ্টা ও সাধনা ফলপ্রসূ হতে না দেখে হতোদ্যম না হয়ে পড়েন এবং অন্যদিকে তারা যেন নূহ আলাইহিস সালামের সবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, যিনি সুদীর্ঘকাল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক পরিবেশে সত্যের দাওয়াত দেয়া অব্যাহত রেখেছেন, এবং কোন সময় একটুও হতাশ হননি। (সূরা আনকাবূত, আয়াত–১৪)।

এখানে আর একটি সন্দেহও দেখা দেয়। এটি দূর করাও প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি যখন বারবার কুরআনে পড়তে থাকে, অমুক জাতি নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল, নবী তাদেরকে আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হবার খবর দিয়েছিলেন এবং অকস্মাত একদিন আল্লাহর আযাব এসে সেই জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এ সময় তার মনে প্রশ্ন জাগে, এ ধরনের ঘটনা এখন ঘটে না কেন? যদিও এখনো বিভিন্ন জাতির উত্থান পতন হয় কিন্তু এ উত্থান পতনের ধরনই আলাদা। এখন তো এমন হয় না যে, একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর ভূমিকম্প, প্লাবন বা ঝড় এলো এবং পুরো এক একটি জাতি ধ্বংস হয়ে গেলো। এর জবাবে বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে একজন নবী সরাসরি যে জাতিকে দাওয়াত দেন তার ব্যাপারটি অন্য জাতিদের ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। যে জাতির মধ্যে কোন নবীর জন্ম হয়, তিনি সরাসরি তার ভাষায় তার কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেন এবং নিজের নিখুঁত ব্যক্তি চরিত্রের মাধ্যমে নিজের বিশ্বস্ততা ও সত্যতার জীবন্ত আদর্শ তার সামনে তুলে ধরেন এতে করে তার সামনে আল্লাহর যুক্তি–প্রমাণ তথা তাঁর দাওয়াত পূর্ণরূপে উপস্থাপিত হয়েছে বলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় তার জন্য ওযর–আপত্তি পেশ করার আর কোন অবকাশই থাকে না। আল্লাহর পাঠানো রসূলকে সামনা–সামনি অস্বীকার করার পর তার অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছে, যার ফলে ঘটনাস্থলেই তার সম্পর্কে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যেসব জাতির কাছে আল্লাহর বাণী সরাসরি নয় বরং বিভিন্ন মাধ্যমে এসে পৌঁছেছে তাদের ব্যাপারটির ধরন এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কাজেই নবীদের সময় যেসব ঘটনার অবতারণা হতে দেখা যেতো এখন যদি আর সে ধরনের কোন ঘটনা না ঘটে থাকে তাহলে তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। কারণ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর নবুওয়াতের সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে হাঁ, কোন নবীকে সামনা সামনি প্রত্যাখ্যান করার পর কোন জাতির ওপর যে আযাব আসতো তেমনি ধরনের কোন আযাব যদি বর্তমানে কোন জাতির ওপর আসে তাহলে তাতেই বরং অবাক হতে হবে।

কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, বর্তমানে যেসব জাতি আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করছে এবং নৈতিক ও চিন্তাগত দিক দিয়ে গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে এখনো এসব জাতির ওপর আযাব আসছে। কখনো সতর্ককারী ছোট ছোট আযাব, আবার কখনো চূড়ান্ত ফায়সালাকারী বড় বড় আযাব। কিন্তু আম্বিয়া আলাহিমুস সালাম ও আসমানী কিতাবগুলোর মত এ আযাবগুলোর নৈতিক

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِى سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦٧﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّى وَأَنَا۠ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾

৯ রুকূ'

আর 'আদ' (জাতি)র[৫১] কাছে আমি পাঠাই তাদের ভাই হূদকে। সে বলে ঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। এরপরও কি তোমরা ভুল পথে চলার ব্যাপারে সাবধান হবে না?" তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করছিল, তারা বললো ঃ "আমরা তো তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত মনে করি এবং আমাদের ধারণা তুমি মিথ্যুক।" সে বললো ঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আমি নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত নই। বরং আমি রব্বুল আলামীনের রসূল, আমার রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের এমন হিতাকাংখী যার ওপর ভরসা করা যেতে পারে।

তাৎপর্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করছে না। বরং এর বিপরীত পক্ষে স্থূল দৃষ্টির অধিকারী বিজ্ঞানী, সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের একটি বিরাট গোষ্ঠী মানব জাতির ঘাড়ে চেপে বসে আছে। তারা এ ধরনের যাবতীয় ঘটনার ব্যাখ্যা করে প্রাকৃতিক আইন বা ঐতিহাসিক কার্যকারণের মানদণ্ডে। এভাবে তারা মানুষকে অচেতনতা ও বিস্মৃতির মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। তারা মানুষকে কখনো একথা বুঝার সুযোগ দেয় না যে, উপরে একজন আল্লাহ আছেন, তিনি অসৎকর্মশীল জাতিদেরকে প্রথমে তাদের অসৎকর্মের জন্য সতর্ক করে দেন, তারপর যখন তারা তাঁর পাঠানো সতর্ক সংকেতসমূহ থেকে চোখ বন্ধ করে নিয়ে নিজেদের অসৎকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে অবিশ্রান্তভাবে, তখন তিনি তাদেরকে ধ্বংসের আবর্তে নিক্ষেপ করেন।

৫১. 'আদ' ছিল আরবের প্রাচীনতম জাতি। আরবের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এদের কাহিনী প্রচলিত ছিল। ছোট ছোট শিশুরাও তাদের নাম জানতো। তাদের অতীত কালের প্রতাপ–প্রতিপত্তি ও গৌরব গাঁথা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। তারপর দুনিয়ার বুক থেকে

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾

তোমরা কি এ জন্য অবাক হচ্ছো যে, তোমাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তোমাদেরই স্বগোত্রীয় এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের রবের স্মারক তোমাদের কাছে এসেছে? ভুলে যেয়ো না, তোমাদের রব নূহের সম্প্রদায়ের পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন এবং অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ও সুঠাম দেহের অধিকারী করেন। কাজেই আল্লাহর অপরিসীম শক্তির কথা স্মরণ রাখো,[৫২] আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" তারা জবাব দিলো ঃ "তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্য এসেছো যে, আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবো। এবং আমাদের বাপ-দাদারা যাদের ইবাদাত করে এসেছে তাদেরকে পরিহার করবো?[৫৩] বেশ, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তাহলে আমাদের যে আযাবের হুমকি দিচ্ছো, তা নিয়ে এসো।"

তাদের নাম-নিশানা মুছে যাওয়াটাও প্রবাদের রূপ নিয়েছিল। আদ জাতির এ বিপুল পরিচিতির কারণেই আরবী ভাষায় প্রত্যেকটি প্রাচীন ও পুরাতন জিনিসের জন্য 'আদি' শব্দ ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষকে 'আদিয়াত' বলা হয়। যে জমির মালিক বেঁচে নেই এবং চাষাবাদকারী না থাকার কারণে যে জমি অনাবাদ পড়ে থাকে তাকে 'আদি-উল-আরদ' বলা হয়। প্রাচীন আরবী কবিতায় আমরা এ জাতির নামের ব্যবহার দেখি প্রচুর পরিমাণে। আরবের বংশধারা বিশেষজ্ঞগণও নিজেদের দেশের বিলুপ্ত জাতিদের মধ্যে সর্বপ্রথম এ জাতিটির নামোচ্চারণ করে থাকেন। হাদীসে বলা হয়েছে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বনু যহল ইবনে শাইবান গোত্রের এক ব্যক্তি আসেন। তিনি আদ জাতির এলাকার অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রাচীনকাল থেকে তাদের এলাকার লোকদের মধ্যে আদ জাতি সম্পর্কে যেসব কিংবদন্তী চলে আসছে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনান।

কুরআনের বর্ণনা মতে এ জাতিটির আবাসস্থল ছিল 'আহকাফ' এলাকা। এ এলাকাটি হিজায, ইয়ামন ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী 'রাবয়ুল খালী'র দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখান থেকে অগ্রসর হয়ে তারা ইয়ামনের পশ্চিম সমুদ্রোপকূল এবং ওমান ও হাজরা মাউত

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿٧١﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾

সে বললো ঃ "তোমাদের রবের অভিসম্পাত পড়েছে তোমাদের ওপর এবং তাঁর গযবও। তোমরা কি আমার সাথে এমন কিছু নাম নিয়ে বিতর্ক করছো, যেগুলো তৈরী করেছো তোমরা ও তোমাদের বাপ–দাদারা[৫৪] এবং যেগুলোর স্বপক্ষে আল্লাহ কোন সনদ নাযিল করেননি?[৫৫] ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করো এবং আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।" অবশেষে নিজ অনুগ্রহে আমি হূদ ও তার সাথীদেরকে উদ্ধার করি এবং আমার আয়াতকে যারা মিথ্যা বলেছিল এবং যারা ঈমান আনেনি তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেই।[৫৬]

থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিস্তৃত করেছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ জাতিটির নিদর্শনাবলী দুনিয়ার বুক থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু দক্ষিণ আরবের কোথাও কোথাও এখনো কিছু পুরাতন ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। সেগুলোকে আদ জাতির নিদর্শন মনে করা হয়ে থাকে। হাজরা মাউতে এক জায়গায় হযরত হূদ আলাইহিস সালামের নামে একটি কবরও পরিচিতি লাভ করেছে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে James R. Wellested নামক একজন ইংরেজ নৌ–সেনাপতি 'হিসনে গুরাবে" একটি পুরাতন ফলকের সন্ধান লাভ করেন এতে হযরত হূদ আলাইহিস সালামের উল্লেখ রয়েছে। এ ফলকে উৎকীর্ণ লিপি থেকে পরিষ্কার জানা যায়, এটি হযরত হূদের শরীয়াতের অনুসারীদের লেখা ফলক। (আল্ আহকাফ দেখুন)।

৫২. মূল শব্দটি হচ্ছে "আলা–"। এর আভিধানিক অর্থ নিয়ামতসমূহ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির প্রতীকসমূহ, এবং প্রশংসনীয় চারিত্রিক গুণাবলী। আয়াতের সার্বিক মর্ম এই যে, আল্লাহর অপার অনুগ্রহের কথাও মনে রেখো, আবার এটাও ভুলে যেও না যে, তিনি তোমাদের কাছ থেকে প্রদত্ত অনুগ্রহ ছিনিয়ে নেয়ারও ক্ষমতা রাখেন।

৫৩. এখানে আবার একথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ জাতিটিও আল্লাহকে অস্বীকার করতো না, আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল না। অথবা তাঁর ইবাদাত করতে অস্বীকার করছিল না। আসলে তারা হযরত হূদের একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করতে হবে এবং তাঁর

বন্দেগীর সাথে আর কারোর বন্দেগী যুক্ত করা যাবে না—এ বক্তব্যটিই মেনে নিতে অস্বীকার করছিল।

৫৪. অর্থাৎ তোমরা কাউকে বৃষ্টির দেবতা, কাউকে বায়ুর দেবতা, কাউকে ধন-সম্পদের দেবতা, আবার কাউকে রোগের দেবতা বলে থাকো। অথচ তাদের কেউ মূলত কোন জিনিসের স্রষ্টা ও প্রতিপালক নয়। বর্তমান যুগেও আমরা এর দৃষ্টান্ত দেখি। এ যুগেও লোকেরা দেখি কাউকে বিপদ মোচনকারী বলে থাকে। অথচ বিপদ থেকে উদ্ধার করার কোন ক্ষমতাই তার নেই। লোকেরা কাউকে 'গন্জ বখ্শ' (গুপ্ত ধন ভাণ্ডার দানকারী) বলে অভিহিত করে থাকে। অথচ তার কাছে কাউকে দান করার মত কোন ধনভাণ্ডার নেই। কাউকে 'দাতা' বলা হয়ে থাকে। অথচ সে কোন জিনিসের মালিকই নয়, যে কাউকে দান করতে পারবে। কাউকে 'গরীব নওয়াজ' আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। অথচ তিনি নিজেই গরীব। যে ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ফলে কোন গরীবকে প্রতিপালন ও তার প্রতি অনুগ্রহ করা যেতে পারে সেই ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে তার কোন অংশ নেই। কাউকে 'গউস' (ফরিয়াদ শ্রবণকারী) বলা হয় অথচ কারোর ফরিয়াদ শুনার এবং তার প্রতিকার করার কোন ক্ষমতাই তার নেই। কাজেই এ ধরনের যাবতীয় নাম বা উপাধি নিছক নাম বা উপাধি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নামগুলোর পিছনে কোন সত্তা বা ব্যক্তিত্ব নেই। যারা এগুলো নিয়ে ঝগড়া ও বিতর্ক করে তারা আসলে কোন বাস্তব জিনিসের জন্য নয়, বরং কেবল কতিপয় নামের জন্যই ঝগড়া ও বিতর্ক করে।

৫৫. অর্থাৎ তোমরা নিজেরাই যে আল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ রব বলে থাকো তিনি তোমাদের এ বানোয়াট ইলাহদের সার্বভৌম ক্ষমতা-কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের স্বপক্ষে কোন সনদ দান করেননি। তিনি কোথাও বলেননি যে, আমি অমুকের ও অমুকের কাছে আমার ইলাহী কর্তৃত্বের এ পরিমাণ অংশ স্থানান্তরিত করে দিয়েছি। কাউকে 'বিপদ ত্রাতা, অথবা 'গন্জ বখ্শ' হবার কোন পরোয়ানা তিনি দেননি। তোমরা নিজেরাই নিজেদের ধারণা ও কল্পনা অনুযায়ী তাঁর ইলাহী ক্ষমতার যতটুকু অংশ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করে দিয়েছো।

৫৬. 'নিশ্চিহ্ন করে দেই' অর্থাৎ তাদেরকে বিধ্বস্ত ও ধ্বংস করে দিয়েছি। দুনিয়ার বুক থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে দিয়েছি। প্রাথমিক পর্বের 'আদ' জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তাদের যাবতীয় নিদর্শনও দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, একথা আরববাসীদের ঐতিহাসিক কথামালা ও কিংবদন্তীসমূহ থেকেও প্রমাণিত হয় এবং আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারসমূহও এর সত্যতা প্রমাণ করে। তাই আরব ঐতিহাসিকগণ তাদেরকে বিলুপ্ত জাতি হিসেবেই গণ্য করে থাকেন। তারপর আদ জাতির কেবলমাত্র সেই অংশটুকুই দুনিয়ার বুকে রয়ে গেছে যারা ছিল হযরত হূদ আলাইহিস সালামের অনুসারী, এটাও আরব ইতিহাসের একটি স্বীকৃত সত্য। ইতিহাসে আদ জাতির এ অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় আদ নামে খ্যাত। উপরে আমরা হিস্‌নে গুরাবের যে পুরাতন ফলকটির কথা উল্লেখ করেছি সেটি আসলে তাদেরই স্মৃতিফলক। প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞগণ এ স্মৃতি ফলকে (এটিকে হযরত ঈসার জন্মের প্রায় ১৮ শত বছর পূর্বের লিখন বলে মনে করা হচ্ছে) যে উৎকীর্ণ লিখন পাঠ করেছেন, তার কতিপয় বাক্য নীচে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

১০ রুকূ'

আর সামূদের[৫৭] কাছে পাঠাই তাদের ভাই সালেহকে। সে বলে ঃ হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। আল্লাহর এ উটনীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন।[৫৮] কাজেই তাকে আল্লাহর জমিতে চরে খাবার জন্য ছেড়ে দাও। কোন অসদুদ্দেশ্যে এর গায়ে হাত দিয়ো না। অন্যথায় একটি যন্ত্রণাদায়ক আযাব তোমাদের ওপর আপতিত হবে। স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ আদ জাতির পর তোমাদেরকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যার ফলে আজ তোমরা তাদের সমতলভূমিতে বিপুলায়তন প্রাসাদ ও তার পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছো।[৫৯] কাজেই তাঁর সর্বময় ক্ষমতার স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যেয়ো না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।[৬০]

"আমরা সুদীর্ঘকাল এই দুর্গে এমন অবস্থায় অতিবাহিত করেছিলাম যখন অভাব অনটন থেকে আমাদের জীবন ছিল অনেক দূরে। আমাদের খালগুলো নদীর পানিতে ভরে থাকতো..........এবং আমাদের শাসকগণ এমন ধরনের বাদশাহ ছিলেন যারা ছিলেন অসৎ চিন্তা মুক্ত এবং দুষ্কৃতকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন। তারা হূদের শরীয়াত অনুযায়ী আমাদের ওপর শাসন কার্য পরিচালনা করতেন এবং উত্তম ফায়সালাসমূহ একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে নিতেন। আমরা মুজিযা ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান রাখতাম।"

কুরআনে যে কথা বিধৃত হয়েছে যে, আদ জাতির প্রাচীন মহিমা, গৌরব ও সমৃদ্ধির উত্তরাধিকারী তারাই হয়েছিল যারা হূদ আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান এনেছিল, এ লিপিটি আজো এরই সত্যতা প্রমাণ করে যাচ্ছে।

৫৭. এটি আরবের প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় জাতি। আদের পরে এরাই সবচেয়ে বেশী খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করে। কুরআন নাযিলের পূর্বে এদের কাহিনী সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। জাহেলী যুগের কবিতা ও খুতবা সাহিত্যে এর ব্যাপক উল্লেখ পাওয়া যায়। আসিরিয়ার শিলালিপি, গ্রীস, ইসকানদারীয়া ও রোমের প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণও এর উল্লেখ করেছেন। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের কিছুকাল পূর্বেও এ জাতির কিছু কিছু লোক বেঁচেছিল। রোমীয় ঐতিহাসিকগণের মতে, এরা রোমীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে এদের শত্রু নিবৃতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

উত্তর–পশ্চিম আরবের যে এলাকাটি আজো 'আল হিজর' নামে খ্যাত, সেখানেই ছিল এদের আবাস। আজকের সউদী আরবের অন্তর্গত মদীনা ও তাবুকের মাঝখানে হিজায রেলওয়ের একটি ষ্টেশন রয়েছে, তার নাম মাদায়েনে সালেহ। এটিই ছিল সামুদ জাতির কেন্দ্রীয় স্থান। প্রাচীনকালে এর নাম ছিল হিজ্‌র। সামূদ জাতির লোকেরা পাহাড় কেটে যেসব বিপুলায়তন ইমারত নির্মাণ করেছিল এখনো হাজার হাজার একর এলাকা জুড়ে সেগুলো অবস্থান করছে। এ নিঝুম পুরীটি দেখে আন্দাজ করা যায় যে, এক সময়ে এ নগরীর জনসংখ্যা চার পাঁচ লাখের কম ছিল না। কুরআন নাযিল হওয়ার সময়কালে হেজাযের ব্যবসায়ী কাফেলা এ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতো। তাবুক যুদ্ধের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ এলাকা অতিক্রম করছিলেন তখন তিনি মুসলমানদেরকে এ শিক্ষণীয় নিদর্শনগুলো দেখান এবং এমন শিক্ষা দান করেন যা এ ধরনের ধ্বংসাবশেষ থেকে একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এক জায়গায় তিনি একটি কুয়ার দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলেন, এ কুয়াটি থেকে হযরত সালেহের উটনী পানি পান করতো। তিনি মুসলমানদেরকে একমাত্র এ কুয়াটি থেকে পানি পান করতে বলেন এবং অন্য সমস্ত কুয়া থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেন। একটি গিরিপথ দেখিয়ে তিনি বলেন, এ গিরিপথ দিয়ে হযরত সালেহের উটনীটি পানি পান করতে আসতো। তাই সেই স্থানটি আজো 'ফাজ্জুন নাকাহ' বা 'উটনীর পথ' নামে খ্যাত হয়ে আছে। তাদের ধ্বংসস্তূপগুলোর মধ্যে যেসব মুসলমান ঘোরাফেরা করছিল তাদেরকে একত্র করে তিনি একটি ভাষণ দেন। এ ভাষণে সামূদ জাতির ভয়াবহ পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, এটি এমন একটি জাতির এলাকা যাদের ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছিল। কাজেই এ স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করে চলে যাও। এটা ভ্রমণের জায়গা নয় বরং কান্নার জায়গা।

৫৮. আয়াতটির আপাত বক্তব্য দৃষ্টে পরিষ্কার অনুভূত হয় যে, পূর্বের বাক্যটিতে আল্লাহর যে সুস্পষ্ট প্রমাণের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা এ পরবর্তী বাক্যটিতে 'নিদর্শন' হিসেবে উল্লেখিত উটনীটিই বুঝানো হয়েছে। সূরা 'শুআরা'র ৮ রুকূ'তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, সামূদ জাতির লোকেরা নিজেরাই হযরত সালেহের কাছে এমন একটি নিদর্শনের দাবী করেছিল যা তাঁর আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্তির দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾

তার সম্প্রদায়ের স্বঘোষিত প্রতাপশালী নেতারা দুর্বল শ্রেণীর মুমিনদেরকে বললো ঃ "তোমরা কি সত্যিই জানো, সালেহ তার রবের প্রেরিত নবী?" তারা জবাব দিলো ঃ "নিশ্চয়ই, যে বাণী সহকারে তাঁকে পাঠানো হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি।" ঐ শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদাররা বললো "তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা অস্বীকার করি।"

তারপর তারা সেই উটনীটিকে মেরে ফেললো,[৬১] পূর্ণদাম্ভিকতা সহকারে নিজেদের রবের হুকুম অমান্য করলো এবং সালেহকে বললো ঃ "নিয়ে এসো সেই আযাব, যার হুমকি তুমি আমাদের দিয়ে থাকো, যদি সত্যিই তুমি নবী হয়ে থাকো।"

প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এরি জবাবে হযরত সালেহ উটনীটি হাজির করেন। এ থেকে একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, উটনীর আবির্ভাব হয়েছিল মুজিযা হিসেবে এবং কোন কোন নবী তাঁদের নবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের দাবীর জবাবে যেসব মুজিযা পেশ করেছিলেন এটি ছিল সেই ধরনেরই একটি মুজিযা। তাছাড়া হযরত সালেহ এই উটনীটি হাজির করার পর যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাও এর অলৌকিক জন্মের প্রমাণ। তিনি নবুওয়াত অস্বীকারকারীদেরকে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, এখন এ উটনীটির প্রাণের সাথে তোমাদের জীবন জড়িত হয়ে গেছে। উটনীটি স্বাধীনভাবে তোমাদের ক্ষেতে চরে বেড়াবে। একদিন সে একাই পানি পান করবে এবং অন্যদিন সমগ্র জাতির যত পশু আছে সবাই পানি পান করবে। আর যদি তোমরা তার গায়ে কোনভাবে হাত উঠাও তাহলে অকস্মাত তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে আসবে। বলা বাহুল্য যে জিনিসটির অস্বাভাবিকতা লোকেরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল একমাত্র সেই জিনিসটি সম্পর্কেই এভাবে কথা বলা সম্ভব। উপরন্তু এ কথাও প্রণিধানযোগ্য যে, দীর্ঘদিন ধরে সামূদ জাতির লোকেরা তার স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানো এবং একদিন তার একাকী পানি পান করা অন্যদিন সমগ্র জাতির সমস্ত পশুদের পানি পান করার বিষয়টি অনিচ্ছা সত্ত্বেও

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّٰصِحِينَ ﴿٧٩﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

অবশেষে একটি প্রলয়ংকর দুর্যোগ তাদেরকে গ্রাস করলো[৬২] এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো। আর সালেহ একথা বলতে বলতে তাদের জনপদ থেকে বের হয়ে গেলো ঃ "হে আমার সম্প্রদায়! আমার রবের বাণী আমি তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি এবং আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু আমি কি করবো, তোমরা তো নিজেদের হিতাকাংখীকে পসন্দই কর না।"

আর লূতকে আমি পয়গম্বর করে পাঠাই। তারপর স্মরণ করো, যখন সে নিজের সম্প্রদায়ের[৬৩] লোকদেরকে বললো ঃ "তোমরা কি এতই নির্লজ্জ হয়ে গেলে যে, দুনিয়ায় ইতিপূর্বে কেউ কখনো করেনি এমন অশ্লীল কাজ করে চলছো? তোমরা মেয়েদের বাদ দিয়ে পুরুষদের দ্বারা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করছো?[৬৪] প্রকৃতপক্ষে তোমরা একেবারেই সীমালংঘনকারী গোষ্ঠী।"

বরদাশত করে এসেছে। অবশেষে অনেক শলা–পরামর্শ ও ষড়যন্ত্রের পর তারা তাকে হত্যা করে। অথচ তাদের হযরত সালেহকে ভয় করার কিছুই ছিল না। কারণ তাঁর কোন ক্ষমতা বা প্রতাপ ছিল না। এ অকাট্য ও জ্বলন্ত সত্য দ্বারা আরো প্রমাণিত হচ্ছে যে, তারা এ উটনীর ভয়ে ভীত–সন্ত্রস্ত ছিল। তারা জানতো, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন শক্তি আছে, তারই জোরে সে তাদের মধ্যে দোর্দণ্ড প্রতাপে ঘুরে বেড়ায়। উটনীটি কেমন ছিল এবং কিভাবে জন্ম লাভ কবলো, তার কোন বর্ণনা কুরআন দেয়নি। কোন নির্ভরযোগ্য সহীহ্ হাদীসেও এর বিস্তারিত কোন বিবরণ নেই। তাই এ উটনীটির জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে যেসব বর্ণনা মুফাসসিরগণ উদ্ধৃত করেছেন তা মেনে নেয়া অপরিহার্য নয়। কিন্তু এর জন্ম যে, কোন না কোনভাবে মুজিযা ও অলৌকিক ঘটনার পর্যায়ভুক্ত তা অবশ্যি কুরআন থেকে প্রমাণিত।

৫৯. সামূদদের এ গৃহ নির্মাণ শিল্পটি ছিল ভারতের ইলোরা, অজন্তা গুহা ও অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত পর্বত গাত্রের গৃহের ন্যায়। অর্থাৎ তারা পাহাড় কেটে তার মধ্যে বিরাট বিরাট ইমারত তৈরী করতো। মাদায়েনে সালেহ এলাকায় এখনো তাদের এসব ইমারত সম্পূর্ণ

অবিকৃত অবস্থায় রয়ে গেছে। সেগুলো দেখে এ জাতি স্থাপত্য বিদ্যায় কেমন বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করেছিল, তা অনুমান করা যায়।

৬০. অর্থাৎ আদ জাতির পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। তোমরা যদি আদদের মতো বিপর্যয় সৃষ্টি করতে থাকো, তাহলে যে মহান আল্লাহর অসাধারণ ক্ষমতা এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে তার জায়গায় তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন, সেই মহা শক্তিধর আল্লাহই আবার তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে অন্যদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন। (টীকা ৫২ দ্রষ্টব্য)।

৬১. সূরা কামার ও সূরা শামস–এর বর্ণনা অনুযায়ী যদিও এক ব্যক্তিই মেরেছিল তবুও যেহেতু সমগ্র জাতি এ অপরাধীর পেছনে ইন্ধন যুগিয়েছিল এবং অপরাধী লোকটি ছিল নিছক তার জাতির ক্রীড়নক মাত্র, তাই অভিযোগ আনা হয়েছে সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে। জাতির ইচ্ছা ও আকাংখা অনুযায়ী যে সমস্ত গুনাহ করা হয় অথবা যে সমস্ত গুনাহ করার ব্যাপারে জাতির সম্মতি ও সমর্থন থাকে কোন ব্যক্তিবিশেষ সেগুলো করলেও সেগুলোও জাতীয় গুনাহেরই পর্যায়ভুক্ত। শুধু তাই নয়, কুরআন বলে, জাতীয় অংগনে প্রকাশ্যে যে গুনাহ করা হয় এবং জাতি তা বরদাশত করে নেয় তাও জাতীয় পাপ হিসেবে বিবেচিত।

৬২. এ দুর্যোগকে এখানে رجفة (প্রলয়ংকর ও ভূকম্পনের সাহায্যে মৃত্যুদানকারী) বলা হয়েছে। অন্য স্থানে এ জন্য صيحة (চীৎকার), صاعقة (বজ্রপাত) ও طاغية (বিকট শব্দ) শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।

৬৩. বর্তমানে যে এলাকাটিকে ট্রান্স জর্ডান (شرق اردن) বলা হয় সেখানেই ছিল এ জাতিটির বাস। ইরাক ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থানে এ এলাকাটি অবস্থিত। বাইবেলে 'সাদূম'কে এ জাতির কেন্দ্রস্থল বলা হয়েছে। মৃত সাগরের (Dead Sea) নিকটবর্তী কোথাও এর অবস্থান ছিল। তালমূদে বলা হয়েছে, সাদূম ছাড়া তাদের আরো চারটি বড় বড় শহর ছিল। এ শহরগুলোর মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ এমনই শ্যামল সবুজে পরিপূর্ণ ছিল যে, মাইলের পর মাইল জুড়ে এ বিস্তৃত এলাকা যেন একটি বাগান মনে হতো। এ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করতো। কিন্তু আজ এ জাতির নাম–নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমনকি তাদের জনপদগুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত ছিল তাও আজ সঠিকভাবে জানা যায় না। মৃত সাগরই তাদের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে টিকে আছে। বর্তমানে এটি 'লূত সাগর' নামে পরিচিত।

হযরত লূত আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাইপো। তিনি চাচার সাথে ইরাক থেকে বের হন এবং কিছুকাল সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসর সফর করে দাওয়াত ও তাবলীগের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকেন। অতপর স্বতন্ত্রভাবে রিসালাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে এ পথ ভ্রষ্ট জাতিটির সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হন। সাদূমবাসীদের সাথে সম্ভবত তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে তাদেরকে তার সম্প্রদায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইহুদীদের হাতে বিকৃত বাইবেলে হযরত লূতের চরিত্রে বহুতর কলংক কালিমা লেপন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, তিনি নাকি হযরত ইবরাহীম

আলাইহিস সালামের সাথে ঝগড়াঝাঁটি করে সাদূম এলাকায় চলে গিয়েছিলেন। (আদিপুস্তক ১৩ঃ ১-১২) কিন্তু কুরআন এ মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করছে। কুরআনের বক্তব্য মতে আল্লাহ তাঁকে রসূল নিযুক্ত করে এ জাতির কাছে পাঠান।

৬৪. অন্যান্য স্থানে এ জাতির আরো কয়েকটি নৈতিক অপরাধের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে কেবলমাত্র তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধটির উল্লেখ করেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ অপরাধটির ফলে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয়।

এ ঘৃণ্য অপকর্মটির বদৌলতে এ জাতি যদিও দুনিয়ার বুকে চিরদিনই ধিক্কার ও কুখ্যাতি কুড়িয়েছে। কিন্তু অসৎ ও দুষ্কর্মশীল লোকেরা এ অপকর্মটি থেকে কখনো বিরত থাকেনি। তবে একমাত্র গ্রীকরাই এ একক কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে যে, তাদের দার্শনিকরা এ জঘন্য অপরাধটিকে উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণের পর্যায়ে পৌছিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। এরপর আর যেটুকু বাকি ছিল, আধুনিক ইউরোপ তা পূর্ণ করে দিয়েছে। ইউরোপে এর স্বপক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে। এমনকি একটি দেশের (জার্মানী) পার্লামেন্ট একে রীতিমতো বৈধ গণ্য করেছে। অথচ সমকামিতা যে সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরোধী একথা একটি অকাট্য সত্য। মহান আল্লাহ শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদন ও বংশরক্ষার উদ্দেশ্যেই সকল প্রাণীর মধ্যে নর-নারীর পার্থক্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। আর মানব জাতির মধ্যে এ বিভিন্নতার আর একটি বাড়তি উদ্দেশ্য হচ্ছে, নর ও নারী মিলে এক একটি পরিবারের জন্ম দেবে এবং তার মাধ্যমে সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্ গড়ে উঠবে। এ উদ্দেশ্যেই নারী ও পুরুষের দু'টি পৃথক লিংগের সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে। পারস্পরিক দাম্পত্য উদ্দেশ্য পূর্ণ করার উপযোগী করে তাদের শারীরিক ও মানসিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ ও মিলনের মধ্যে এমন একটি আনন্দ মধুর স্বাদ রাখা হয়েছে যা প্রকৃতির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য একই সংগে আকর্ষণকারী ও আহবায়কের কাজ করে এবং এ সংগে তাদেরকে দান করে এ কাজের প্রতিদানও। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃতির এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচরণ করে সমমৈথুনের মাধ্যমে যৌন আনন্দ লাভ করে সে একই সংগে কয়েকটি অপরাধ করে। প্রথমত সে নিজের এবং নিজের স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক কাঠামোর সাথে যুদ্ধ করে এবং তার মধ্যে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এর ফলে তাদের উভয়ের দেহ, মন ও নৈতিক বৃত্তির ওপর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। দ্বিতীয়ত সে প্রকৃতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। কারণ প্রকৃতি তাকে যে আনন্দ স্বাদ মানব জাতির ও মানবিক সংস্কৃতির সেবার প্রতিদান হিসেবে দিয়েছিল এবং যা অর্জন করাকে তার দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের সাথে শর্তযুক্ত করেছিল, সেই স্বাদ ও আনন্দ সে কোন প্রকার সেবামূলক কার্যক্রম, কর্তব্য পালন, অধিকার আদায় ও দায়িত্ব সম্পাদন ছাড়াই ভোগ করে। তৃতীয়ত সে মানব সমাজের সাথে প্রকাশ্য বিশ্বাঘাতকতা করে। কারণ সমাজ যে সমস্ত তামাদ্দুনিক প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছে সেগুলোকে সে ব্যবহার করে এবং তার সাহায্যে লাভবান হয়। কিন্তু যখন তার নিজের দেবার পালা আসে তখন অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা বহন করার পরিবর্তে সে নিজের সমগ্র শক্তিকে নিরেট স্বার্থপরতার সাথে এমনভাবে ব্যবহার করে, যা সামাজিক সংস্কৃতি ও নৈতিকতার জন্য কেবলমাত্র অপ্রয়োজনীয় ও অলাভজনকই হয় না বরং নিদারুণভাবে ক্ষতিকরও হয়। সে নিজেকে বংশ ও পরিবারের সেবার অযোগ্য করে

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

কিন্তু তার সম্প্রদায়ের জওয়াব এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, "এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা বড়ই পবিত্রতার ধ্বজাধারী হয়েছে।[৬৫] *শেষ পর্যন্ত আমি লূতের স্ত্রীকে ছাড়া—যে পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তরভুক্ত ছিল*[৬৬] *তাকে ও তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি এবং এ সম্প্রদায়ের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করি।*[৬৭] *তারপর সেই অপরাধীদের কী পরিণাম হয়েছিল দেখো।*[৬৮]

তোলে। নিজের সাথে অন্তত পক্ষে একজন পুরুষকে নারী সুলভ আচরণে লিপ্ত করে। আর এই সংগে কমপক্ষে দু'টি মেয়ের জন্য যৌন ভ্রষ্টতা ও নৈতিক অধপতনের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়।

৬৫. এ থেকে জানা যায়, এ লোকগুলো কেবল নির্লজ্জ, দুষ্কৃতিকারী ও দুশ্চরিত্রই ছিল না বরং তারা নৈতিক অধপতনের এমন চরমে পৌঁছে গিয়েছিল যে, নিজেদের মধ্যে কতিপয় সৎব্যক্তির ও সৎকর্মের দিকে আহবানকারী ও অসৎকর্মের সমালোচনাকারীর অস্তিত্ব পর্যন্ত বরদাশত করতে প্রস্তুত ছিল না। তারা অসৎকর্মের মধ্যে এতদূর ডুবে গিয়েছিল যে, সংশোধনের সামান্যতম আওয়াজও ছিল তাদের সহ্যের বাইরে। তাদের জঘন্যতম পরিবেশে পবিত্রতার যে সামান্যতম উপাদান অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল তাকেও তারা উৎখাত করতে চাইছিল। এ ধরনের একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত হয়। কারণ যে জাতির সমাজ জীবনে পবিত্রতার সামান্যতম উপাদানও অবশিষ্ট থাকে না তাকে পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়ে রাখার কোন কারণই থাকতে পারে না। পচা ফলের ঝুড়িতে যতক্ষণ কয়েকটি ভাল ফল থাকে ততক্ষণ ঝুড়িটি যত্নের সাথে রেখে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এ ভাল ফলগুলো ঝুড়ি থেকে বের করে নেয়ার পর এই ঝুড়িটি যত্নের সাথে সংরক্ষিত করে রাখার পরিবর্তে পথের ধারে কোন আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করারই যোগ্য হয়ে পড়ে।

৬৬. অন্যান্য স্থানে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, হযরত লূতের এ স্ত্রীটি সম্ভবত এ সম্প্রদায়েরই কন্যা ছিল, সে তার নিজের কাফের আত্মীয়গোষ্ঠীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায় এবং শেষ সময় পর্যন্তও তাদের সংগ ছাড়েনি। তাই আযাব আসার পূর্বে মহান আল্লাহ যখন হযরত লূত ও তাঁর ঈমানদার সাথীদেরকে হিজরত করার নির্দেশ দেন তখন তাঁর ঐ স্ত্রীকে সংগে নিতে নিষেধ করেন।

৬৭. বৃষ্টি মানে এখানে পানি–বৃষ্টি নয় বরং পাথর–বৃষ্টি। কুরআনের অন্যান্য স্থানে এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া কুরআনে একথাও বলা হয়েছে যে, তাদের জনপদসমূহ উল্টিয়ে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

৬৮. এখানে এবং কুরআনের আরো বিভিন্ন স্থানে কেবল এতটুকুন বলা হয়েছে যে, লূত জাতি একটি অতি জঘন্য ও নোংরা পাপ কাজের অনুশীলন করে যাচ্ছিল এবং এ ধরনের পাপ কাজের পরিণামে এ জাতির ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসে। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা থেকে আমরা একথা জানতে পেরেছি যে, এটি এমন একটি অপরাধ সমাজ অংগনকে যার কলুষমুক্ত রাখার চেষ্টা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং এ ধরনের অপরাধকারীদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া উচিত। এ প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিতে বলা হয়েছে : اقتلوا الفاعل والمفعول به (এ অপরাধকারী ও যার সাথে সে অপরাধ করেছে তাদের উভয়কে হত্যা করো)। আবার কোনটিতে এর ওপর এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে : احصنا اولم يحصنا (বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত)। আবার কোথাও এও বলা হয়েছে : فارجموا الاعلى والاسفل (ওপরের ও নীচের উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করো) কিন্তু যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এ ধরনের কোন মামলা আসেনি তাই এর শাস্তি কিভাবে দেয়া হবে, তা অকাট্যভাবে চিহ্নিত হতে পারেনি। সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আলীর (রা) মতে অপরাধীকে তরবারির আঘাতে হত্যা করতে হবে এবং কবরস্থ করার পরিবর্তে তার লাশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। হযরত আবু বকর (রা) এ মত সমর্থন করেন। হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমানের (রা) মতে কোন পতনোন্মুখ ইমারতের নীচে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ইমারতটিকে তার ওপর ধ্বসিয়ে দিতে হবে। এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাসের (রা) ফতোয়া হচ্ছে, মহল্লার সবচেয়ে উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে তাকে পা উপরের দিকে এবং মাথা নীচের দিকে করে নিক্ষেপ করতে এবং এই সংগে উপর থেকে তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। ফকীহদের মধ্যে ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, অপরাধী ও যার সাথে অপরাধ করা হয়েছে তারা বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত, তাদের উভয়কে হত্যা করা ওয়াজিব। শা'বী, যুহরী, মালিক ও আহমদ রাহেমাহুমুল্লাহ বলেন, তাদের শাস্তি হচ্ছে রজম অর্থাৎ পাথর মেরে হত্যা করা। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, আতা, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ, সুফিয়ান সওরী ও আওযাঈর (রাহেমাহুমুল্লাহর) মতে যিনার অপরাধে যে শাস্তি দেয়া হয় এ অপরাধে সেই একই শাস্তি দেয়া হবে। অর্থাৎ অবিবাহিতকে একশত বেত্রাঘাত করে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে এবং বিবাহিতকে রজম করা হবে। ইমাম আবু হানীফার (র) মতে, তার ওপর কোন দণ্ডবিধি নির্ধারিত নেই বরং এ কাজটি এমন যে, সরকার তার বিরুদ্ধে অবস্থা ও প্রয়োজন অনুপাতে যে কোন শিক্ষণীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এর সমর্থনে ইমাম শাফেঈর একটি বক্তব্যও পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তির তার নিজের স্ত্রীর সাথেও লূত জাতির কুকর্ম করা চূড়ান্তভাবে হারাম। আবু দাউদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে : ملعون من اتى المراة فى دبرها (যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাদ্দেশে যৌন

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

১১ রুকূ'

আর মাদ্‌ইয়ানবাসীদের[৬৯] কাছে আমি তাদের ভাই শো'আইবকে পাঠাই। সে বলে ঃ হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা এসে গেছে। কাজেই ওজন ও পরিমাপ পুরোপুরি দাও, লোকদের পাওনা জিনিস কম করে দিয়ো না[৭০] এবং পৃথিবী পরিশুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর তার মধ্যে আর বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।[৭১] এরই মধ্যে রয়েছে তোমাদের কল্যাণ, যদি তোমরা যথার্থ মুমিন হয়ে থাকো।[৭২]

কার্য করে সে অভিশপ্ত)। ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী উদ্ধৃত হয়েছে ঃ لا ينظر الله الى رجل جامع امراته فى دبرها (যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর পশ্চাদ্দেশে যৌন সংগমে লিপ্ত হয় আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না)। ইমাম তিরমিযী তাঁর আর একটি নির্দেশ উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

من اتى حائضا او امراة فى دبرها او كاهنا فصدقه كفربما انزل على محمد

"যে ব্যক্তি ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে অথবা নিজের স্ত্রীর পশ্চাদ্দেশে যৌন কার্য করে বা কোন গণকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে মুহাম্মাদের (সা) প্রতি অবতীর্ণ বিধান অস্বীকার করে।"

৬৯. মাদ্‌ইয়ানের (মাদায়েন) মূল এলাকাটি হিজাযের উত্তর পশ্চিমে এবং ফিলিস্তিনের দক্ষিণে লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিল। তবে সাইনা (সিনাই) উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলেও এর কিছুটা অংশ বিস্তৃত ছিল। এখানকার অধিবাসীরা ছিল একটি বিরাট ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। প্রাচীন যুগে যে বাণিজ্যিক সড়কটি লোহিত সাগরের উপকূল ধরে ইয়ামন থেকে মক্কা ও ইয়াম্বু হয়ে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং দ্বিতীয় যে বাণিজ্যিক সড়কটি ইরাক থেকে মিসরের দিকে চলে যেতো তাদের ঠিক

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۠ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

আর লোকদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করার, ঈমানদারদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেবার এবং সোজা পথকে বাঁকা করার জন্য (জীবনের) প্রতিটি পথে লুটেরা হয়ে বসে থেকো না। স্মরণ করো, সেই সময়ের কথা যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক। তারপর আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেন। আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরা কোন্ ধরনের পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে তা একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখো। যে শিক্ষা সহকারে আমাকে পাঠানো হয়েছে, তোমাদের মধ্য থেকে কোন একটি দল যদি তার প্রতি ঈমান আনে এবং অন্য একটি দল যদি তার প্রতি ঈমান না আনে তাহলে ধৈর্যসহকারে দেখতে থাকো, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেন। আর তিনিই সবচেয়ে ভাল ফায়সালাকারী।

সন্ধিস্থলে এ জাতির জনপদগুলো অবস্থিত ছিল। এ কারণে আরবের ছোট বড় সবাই মাদ্‌ইয়ানী জাতি সম্পর্কে জানতো এবং এ জাতিটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরও সারা আরবে এর খ্যাতি অপরিবর্তিত থাকে। কারণ আরববাসীদের বাণিজ্যিক কাফেলা মিসর ও ইরাক যাবার পথে দিন রাত এর ধ্বংসাবশেষের ভেতর দিয়েই চলাচল করতো।

মাদ্‌ইয়ানবাসীদের সম্পর্কে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা ভালভাবে জেনে নিতে হবে। সেটি হচ্ছে, এ মাদ্‌ইয়ানের অধিবাসীরা হযরত ইবরাহীমের পুত্র মিদিয়ান–এর সাথে বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। মিদিয়ান ছিলেন হযরত ইবরাহীমের তৃতীয় স্ত্রী কাতুরা–এর গর্ভজাত সন্তান। প্রাচীন যুগের নিয়ম অনুযায়ী যারা কোন খ্যাতিমান পুরুষের সাথে সম্পর্কিত থাকতো তাদেরকে কালক্রমে ঐ ব্যক্তির সন্তান গণ্য করে 'অমুকের বংশধর' বলা হতো। এ নিয়ম অনুযায়ী আরবের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ বনী ইসমাঈল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অন্যদিকে ইয়াকূবের (অন্য নাম ইসরাঈল) সন্তানদের হাতে ইসলাম গ্রহণকারীদের সবাই বনী ইসরাঈল নামে অভিহিত হয়। অনুরূপভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পুত্র মিদিয়ানের প্রভাবিত মাদ্‌ইয়ানের অধিবাসীগণ বনী মিদিয়ান নামে পরিচিত হয় এবং তাদের দেশের নামই হয়ে যায় মাদ্‌ইয়ান বা মিদিয়ান। এ ঐতিহাসিক তথ্যটি জানার পর এ ক্ষেত্রে একথা ধারণা করার আর কোন কারণই থাকে

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾

নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মত্ত গোত্রপতিরা তাকে বললো : "হে শো'আইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবো। অন্যথায় তোমাদের ফিরে আসতে হবে আমাদের ধর্মে।" শো'আইব জবাব দিলো : "আমরা রাজি না হলেও কি আমাদের জোর করে ফিরিয়ে আনা হবে? তোমাদের ধর্ম থেকে আল্লাহ আমাদের উদ্ধার করার পর আবার যদি আমরা তাতে ফিরে আসি, তাহলে আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী বিবেচিত হবো। আমাদের রব আল্লাহ যদি না চান, তাহলে আমাদের পক্ষে সে দিকে ফিরে যাওয়া আর কোনক্রমেই সম্ভব নয়।[৭৩] আমাদের রবের জ্ঞান সমস্ত জিনিসকে ঘিরে আছে। আমরা তাঁরই ওপর নির্ভর করি। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যথাযথভাবে ফায়সালা করে দাও এবং তুমি সবচেয়ে ভাল ফায়সালাকারী।"

না যে, এ জাতিটি সর্বপ্রথম হযরত শো'আইব আলাইহিস সালামের মাধ্যমেই সত্য দীন তথা ইসলামের দাওয়াত পেয়েছিল। আসলে শুরুতে বনী ইসরাঈলদের মত এরাও ছিল মুসলমান। শো'আইব আলাইহিস সালামের আবির্ভাবকালে এদের অবস্থা ছিল একটি বিকৃত মুসলিম মিল্লাতের মত, যেমন মূসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাবকালে ছিল বনী ইসরাঈলের অবস্থা। হযরত ইবরাহীমের পরে ছয় সাত শো বছর পর্যন্ত এরা মুশরিক ও চরিত্রহীন জাতিদের মধ্যে বসবাস করতে করতে শিরক ও নানা রকমের দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এদের ঈমানের দাবী ও সে জন্য অহংকার করার মনোবৃত্তি অপরিবর্তিত ছিল।

৭০. এ থেকে জানা যায়, এ জাতির দু'টি বড় দোষ ছিল। একটি শিরক এবং অন্যটি ব্যবসায়িক লেন দেনে অসাধুতা। এ দু'টি দোষ সংশোধন করার জন্য হযরত শো'আইব আলাইহিস সালামকে তাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল।

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ
إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩١﴾
الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا
كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾

তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যারা তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল, পরস্পরকে বললো ঃ "যদি তোমরা শো'আইবের আনুগত্য মেনে নাও, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।"[৭৪] কিন্তু সহসা একটি প্রলয়ংকরী বিপদ তাদেরকে পাকড়াও করে এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে, যারা শোআইবকে মিথ্যা বলেছিল তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় যেন সেই সব গৃহে কোনদিন তারা বসবাসই করতো না। শো'আইবকে যারা মিথ্যা বলেছিল অবশেষে তারাই ধ্বংস হয়ে যায়।[৭৫] আর শো'আইব একথা বলতে বলতে তাদের জনপদ থেকে বের হয়ে যায়—"হে আমার জাতির লোকেরা! আমি আমার রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনার হক আদায় করেছি। এখন আমি এমন জাতির জন্য দুঃখ করবো কেন, যারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করে?"[৭৬]

৭১. এ বাক্যটির যথাযথ ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে সূরা আরাফের ৪৪ ও ৪৫নং টীকায় করা হয়েছে। এখানে হযরত শো'আইব তাঁর এ উক্তিটির মাধ্যমে আভাসে ইংগিতে যে কথাটি বিশেষভাবে বলতে চেয়েছেন তা এই যে, পূর্ববর্তী নবীগণের বিধান ও পথনির্দেশনার ভিত্তিতে সত্য দীন ও সৎ চারিত্রিক গুণাবলীতে ভূষিত যে জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এখন তোমরা নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও নৈতিক দুষ্কৃতির মাধ্যমে তাকে বিনষ্ট করে দিয়ো না।

৭২. এ বাক্যটি থেকে পরিষ্কার জানা যায়, তারা নিজেরা ঈমানের দাবীদার ছিল। ওপরের আলোচনায় আমি এদিকে ইংগিত করেছি। তারা আসলে ছিল গোমরাহ ও বিকৃত মুসলমান। বিশ্বাসগত ও চারিত্রিক বিপর্যয়ে লিপ্ত থাকলেও তারা কেবল ঈমানের দাবীই করতো না বরং এ জন্য তাদের গর্বও ছিল। তাই হযরত শো'আইব বলেন, যদি তোমরা মুমিন হও, তাহলে তোমাদের এ বিশ্বাসও থাকা উচিত যে, সততা ও বিশ্বস্ততার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত এবং যেসব দুনিয়া পূজারী লোক আল্লাহ ও আখেরাতকে স্বীকার করে না তোমাদের ভাল–মন্দের মানদণ্ড তাদের থেকে আলাদা হওয়া উচিত।

৭৩. এ বাক্যটি ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে অর্থে আমরা ইনশাআল্লাহ বলে থাকি এবং যে সম্পর্কে সূরা কাহাফে (আয়াত ২৩–২৪) বলা হয়েছে ঃ কোন জিনিস

সম্পর্কে দাবী সহকারে একথা বলো না, আমি এমনটি করবো বরং এভাবে বলো, যদি আল্লাহ চান তাহলে আমি এমনটি করবো। কারণ যে মুমিন আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্ব এবং নিজের দাসত্ব, অধীনতা ও বশ্যতা সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধির অধিকারী হয়, সে কখনো নিজের শক্তির ওপর ভরসা করে এ দাবী করতে পারে না—আমি অমুক কাজটি করেই ছাড়বো অথবা অমুক কাজটি কখনো করবোই না। বরং সে এভাবে বলবে, আমার এ কাজ করার বা না করার ইচ্ছা আছে কিন্তু আমার এ ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া তো আমার মালিকের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে, তিনি তাওফীক দান করলে আমি সফলকাম হবো অন্যথায় ব্যর্থ হয়ে যাবো।
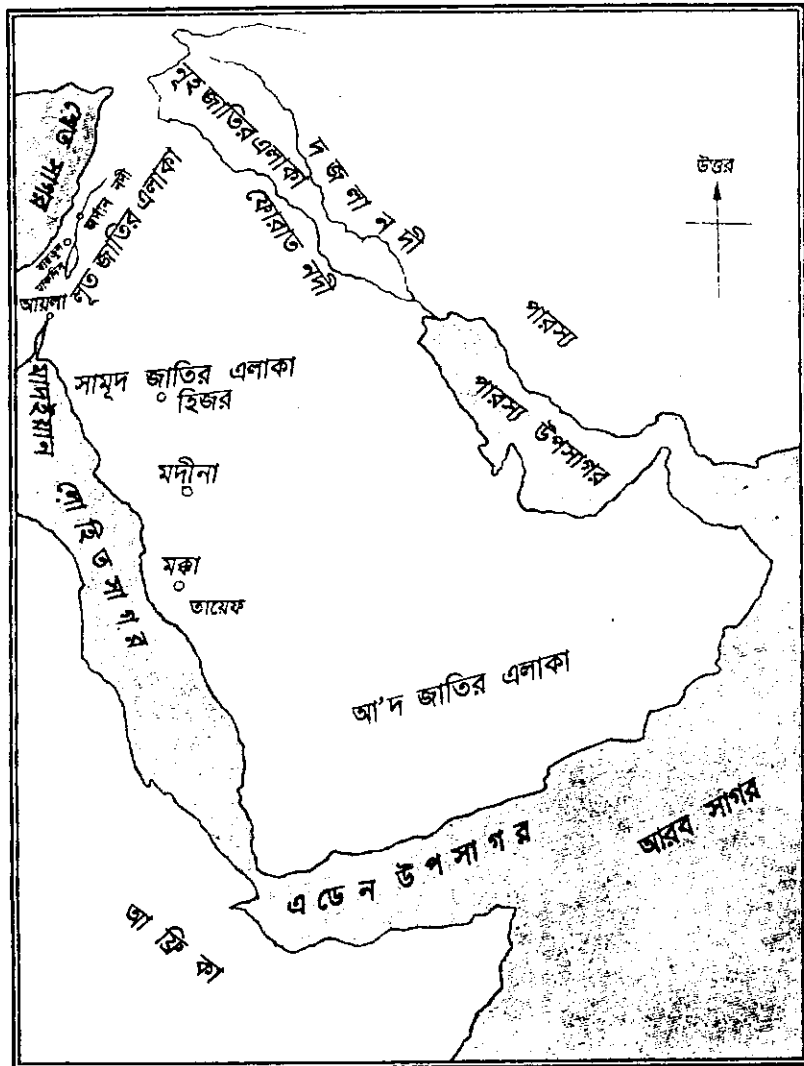
সূরা আল আ'রাফে উল্লেখিত জাতিসমূহের এলাকা

৭৪. এ ছোট বাক্যটির ওপর ভাসা ভাসা দৃষ্টি বুলিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এটি থমকে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার একটি স্থান। মাদ্‌ইয়ানের সরদাররা ও নেতারা আসলে যে কথা বলছিল এবং নিজের জাতিকেও বিশ্বাস করাতে চাইছিল তা এই যে, শো'আইব যে সততা ও ঈমানদারীর দাওয়াত দিচ্ছেন এবং মানুষকে নৈতিকতা ও বিশ্বস্ততার যেসব স্বতন্ত্র মূলনীতির অনুসারী করতে চাচ্ছেন, সেগুলো মেনে নিলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। আমরা যদি পূর্ণ সততার সাথে ব্যবসায় করতে থাকি এবং কোন প্রকার প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে ঈমানদারীর সাথে পণ্য বেচাকেনা করতে থাকি তাহলে আমাদের ব্যবসা কেমন করে চলবে? আমরা দুনিয়ার দু'টি সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক সড়কের সন্ধিস্থলে বাস করি এবং মিসর ও ইরাকের মতো দু'টি বিশাল সুসভ্য ও উন্নত রাষ্ট্রের সীমান্তে আমাদের জনপদ গড়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় আমরা যদি বাণিজ্যিক কাফেলার মালপত্র ছিনতাই করা বন্ধ করে দিয়ে শান্তিপ্রিয় হয়ে যাই তাহলে বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আমরা এতদিন যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ করে আসছিলাম তা একদম বন্ধ হয়ে যাবে এবং আশেপাশের বিভিন্ন জাতির ওপর আমাদের যে প্রতাপ ও আধিপত্য কায়েম আছে তাও খতম হয়ে যাবে। এ ব্যাপারটি কেবল শো'আইবের সম্প্রদায়ের প্রধানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রত্যেক যুগের পথভ্রষ্ট লোকেরা সত্য, ন্যায়, সততা ও বিশ্বস্ততার নীতি অবলম্বন করার মধ্যে এমনি ধরনেরই বিপদের আশংকা করেছে। প্রত্যেক যুগের নৈরাজ্যবাদীরা একথাই চিন্তা করেছে যে, ব্যবসায়–বাণিজ্য, রাজনীতি এবং অন্যান্য পার্থিব বিষয়াবলী মিথ্যা, বেঈমানী ও দুর্নীতি ছাড়া চলতে পারে না। প্রত্যেক জায়গায় সত্যের দাওয়াতের মোকাবিলায় যেসব বড় বড় অজুহাত পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, যদি দুনিয়ার প্রচলিত পথ থেকে সরে গিয়ে এ দাওয়াতের অনুসরণ করা হয় তাহলে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।

৭৫. মাদ্‌ইয়ানের এ ধ্বংসলীলা দীর্ঘকাল পর্যন্ত আশেপাশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। তাই দেখা যায়, দাউদ আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ যবুরের এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ হে খোদা! অমুক অমুক জাতি তোমার বিরুদ্ধে অংগীকারাবদ্ধ হয়েছে, কাজেই তুমি তাদের সাথে ঠিক তেমনি ব্যবহার করো যেমন মিদিয়ানের সাথে করেছিলে। (৮৩ ঃ ৫–৯) ইয়াসূঈয়াহ নবী এক স্থানে বনী ইসরাঈলকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন, আশূরীয়দেরকে ভয় করো না যদিও তারা তোমাদের জন্য মিসরীয়দের মতই জালেম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বেশী দেরী হবে না, বাহিনীগণের প্রভু তাদের ওপর নিজের দণ্ড বর্ষণ করবেন এবং তাদের সেই একই পরিণতি হবে যেমন মিদিয়ানের হয়েছিল। (যিশাইয় ১০ ঃ ২২–২৬)।

৭৬. এখানে যতগুলো কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে সবগুলোতে আসলে "একজনের ঘটনা বর্ণনা করে তার মধ্যে অন্যজনের চেহারা দেখানোর রীতি অবলম্বন করা হয়েছে। এখানকার প্রত্যেকটি কাহিনী সে সময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর জাতির মধ্যে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছিল তার সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রত্যেকটি কাহিনী ও ঘটনার এক পক্ষে একজন নবী আছেন। তাঁর শিক্ষা, দাওয়াত, উপদেশ ও কল্যাণকামিতা এবং তাঁর সমস্ত কথাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুরূপ।

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٥﴾ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾

১২ রুকূ'

আমি যখনই কোন জনপদে নবী পাঠিয়েছি, সেখানকার লোকদেরকে প্রথমে অর্থকষ্ট ও দুঃখ–দুর্দশার সম্মুখীন করেছি, একথা ভেবে যে, হয়তো তারা বিনম্র হবে ও নতি স্বীকার করবে। তারপর তাদের দুরবস্থাকে সমৃদ্ধিতে ভরে দিয়েছি। ফলে তারা প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং বলতে শুরু করেছে "আমাদের পূর্বপুরুষদের ওপরও দুর্দিন ও সুদিনের আনাগোনা চলতো।" অবশেষে আমি তাদেরকে সহসাই পাকড়াও করেছি। অথচ তারা জানতেও পারেনি।[৭৭] যদি জনপদের লোকেরা ঈমান আনতো এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকতসমূহের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু তারা তো প্রত্যাখ্যান করেছে। কাজেই তারা যে অসৎকাজ করে যাচ্ছিলো তার জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি।

আর প্রত্যেকটি কাহিনীর দ্বিতীয় পক্ষে আছে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও জাতি। তাদের আকীদাগত বিভ্রান্তি, নৈতিক চরিত্রহীনতা, মূর্খতা জনিত হঠকারিতা, তাদের গোত্র প্রধানদের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা এবং সত্য অস্বীকারকারী লোকদের নিজেদের গোমরাহীর ব্যাপারে একগুয়েমী ইত্যাদি সবকিছুই ঠিক তেমনটি যেমন কুরাইশদের মধ্যে পাওয়া যেতো। আবার প্রত্যেকটি কাহিনীতে সত্য অস্বীকারকারী জাতিগুলোর যে পরিণাম দেখানো হয়েছে তার মাধ্যমে আসলে কুরাইশদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহর পাঠানো নবীদের কথা না মানো এবং চরিত্র সংশোধনের যে সুযোগ তোমাদের দেয়া হচ্ছে অন্ধ জিদ ও গোয়ার্তুমীর বশবর্তী হয়ে তা হেলায় হারিয়ে বসো, তাহলে চিরদিন গোমরাহী ও ফিত্না–ফাসাদের ক্ষেত্রে জিদ ধরে বিভিন্ন জাতি যেমন পতন ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে, তোমরাও তেমনি ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

৭৭. এক একজন নবী ও এক একটি সম্প্রদায়ের ব্যাপার আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করার পর এবার একটি সাধারণ ও সর্বব্যাপী নিয়ম ও বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রতি যুগে

প্রত্যেক নবীকে প্রেরণ করার সময় মহান আল্লাহ এ নিয়মটি অবলম্বন করেন। নিয়মটি হচ্ছে, যখনই কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন নবী পাঠানো হয়েছে তখনই প্রথমে সেই সম্প্রদায়ের বাহ্যিক পরিবেশকে নবীর দাওয়াত গ্রহণের জন্য সর্বাধিক অনুকূল ও উপযোগী বানানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে রকমারি দুর্যোগ দুর্বিপাক ও বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বাণিজ্যিক ক্ষয়ক্ষতি, সামরিক পরাজয় ও এ ধরনের আরো নানান দুর্ভোগ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে তাদের মন নরম হয়ে যায়, অহংকার ও ঔদ্ধত্যে দৃপ্ত গ্রীবা নত হয়, শক্তিমদমত্ততা ও ধনলিপ্সা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। নিজেদের উপায়–উপকরণ, শক্তি ও যোগ্যতার ওপর নির্ভরতা ভেংগে পড়ে এবং তারা যাতে অনুভব করতে পারে যে, ওপরে অন্য কোন শক্তিধর সত্তা আছে এবং তারই হাতে রয়েছে তাদের ভাগ্যের লাগাম। এভাবে উপদেশের বাণী শোনার জন্য তাদের কান খুলে যাবে এবং নিজেদের প্রভু পরওয়ারদিগারের সামনে সবিনয়ে শির আনত করার জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে যাবে। তারপর এ ধরনের উপযোগী পরিবেশেও তাদের মন সত্যকে গ্রহণ করতে উদ্যোগী না হলে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের পরীক্ষার মধ্যে তাদেরকে ঠেলে দেয়া হয়। এখান থেকেই শুরু হয় তাদের ধ্বংসের প্রক্রিয়া। প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির মধ্যে জীবন যাপন করার সময় তারা নিজেদের দুর্দিনের কথা ভুলে যায়। তাদের বিকৃত বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন নেতৃবর্গ তাদের মনোজগতে ইতিহাসের এ নির্বোধ সুলভ ধারণা ঢুকিয়ে দেয় যে, জগতে যা কিছু উত্থান পতন ও ভাংগা–গড়া চলছে, তা কোন বিচক্ষণ কুশলী সত্তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় হচ্ছে না এবং কোন নৈতিক কারণেও হচ্ছে না। বরং একটি অচেতন ও অন্ধ প্রকৃতি সম্পূর্ণ নীতি বিবর্জিত কার্যকারণের ভিত্তিতে কখনো ভালো ও কখনো মন্দ দিনের উদ্ভব ঘটাতে থাকে। কাজেই ঝড়–ঝন্ঝা ও বিপদ–আপদের অবতারণা থেকে কোন নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করা এবং কোন শুভাকাংখীর সদুপদেশ মেনে নিয়ে আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়া এক ধরনের মানসিক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নির্বোধসুলভ মানসিকতারই নকশা এঁকেছেন নিম্নোক্ত হাদীসটিতে।

لاَ يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ ذُنُوْبِهِ ، وَالْمُنَافِقُ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ لاَ يَدْرِىْ فِيْمَ رَبَطَهُ اَهْلُهُ وَلاَ فِيْمَ اَرْسَلُوْهُ -

"বিপদ–মুসিবত তো মুমিনকে পর্যায়ক্রমে সংশোধন করতে থাকে, অবশেষে যখন সে এ চুল্লী থেকে বের হয় তখন তার সমস্ত ভেজাল ও খাদ পুড়ে সে পরিচ্ছন্ন ও খাঁটি হয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু মুনাফিকের অবস্থা হয় ঠিক গাধার মতো। সে কিছুই বোঝে না, তার মালিক কেন তাকে বেঁধে রেখেছিল আবার কেনইবা তাকে ছেড়ে দিল।"

কাজেই যখন কোন জাতির অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, বিপদেও তার হৃদয় আল্লাহর সামনে নত হয় না, আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহে ও ধন–সম্পদের প্রাচুর্যেও তার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতাবোধ জাগে না এবং কোন অবস্থায়ই সে সংশোধিত হয় না তখন ধ্বংস তার মাথার ওপর এমনভাবে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে যেন তা যে কোন সময় তার ওপর নেমে আসবে। ঠিক যেমন সন্তান ধারণের সময়কাল পূর্ণ হয়ে গেছে, এমন একজন গর্ভবতী নারীর যে কোন সময় সন্তান প্রসব হতে পারে।

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

জনপদের লোকেরা কি এখন এ ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আমার শাস্তি কখনো অকস্মাত রাত্রিকালে তাদের ওপর এসে পড়বে না, যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন? অথবা তারা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আমাদের মজবুত হাত কখনো দিনের বেলা তাদের ওপর এসে পড়বে না, যখন তারা খেলা ধূলায় মেতে থাকবে? এরা কি আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে নির্ভীক হয়ে গেছে?[৭৮] *অথচ যে সব সম্প্রদায়ের ধ্বংস অবধারিত তারা ছাড়া আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে আর কেউ নির্ভীক হয় না।*

এখানে আরো একটি কথাও জেনে নেয়া উচিত। এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ নিজের যে নিয়মের কথা উল্লেখ করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালেও ঠিক সেই নিয়মটিই কার্যকর করা হয়। ভাগ্য বিড়ম্বিত জাতিগুলোর যেসব কর্মকাণ্ডের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, সূরা আ'রাফ অবতীর্ণ হওয়ার দিনগুলোতে মক্কার কুরাইশরা ঠিক সেই একই ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রকাশ ঘটিয়ে চলছিল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) উভয়েই একযোগে রেওয়ায়াত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর যখন কুরাইশরা তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে চরম উগ্র মনোভাব অবলম্বন করতে শুরু করে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেন, হে আল্লাহ! ইউসুফের যুগে যেমন সাত বছর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তেমনি ধরনের দুর্ভিক্ষের সাহায্যে এ লোকদের মোকাবিলা করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো। ফলে আল্লাহ তাদেরকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন করেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, লোকেরা মৃত প্রাণীর গোশত খেতে শুরু করে, এমন কি চামড়া, হাড় ও পশম পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। অবশেষে মক্কার লোকেরা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করার আবেদন জানায়। কিন্তু তাঁর দোয়ায় আল্লাহ যখন সেই মহা সংকট থেকে তাদেরকে উদ্ধার করেন এবং লোকেরা আবার সুদিনের মুখ দেখে, তখন তাদের বুক অহংকারে আগের চাইতে আরো বেশী স্ফীত হয়ে ওঠে। তাদের মধ্য থেকে যে গুটিকয় লোকের মন নরম হয়ে গিয়েছিল দুষ্টলোকেরা তাদেরকেও এ বলে ঈমানের পথ থেকে ফিরিয়ে নিতে থাকে ঃ আরে মিয়া! এসব তো সময়ের উত্থান পতন ও কালের আবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। এর আগেও দুর্ভিক্ষ এসেছে। এবারের দুর্ভিক্ষ দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়েছে, এটা কোন নতুন কথা নয়। কাজেই এসব ব্যাপারে প্রতারিত হয়ে মুহাম্মাদের ফাঁদে পা দিয়ো না। এ সূরা আ'রাফ যে সময় নাযিল হয় সে সময় মুশরিকরা এ বাগাড়ম্বর করে বেড়াচ্ছিল। কাজেই কুরআন

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ
أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ تِلْكَ
الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۚ
فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ
الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۖ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ
لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾

১৩ রুকূ'

পৃথিবীর পূর্ববর্তী অধিবাসীদের পর যারা তার উত্তরাধিকারী হয়, তারা কি এ বাস্তবতা থেকে ততটুকুও শেখেনি যে, আমি চাইলে তাদের অপরাধের দরুন তাদেরকে পাকড়াও করতে পারি।[৭৯] (কিন্তু তারা শিক্ষণীয় বিষয়াবলীর ব্যাপারে অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন করে থাকে।) আর আমি তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেই। ফলে তারা কিছুই শোনে না।[৮০] যেসব জাতির কাহিনী আমি তোমাদের শুনাচ্ছি (যাদের দৃষ্টান্ত তোমাদের সামনে রয়েছে) তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তাদের কাছে আসে, কিন্তু যে জিনিসকে তারা একবার মিথ্যা বলেছিল তাকে আবার মেনে নেবার পাত্র তারা ছিল না। দেখো, এভাবে আমি সত্য অস্বীকারকারীদের দিলে মোহর মেরে দেই।[৮১] তাদের অধিকাংশের মধ্যে আমি অংগীকার পালনের মনোভাব পাইনি। বরং অধিকাংশকেই পেয়েছি ফাসেক ও নাফরমান।[৮২]

তারপর এ জাতিগুলোর পর (যাদের কথা ওপরে বলা হয়েছে) আমার নিদর্শনসমূহ সহকারে মূসাকে পাঠাই ফেরাউন ও তার জাতির প্রধানদের কাছে।[৮৩] কিন্তু তারাও আমার নিদর্শনসমূহের ওপর জুলুম করে।[৮৪] ফলতঃ এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল একবার দেখো।

মজীদের এসব আয়াত অত্যন্ত সময়োপযোগী ও চলতি ঘটনাবলীর সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এ পটভূমিকার আলোকে এ আয়াতগুলোর নিগূঢ় অর্থ ও তাৎপর্য পুরোপুরি অনুধাবন করা

যেতে পারে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সূরা ইউনুস ২১ আয়াত, আন নহল ১১২ আয়াত, আল মুমিনূন ৫ ও ৭৬, আদ দুখান ৯–১৬)।

৭৮. মূলে مكر (মকর) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবীতে এর অর্থ হচ্ছে, গোপনে গোপনে কোন চেষ্টা তদবীর করা। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমনভাবে গুটি চালানো, যার ফলে তার ওপর চরম আঘাত না আসা পর্যন্ত সে জানতেই পারে না যে, তার ওপর এক মহা বিপদ আসন্ন। বরং বাইরের অবস্থা দেখে সে একথাই মনে করতে থাকে যে, সব কিছু ঠিকমতই চলছে।

৭৯. অর্থাৎ একটি পতিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির স্থানে অন্য যে জাতিটির উত্থান ঘটে তার জন্য নিজের পূর্ববর্তী জাতির পতনের মধ্যে যথেষ্ট পথনির্দেশনা থাকে। কিছুকাল পূর্বে যে জাতিটি এ স্থানে বিলাস ব্যসনে লিপ্ত ছিল এবং যাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের ঝাণ্ডা এখানে পত্ পত্ করে উড়তো, চিন্তা ও কর্মের কোন্ ধরনের ত্রুটি ও ভ্রান্তি তাদেরকে ধ্বংস করেছে, নিজেদের বিবেক–বুদ্ধির যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে তারা একথা সহজেই অনুধাবন করতে পারে। তারা এটাও অনুভব করতে পারে, যে উচ্চতর শক্তি পূর্ববর্তী জাতিদেরকে তাদের অপরাধের কারণে ইতিপূর্বে পাকড়াও করেছিল এবং তাদেরকে এ স্থান থেকে সরিয়ে দিয়ে স্থানটি শূন্য করেছিল, সে শক্তি এখনো যথা স্থানে বহাল আছে এবং তার কাছ থেকে এ ক্ষমতাও কেউ ছিনিয়ে নেয়নি যে, এ স্থানের পূর্ববর্তী অধিবাসীরা যে ধরনের ভুল করে আসছিল সেই ধরনের ভুল যদি এ স্থানের বর্তমান অধিবাসীরা করতে থাকে, তাহলে পূর্ববর্তীদেরকে যেমন এ জায়গা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল তেমনি এদেরকেও সরিয়ে দেয়া যেতে পারবে না।

৮০. অর্থাৎ যখন তারা ইতিহাস জেনে এবং শিক্ষণীয় ধ্বংসস্তূপ প্রত্যক্ষ করেও শিক্ষা গ্রহণ করে না এবং নিজেরাই নিজেদেরকে বিস্মৃতির মধ্যে নিক্ষেপ করে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের চিন্তা করার, বুঝার ও কোন উপদেশ দাতার উপদেশ শুনার সুযোগ মেলে না। যে ব্যক্তি নিজের চোখ বন্ধ করে নেয়, প্রখর সূর্যালোকও তার চোখে আলো ছড়াতে পারে না এবং যে ব্যক্তি নিজে শুনতে চায় না তাকে আর কেউ শুনাতে পারে না, এটিই আল্লাহর অমোঘ প্রাকৃতিক আইন।

৮১. আগের আয়াতে বলা হয়েছিল ঃ "আমি তাদের দিলে মোহর মেরে দেই, তারপর তারা কিছুই শুনতে পায় না"–এর ব্যাখ্যা আল্লাহ নিজেই এ আয়াতটিতে করে দিয়েছেন। এ ব্যাখ্যা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, দিলে মোহর মারার অর্থ হচ্ছে ঃ মানবিক বুদ্ধিবৃত্তির এমন একটি মনস্তাত্বিক নিয়মের আওতাধীন হয়ে যাওয়া, যার দৃষ্টিতে একবার জাহেলী বিদ্বেষ বা হীন ব্যক্তি স্বার্থের ভিত্তিতে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার পর মানুষ নিজের জিদ ও হঠকারিতার শৃংখলে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে যেতে থাকে যে, তারপর কোন প্রকার যুক্তি–প্রমাণ, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা, নিরীক্ষাই সত্যকে গ্রহণ করার জন্য তার মনের দুয়ার খুলে দেয় না।

৮২. "কারোর মধ্যে অংগীকার পালনের মনোভাব পাইনি"–অর্থাৎ কোন ধরনের অংগীকার পালনের পরোয়াই তাদের নেই। আল্লাহর পালিত বান্দা হবার কারণে জন্মগতভাবে প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ, তা প্রতিপালনের কোন

পরোয়াই তাদের নেই। তারা সামাজিক অংগীকার পালনেরও কোন পরোয়া করে না, মানব সমাজের একজন সদস্য হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তি যার সাথে একটি সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ অন্যদিকে নিজের বিপদ–আপদ ও দুঃখ–কষ্টের মুহূর্তগুলোতে অথবা কোন সদিচ্ছা ও মহৎ বাসনা পোষণের মুহূর্তে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর সাথে যে অংগীকারে আবদ্ধ হয়, তাও তারা পালন করে না। এ তিন ধরনের অংগীকার ভংগ করাকে এখানে ফাসেকী বলা হয়েছে।

৮৩. ওপরে বর্ণিত ঘটনাগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা ভালভাবে মানসপটে গেঁথে দেয়া যে, যে জাতি আল্লাহর পয়গাম পাওয়ার পর তা প্রত্যাখ্যান করে, ধ্বংসই তার অনিবার্য পরিণতি। এরপর এখন মূসা, ফেরাউন ও বনি ইসরাঈলের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ধারাবাহিকভাবে কয়েক রুকূ' পর্যন্ত। এর মধ্যে কুরাইশ বংশীয় কাফের, ইহুদি ও মুমিনদেরকে উপরোক্ত বিষয়বস্তুটি ছাড়াও আরো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এ কাহিনীর মাধ্যমে কুরাইশ বংশোদ্ভূত কাফেরদেরকে একথা বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, সত্যের দাওয়াতের প্রাথমিক স্তরে সত্য ও মিথ্যার শক্তির যে অনুপাত ব্যাহ্যত দেখা যায় তাতে প্রতারিত না হওয়া উচিত। সত্যের সমগ্র ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে, সূচনা বিন্দুতে তার সংখ্যা এত কম থাকে যে, শুরুতে সারা দুনিয়ার মোকাবিলায় মাত্র এক ব্যক্তি সত্যের অনুসারী এবং কোন প্রকার সাজ–সরঞ্জাম ছাড়াই সে মিথ্যার বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধ শুরু করে দেয়। এমন এক মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয় যার পেছনে রয়েছে বড় বড় জাতি ও রাষ্ট্রের বিপুল শক্তি। তারপরও শেষ পর্যন্ত সত্যই বিজয় লাভ করে। এ ছাড়াও এ কাহিনীতে তাদেরকে একথাও জানানো হয়েছে যে, সত্যের আহবায়কের মোকাবিলায় যেসব কৌশল অবলম্বন করা হয় এবং যেসব পন্থায় তার দাওয়াতকে দাবিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয় তা কিভাবে বুমেরাং হয়ে যায়। এ সংগে তাদেরকে একথাও জানানো হয় যে, সত্যের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংসের শেষ সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের সংশোধিত হবার ও সঠিক পথ অবলম্বন করার জন্য কত দীর্ঘ সময় দিয়ে থাকেন এবং এরপরও যখন কোন প্রকার সতর্ক বাণী, কোন শিক্ষণীয় ঘটনা এবং কোন উজ্জ্বল নিদর্শন থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে না ও প্রভাবিত হয় না তখন তিনি তাদেরকে কেমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান করেন।

যারা নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল এ কাহিনীর মাধ্যমে তাদেরকে দ্বিবিধ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এক, নিজেদের সংখ্যাল্পতা ও দুর্বলতা এবং সত্য বিরোধীদের বিপুল সংখ্যা ও শক্তি যেন তাদেরকে হিম্মতহারা না করে এবং আল্লাহর সাহায্য বিলম্বিত হতে দেখে যেন তাদের মনোবল ভেংগে না পড়ে। দুই, ঈমান আনার পর যে দলই ইহুদিদের মত আচরণ করে তারা অবশ্যি ইহুদিদের মতই আল্লাহর লানতের শিকার হয়।

বনী ইসরাঈলের সামনে তাদের শিক্ষণীয় ইতিহাস পেশ করে তাদেরকে মিথ্যার পূজারি সাজার ক্ষতিকর পরিণাম থেকে সাবধান করা হয়েছে। তাদেরকে এমন এক নবীর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। যিনি পূর্বের নবীগণের প্রচলিত দীনকে সব রকমের মিশ্রণ মুক্ত করে আবার তার আসল আকৃতিতে পেশ করছিলেন।

وَقَالَ مُوسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۗ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝ قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۝

মূসা বললো : "হে ফেরাউন![৮৫] আমি বিশ্বজাহানের প্রভুর নিকট থেকে প্রেরিত। আমার দায়িত্বই হচ্ছে, আল্লাহর নামে সত্য ছাড়া আর কিছুই বলবো না। আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিযুক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছি। কাজেই তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও।"[৮৬]

ফেরাউন বললো : "তুমি যদি কোন প্রমাণ এনে থাকো এবং নিজের দাবীর ব্যাপারে সত্যবাদী হও, তাহলে তা পেশ করো।"

মূসা নিজের লাঠিটি ছুড়ে দিল। অমনি তা একটি জ্বলজ্যান্ত অজগরের রূপ ধারণ করলো। সে নিজের হাত বের করলো তৎক্ষণাত দেখা গেলো সেটি দর্শকদের সামনে চমকাচ্ছে।[৮৭]

৮৪. নিদর্শনসমূহের সাথে জুলুম করে। অর্থাৎ সেগুলো মানে না এবং যাদুকরের কারসাজি গণ্য করে সেগুলো এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। যেমন কোন উচ্চাংগের কবিতাকে কবিতাই নয় বরং তাকে দুর্বল বাক্য বিন্যাস গণ্য করা এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা কেবল সেই কবিতাটির প্রতিই নয় বরং সমগ্র কাব্য জগত ও কাব্য চিন্তার প্রতিই জুলুমের নামান্তর। অনুরূপভাবে যেসব নিদর্শন নিজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে হবার ব্যাপারে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য–প্রমাণ পেশ করে এবং যেগুলোর ব্যাপারে যাদুর সাহায্যে এমনি ধরনের নিদর্শনের প্রকাশ ঘটতে পারে বলে কোন বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ধারণাও করতে পারে না বরং যাদু বিদ্যা বিশারদগণ যেগুলো সম্পর্কে তাদের বিদ্যার সীমানার আওতার অনেক উর্ধের বলে সাক্ষ্য দেয় সেগুলোকেও যাদু গণ্য করা কেবল ঐ নিদর্শনগুলোর প্রতিই নয় বরং সুস্থ বিবেক বুদ্ধি ও প্রকৃত সত্যের প্রতিও বিরাট জুলুম।

৮৫. ফেরাউন শব্দের অর্থ "সূর্য দেবতার সন্তান।" প্রাচীন কালে মিসরীয়রা সূর্যকে তাদের মহাদেব বা প্রধান দেবতা মনে করতো। এ অর্থে তারা তাকে বলতো (রাও)। ফেরাউন এ 'রাও' এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। মিসরীয়দের বিশ্বাস অনুযায়ী কোন শাসনকর্তার সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হতে হলে তাকে 'রাও' এর

শারীরিক অবতার এবং তার দুনিয়াবী প্রতিনিধি হওয়া অপরিহার্য ছিল। এ জন্যই যতগুলো রাজ পরিবার মিসরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে সূর্য বংশীয় হিসেবে পেশ করেছে। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর প্রত্যেকটি শাসক নিজেদের জন্য "ফেরাউন" (ফারাও) উপাধি গ্রহণ করে দেশবাসীর সামনে একথা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে যে, আমি–ই তোমাদের প্রধান রব বা মহাদেব।

এখানে একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, কুরআন মজীদে হযরত মূসার ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে দু'জন ফেরাউনের কথা বলা হয়েছে। একজন ফেরাউনের আমলে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং তার গৃহে প্রতিপালিত হন। আর দ্বিতীয় জনের কাছে তিনি ইসলামের দাওয়াত ও বনি ইসরাঈলদের মুক্তির দাবী নিয়ে উপস্থিত হন এবং এ দ্বিতীয় ফেরাউনই অবশেষে জলমগ্ন হয়। বর্তমান যুগের গবেষকদের অধিকাংশের মতে প্রথম ফেরাউন ছিল দ্বিতীয় রামেসাস। তার শাসনকাল ছিল ১২৯২ থেকে ১২২৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ। আর এখানে উল্লেখিত দ্বিতীয় ফেরাউন ছিল "মিনফাতা" বা "মিনফাতাহ"। পিতা দ্বিতীয় রামেসাসের জীবনকালেই সে শাসন কর্তৃত্বে অংশগ্রহণ করে এবং পিতার মৃত্যুর পর পুরোপুরি রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়। এ ধারণা বাহ্যত সন্দেহযুক্ত মনে হচ্ছে। কারণ ইসরাঈলী ইতিহাসের হিসেব অনুযায়ী হযরত মূসা (আ) ইন্তিকাল করেন ১২৭২ খৃষ্টপূর্বাব্দে। তবুও যা হোক আমাদের মনে রাখতে হবে, এগুলো নেহাত ঐতিহাসিক ধারণা ও আন্দাজ–অনুমান আর মিসরীয়, ইসরাঈলী ও খৃষ্টীয় পঞ্জিকার সাহায্যে একেবারে নির্ভুল সময়কালের হিসেব করা কঠিন।

৮৬. হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দু'টি জিনিসের দাওয়াত সহকারে ফেরাউনের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এক, আল্লাহর বন্দেগী তথা ইসলাম গ্রহণ করো। দুই, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়, যারা আগে থেকেই মুসলমান ছিল, তাদের প্রতি জুলুম–নির্যাতন বন্ধ করে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। কুরআনের কোথাও এ দু'টি দাওয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে এক সাথে আবার কোথাও স্থান–কাল বিশেষে আলাদা আলাদাভাবে এদের উল্লেখ এসেছে।

৮৭. হযরত মূসা যে বিশ্ব জাহানের শাসক ও সর্বময় কর্তৃত্বশালী আল্লাহর প্রতিনিধি, একথার প্রমাণ স্বরূপ এ দু'টি নিদর্শন তাঁকে দেয়া হয়েছিল। ইতিপূর্বেও আমি বলেছি যে, নবী রসূলগণ যখনই নিজেদেরকে রব্বুল আলামীনের প্রেরিত হিসেবে পেশ করেছেন তখনই লোকদের পক্ষ থেকে এ দাবীই জানানো হয়েছে যে, সত্যিই যদি তুমি রব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি হয়ে থাকো তাহলে তোমার মাধ্যমে এমন কিছু ঘটনার প্রকাশ হওয়া দরকার, যাতে প্রাকৃতিক আইনের সাধারণ নীতিমালার ব্যতিক্রম ঘটে এবং যার থেকে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রকাশ হয় যে, বিশ্বপ্রভু তোমার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নিজের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নিদর্শন হিসেবে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন। এ দাবীর প্রেক্ষিতে নবীগণ বিভিন্ন নিদর্শন দেখিয়েছেন, যাকে কুরআনের পরিভাষায় "আয়াত" ও কালাম শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় "মুজিযা" বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের মুজিযাকে যারা প্রাকৃতিক আইনের অধীনে উদ্ভূত সাধারণ ঘটনা গণ্য করার চেষ্টা করে তারা আসলে আল্লাহর কিতাবকে মানার ও না মানার মাঝামাঝি এমন একটি ভূমিকা গ্রহণ করে, যাকে কোনক্রমেই যুক্তিসংগত মনে করা যেতে পারে না। কারণ কুরআন যেখানে দ্ব্যর্থহীন প্রাকৃতিক আইন

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٩﴾ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ
مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿١١٠﴾ قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى
الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿١١١﴾ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿١١٢﴾ وَجَآءَ السَّحَرَةُ
فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ
وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿١١٤﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّآ اَنْ
نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿١١٥﴾ قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ
وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٦﴾ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ
عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾

১৪ রুকূ'

এ দৃশ্য দেখে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের প্রাধানরা পরস্পরকে বললো : "নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি একজন অত্যন্ত দক্ষ যাদুকর, তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বে–দখল করতে চায়।[৮৮] এখন তোমরা কি বলবে বলো?" তখন তারা সবাই ফেরাউনকে পরামর্শ দিলো, তাকে ও তার ভাইকে অপেক্ষারত রাখুন এবং নগরে নগরে সংগ্রাহক পাঠান। তারা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে আপনার কাছে নিয়ে আসবে।[৮৯] অবশেষে যাদুকরেরা ফেরাউনের কাছে এলো।

তারা বললো : "যদি আমরা বিজয়ী হই, তাহলে অবশ্যি এর প্রতিদান পাবো তো?"

ফেরাউন জবাব দিলো : "হাঁ তাছাড়া তোমরা আমার দরবারের ঘনিষ্ঠজনেও পরিণত হবে।"

তখন তারা মূসাকে বললো : "তুমি ছুঁড়বে, না আমরা ছুঁড়বো?"

মূসা জবাব দিলো : "তোমরাই ছোঁড়ো।"

তারা যখনই নিজেদের যাদুর বাণ ছুঁড়লো তখনই তা লোকদের চোখে যাদু করলো, মনে আতংক ছড়ালো এবং তারা বড়ই জবরদস্ত যাদু দেখালো।

মূসাকে আমি ইংগিত করলাম, তোমার লাঠিটা ছুঁড়ে দাও। তার লাঠি ছোঁড়ার সাথে সাথেই তা এক নিমেষেই তাদের মিথ্যা যাদু কর্মগুলোকে গিলে ফেলতে লাগলো।[৯০]

বিরোধী ঘটনা উল্লেখ করছে সেখানে পূর্বাপর আলোচনার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করে তাকে একটি সাধারণ ঘটনা হিসেবে চিত্রিত করার প্রচেষ্টা চালানো নিছক একটি উদ্ভট বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। এর প্রয়োজন হয় একমাত্র এমন ধরনের লোকদের যারা একদিকে প্রাকৃতিক আইন বিরোধী ঘটনার উল্লেখকারী কোন কিতাবের প্রতি ঈমান আনতে চায় না আবার অন্যদিকে জন্মগতভাবে পৈতৃক ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে এমন একটি কিতাবকে অস্বীকার করতে চায় না, যাতে প্রাকৃতিক আইন বিরোধী ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

মুজিযার ব্যাপারে আসল ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকর প্রশ্ন কেবল একটিই এবং সেটি হচ্ছে এই যে, মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাকে একটি আইনের ভিত্তিতে সচল করে দেবার পর কি নিজে স্থবির হয়ে বসে পড়েছেন এবং বর্তমানে বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থাপনায় কখনো কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারেন না? অথবা তিনি কার্যত নিজের সাম্রাজ্যের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা নিজের কর্তৃত্বাধীনে রেখেছেন, প্রতি মুহূর্তে এ বিশ্ব রাজ্যে তাঁর বিধান জারি হচ্ছে এবং সর্বক্ষণ তিনি সকল বস্তুর আকৃতি প্রকৃতিতে এবং ঘটনাবলী স্বাভাবিক গতিধারায় আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে যেভাবে এবং যখন চান পরিবর্তন করেন? এরই প্রশ্নের জওয়াবে যারা প্রথম মতটি পোষণ করেন তাদের পক্ষে মুজিযার স্বীকৃতি দেয়া অসম্ভব। কারণ আল্লাহ সম্পর্কে তারা যে ধারণা পোষণ করেন তার সাথে মুজিযা খাপ খায় না। এবং বিশ্ব–জাহানের ব্যাপারে তাদের যে ধারণা তার সাথেও না। এ ধরনের লোকদের পক্ষে কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার পরিবের্তে পরিষ্কারভাবে কুরআন অস্বীকার করাই সংগত মনে হয়। কারণ কুরআন তো আল্লাহ সম্পর্কিত প্রথমোক্ত ধারণাটিকে মিথ্যা ও শেষোক্ত ধারাণাটিকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই নিজের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা ব্যয় করেছে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি কুরআনের উপস্থাপিত যুক্তি প্রমাণে নিশ্চিন্ত হয়ে শেষোক্ত মতটি গ্রহণ করেন তার জন্য মুজিযার তাৎপর্য ও স্বরূপ অনুধাবন করা এবং তাকে স্বীকার করে নেয়া মোটেই কঠিন হয় না। সোজা কথায় বলা যায়, কেউ যদি বিশ্বাস করে অজগর সাপের জন্ম যেভাবে হচ্ছে কেবলমাত্র সেভাবেই তার জন্ম হতে পারে, অন্য কোন পন্থায় তাকে জন্ম দেবার ক্ষমতা আল্লাহর নেই, তাহলে সে "একটি লাঠি অজগরে পরিণত হয়েছে বা অজগর লাঠিতে রূপান্তরিত হয়েছে" এ মর্মে কেউ খবর দিলে তা বিশ্বাস করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে আল্লাহর হুকুমে প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং যে বস্তুকে আল্লাহ যেভাবে চান জীবন দান করতে পারেন, তার কাছে আল্লাহর হুকুমে লাঠির অজগরে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া ঠিক তেমনি স্বাভাবিক সত্য ব্যাপার যেমন সেই একই আল্লাহর হুকুমে ডিমের মধ্যে কতিপয় প্রাণহীন উপাদানের অজগরে পরিণত হওয়া। একটি ঘটনা সবসময় ঘটে চলছে এবং অন্যটি মাত্র তিনবার ঘটেছে, শুধু মাত্র এতটুকু পার্থক্যের জন্য একটি ঘটনাকে স্বাভাবিক ও অন্যটিকে অস্বাভাবিক বলা চলে না।

৮৮. এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একটি পরাধীন জাতির এক সহায়–সম্বলহীন ব্যক্তি যদি হঠাৎ একদিন ফেরাউনের মত মহা পরাক্রান্ত বাদশাহর কাছে চলে যান। সিরিয়া থেকে লিবিয়া পর্যন্ত এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূল থেকে ইথিয়োপিয়া পর্যন্ত বিশাল ভূভাগের ওপর যার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তৃত, অধিকন্তু সে নিজেকে জনগণের ঘাড়ের

ওপর দেবতা হিসেবেও সওয়ার হয়ে আছে। তাহলে নিছক তাঁর একটি লাঠিকে অজগরে পরিণত করে দেয়ার কাজটি কেমন করে এত বড় একটি সাম্রাজ্যকে আতংকিত করে তোলে। কিভাবেই বা এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এ ধরনের একজন মানুষ একাকীই মিসর রাজকে সিংহাসনচ্যুত করে দেবেন এবং শাসক সম্প্রদায়সহ সমগ্র রাজ পরিবারকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে দেবেন? তারপর ঐ ব্যক্তি যখন কেবলমাত্র নবুওয়াতের দাবী এবং বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দেবার দাবী উত্থাপন করেছিলেন আর এ ছাড়া অন্য কোন প্রকার রাজনৈতিক আলোচনাই করেননি তখন এ রাজনৈতিক বিপ্লবের আশংকা দেখা দিয়েছিল কেমন করে?

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, মূসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াতের দাবীর মধ্যেই এ তাৎপর্য নিহিত ছিল যে, তিনি আসলে গোটা জীবন ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে পরিবর্তিত করতে চান। দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও নিশ্চিতভাবে এর অন্তর্ভুক্ত। কোন ব্যক্তির নিজেকে বিশ্ব প্রভু আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এ দাঁড়ায় যে, তিনি মানুষের কাছে নিজের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের দাবী জানাচ্ছেন। কারণ রব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি কখনো অন্যের অনুগত ও অন্যের প্রজা হয়ে থাকতে আসেন না। বরং তিনি আসেন অন্যকে অনুগত ও প্রজায় পরিণত করতে। কোন কাফেরের শাসনাধিকার মেনে নেয়া তার রিসালাতের মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ কারণেই হযরত মূসার মুখ থেকে রিসালাতের দাবী শুনার সাথে সাথেই ফেরাউন ও তার রাষ্ট্র পরিচালকবর্গের মনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের আশংকা দেখা দেয়। তবে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে যখন তাঁর এক ভাই ছাড়া আর কোন সাহায্যকারী ছিল না এবং কেবল মাত্র একটি সর্পে রূপান্তরিত হবার ক্ষমতা সম্পন্ন লাঠি ও একটি ঔজ্জ্বল্য বিকীরণকারী হাত ছাড়া তাঁর রসূল হিসেবে নিযুক্তির আর কোন প্রমাণ ছিল না তখন মিসরের রাজ দরবারে তাঁর এ দাবীকে এত গুরুত্ব দেয়া হলো কেন? আমার মতে এর দু'টি বড় বড় কারণ রয়েছে। এক, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে ফেরাউন ও তার সভাসদরা পুরোপুরি অবগত ছিল। তার পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ও অনমনীয় চরিত্র। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও যোগ্যতা এবং জন্মগত নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতার কথা তাদের সবার জানা ছিল। তালমূদ ও ইউসীফূসের বর্ণনা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয়, হযরত মূসা (আ) এসব জন্মগত যোগ্যতা ছাড়াও ফেরাউনের গৃহে লাভ করেছিলেন বিভিন্ন জাগতিক বিদ্যা, দেশ শাসন ও সমর বিদ্যায় পারদর্শিতা। রাজপরিবারের সদস্যদের এসব শিক্ষা দেয়ার রেওয়াজ ছিল। তাছাড়া ফেরাউনের গৃহে যুবরাজ হিসেবে অবস্থান করার সময় আবিসিনিয়ায় সামরিক অভিযানে গিয়েও তিনি নিজেকে একজন সুযোগ্য সেনাপতি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তদুপরি রাজ প্রাসাদে জীবন যাপন এবং ফেরাউনী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আওতাধীনে নির্বাহী কর্তৃত্বের আসনে বসার কারণে যে সামান্য পরিমাণ দুর্বলতা তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তাও মাদায়েন এলাকায় আট দশ বছর মরুচারী জীবন যাপন ও ছাগল চরাবার কঠোর দায়িত্ব পালনের কারণে দূর হয়ে গিয়েছিল। কাজেই আজ যিনি ফেরাউনের দরবারে দণ্ডায়মান, তিনি আসলে এক বয়স্ক, বিচক্ষণ ও তেজোদ্দীপ্ত দরবেশ সম্রাট। তিনি নবুওয়াতের দাবীদার হিসেবে তার সামনে উপস্থিত। এরূপ ব্যক্তির কথাকে হাওয়াই ফানুস মনে করে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব ছিল না। এর দ্বিতীয় কারণটি ছিল এই যে, লাঠি ও শ্বেতহস্তের মু'জিযা দেখে

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صٰغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسٰى وَهٰرُونَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوا إِنَّا إِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾

এভাবে যা সত্য ছিল তা সত্য প্রমাণিত হলো এবং যা কিছু তারা বানিয়ে রেখেছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো। ফেরাউন ও তার সাথীরা মোকাবিলার ময়দানে পরাজিত হলো এবং (বিজয়ী হবার পরিবর্তে) উল্টো তারা লাঞ্ছিত হলো। আর যাদুকরদের অবস্থা হলো এই—যেন কোন জিনিস ভিতর থেকে তাদেরকে সিজদাবনত করে দিলো। তারা বলতে লাগলো ঃ "আমরা ঈমান আনলাম বিশ্বজাহানের রবের প্রতি, যিনি মূসা ও হারুনেরও রব।"[৯১]

ফেরাউন বললো ঃ "আমার অনুমতি দেবার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই এটা কোন গোপন চক্রান্ত ছিল। তোমরা এ রাজধানীতে বসে এ চক্রান্ত এঁটেছো এর মালিকদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য। বেশ, এখন এর পরিণাম তোমরা জানতে পারবে। তোমাদের হাত-পা আমি কেটে ফেলবো বিপরীত দিক থেকে এবং তারপর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করবো।"

তারা জবাব দিলো ঃ "সে যাই হোক আমাদের রবের দিকেই তো আমাদের ফিরতে হবে। তুমি যে ব্যাপারে আমাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছো, তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আমাদের রবের নিদর্শনসমূহ যখন আমাদের সামনে এসেছে তখন আমরা তা মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব! আমাদের সবর দান করো এবং তোমার অনুগত থাকা অবস্থায় আমাদের দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও।"[৯২]

ফেরাউন ও তার সভাসদরা অত্যন্ত অভিভূত, বিচলিত ও ভীত হয়ে পড়েছিল। তাদের প্রায় নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, এ ব্যক্তির পেছনে নিশ্চয়ই কোন অতিপ্রাকৃতিক

শক্তির সহায়তা রয়েছে। তাদের একদিকে হযরত মূসাকে যাদুকর বলা আবার অন্যদিকে তিনি তাদেরকে এ দেশের শাসন কর্তৃত্ব থেকে উৎখাত করতে চান বলে আশংকা প্রকাশ করা—এ দুটি বিষয় পরস্পরের বিপরীত। আসলে নবুওয়াতের প্রথম প্রকাশ তাদেরকে কিংকর্তব্য বিমূঢ় করে দিয়েছিল। তাদের উল্লেখিত মনোভাব, বক্তব্য ও কার্যক্রম তারই প্রমাণ। সত্যিই যদি তারা হযরত মূসাকে যাদুকর মনে করতো, তাহলে তিনি কোন রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাবেন এ আশংকা তারা কখনো করতো না। কারণ যাদুর জোরে আর যাই হোক—দুনিয়ার কোথাও কখনো কোন রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়নি।

৮৯. ফেরাউনের সভাসদদের এ বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে একথা জানা যায় যে, আল্লাহর নিদর্শন ও যাদুর মধ্যকার পার্থক্য তাদের কাছে একেবারেই পানির মত পরিষ্কার ছিল। তারা জানতো, আল্লাহর নিদর্শনের সাহায্যে প্রকৃত ও সত্যিকার পরিবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। আর যাদু নিছক দৃষ্টিশক্তি ও মনকে প্রভাবিত করে বস্তুর মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের পরিবর্তন অনুভব করায়। তাই তারা হযরত মূসার রিসালাতের দাবী প্রত্যাখ্যান করার জন্য বলে, এ ব্যক্তি যাদুকর। অর্থাৎ লাঠি আসলে সাপে পরিণত হয়নি, কাজেই তাকে আল্লাহর নিদর্শন বলে মেনে নেয়া যায় না। বরং সেটি যেন সাপের মত বলে আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে। প্রত্যেক যাদুকর এভাবেই তার তেলেসমাতি দেখিয়ে থাকে। তারপর তারা পরামর্শ দেয়, সারা দেশের শ্রেষ্ঠ দক্ষ যাদুকরদেরকে একত্র করা হোক এবং তাদের যাদুকরী শক্তির মাধ্যমে লাঠি ও রশিকে সাপে পরিণত করে লোকদের দেখানো হোক। এর ফলে নবী সুলভ এ মুজিযা দেখে সাধারণ লোকের মনে যে উচ্চতর ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা পুরোপুরি দূর না হলেও কমপক্ষে সন্দেহে রূপান্তরিত করা যাবে।

৯০. যাদুকরেরা যেসব রশি ও লাঠি ছুঁড়ে ফেলার পর সেগুলো বিভিন্ন প্রকারের সাপ ও অজগরের মত দেখাচ্ছিল হযরত মূসার লাঠি সেগুলোকে গিলে খেয়ে ফেলেছিল, এ ধারণা করা ঠিক হবে না। কুরআন এখানে যা কিছু বলছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত মূসার লাঠি সাপে পরিণত হয়ে তাদের যাদুর প্রতারণার জাল ছিন্ন করতে শুরু করে। অর্থাৎ এ সাপ যেদিকে গেছে সেদিকেই তাদের যাদুর প্রভাবে যেসব লাঠি ও রশি সাপের মত হেলেদুলে নড়াচড়া করতে দেখা যাচ্ছিল তাদের সব প্রভাব খতম করে দিয়েছে এবং তার একটি মাত্র চক্করে যাদুকরদের প্রত্যেক সর্প অবয়বধারী লাঠি ও রশি সংগে সংগেই আগের মত লাঠি ও রশিতে পরিণত হয়ে গেছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা তা-হা, টীকা ৪২)

৯১. এভাবে মহান আল্লাহ ফেরাউন ও তার দলবলের ফাঁদে তাদেরকেই আটকে দিলেন। তারা সারা দেশের শ্রেষ্ঠ যাদুকরদের আহবান করে প্রকাশ্য স্থানে তাদের যাদুর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে তারা হযরত মূসার যাদুকর হবার ব্যাপারে জনগণকে নিশ্চয়তা দিতে পারবে অথবা কমপক্ষে তাদেরকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারবে। কিন্তু এ প্রতিযোগিতায় পরাজিত হবার পর তাদের নিজেদের আহূত যাদু বিশারদরাই সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিল যে, হযরত মূসা (আ) যা পেশ করছেন তা মোটেই যাদু নয় বরং নিশ্চিতভাবে তা রব্বুল আলামীনের শক্তির নিদর্শন এবং এর ওপর যাদুর কোন প্রভাব খাটতে পারে না। একথা সুস্পষ্ট যে, যাদুকে

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا
فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ
إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾
قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ
عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

১৫ রুকূ'

ফেরাউনকে তার জাতির প্রধানরা বললো : "তুমি কি মূসা ও তার জাতিকে এমনিই ছেড়ে দেবে যে, তারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াক এবং তোমার ও তোমার মাবুদদের বন্দেগী পরিত্যাগ করুক?" ফেরাউন জবাব দিল : "আমি তাদের পুত্রদের হত্যা করবো এবং তাদের কন্যাদের জীবিত রাখবো।[৯৩] আমরা তাদের ওপর প্রবল কর্তৃত্বের অধিকারী।

মূসা তার জাতিকে বললো : "আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং সবর করো। এ পৃথিবী তো আল্লাহরই। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তাকে এর উত্তরাধিকারী করেন। আর যারা তাঁকে ভয় করে কাজ করে চূড়ান্ত সাফল্য তাদের জন্য নির্ধারিত।" তার জাতির লোকেরা বললো : "তোমার আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং এখন তোমার আসার পরেও নির্যাতিত হচ্ছি।"। সে জবাব দিল : "শীঘ্রই তোমাদের রব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে খলীফা করবেন, তারপর তোমরা কেমন কাজ করো তা তিনি দেখবেন।

যাদুকরদের চাইতে বেশী ভালো করে আর কে জানতে পারে? কাজেই তারা যখন বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সাক্ষ দিল যে, ওটা যাদু নয়, তখন ফেরাউন ও তার সভাসদদের পক্ষে মূসাকে নিছক একজন যাদুকর বলে জনমনে বিশ্বাস জন্মানো অসম্ভব হয়ে পড়লো।

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾

১৬ রুকূ'

ফেরাউনের লোকদেরকে আমি কয়েক বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও ফসলহানিতে আক্রান্ত করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, হয়তো তাদের চেতনা ফিরে আসবে। কিন্তু তাদের এমনি অবস্থা ছিল যে, ভাল সময় এলে তারা বলতো, এটা তো আমাদের প্রাপ্য। আর খারাপ সময় এলে মূসা ও তার সাথীদেরকে নিজেদের জন্য কুলক্ষণে গণ্য করতো। অথচ তাদের কুলক্ষণ তো আল্লাহর কাছে ছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল অজ্ঞ। তারা মূসাকে বললো ঃ "আমাদের যাদু করার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শনই আনো না কেন, আমরা তোমার কথা মেনে নেবো না।[৯৪] অবশেষে আমি তাদের ওপর দুর্যোগ পাঠালাম,[৯৫] পংগপাল ছেড়ে দিলাম, উকুন[৯৬] ছড়িয়ে দিলাম, ব্যাংগের উপদ্রব সৃষ্টি করলাম এবং রক্ত বর্ষণ করলাম। এসব নিদর্শন আলাদা আলাদা করে দেখালাম। কিন্তু তারা অহংকারে মেতে রইলো এবং তারা ছিল বড়ই অপরাধপ্রবণ সম্প্রদায়।

৯২. পরিস্থিতি পাল্টে যেতে দেখে ফেরাউন তার শেষ চালটি চাললো। সে এই সমগ্র ব্যাপারটিকে হযরত মূসা ও যাদুকরদের ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করলো, তারপর যাদুকরদেরকে শারীরিক নির্যাতন ও হত্যার হুমকি দিয়ে তাদের থেকে নিজের এ দোষারোপের স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করলো। কিন্তু এবারে এ চালটিরও উল্টো ফল হলো। যাদুকররা নিজেদেরকে সব রকমের শাস্তির জন্য পেশ করে একথা প্রমাণ করে দিল যে, মূসা আলাইহিস সালামকে সত্য বলে স্বীকার করা ও তাঁর ওপর তাদের ঈমান আনাটা কোন ষড়যন্ত্রের নয় বরং সত্যের অকুণ্ঠ স্বীকৃতির ফল। কাজেই তখন সত্য ও

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يٰمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ
عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ
بَنِيٓ إِسْرَآئِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلٰىٓ أَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوهُ
إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣٥﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا
بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِينَ ﴿١٣٦﴾

যখনই তাদের ওপর বিপদ আসতো তারা বলতো ঃ "হে মূসা! তোমার রবের কাছে তুমি যে মর্যাদার অধিকারী তার ভিত্তিতে তুমি আমাদের জন্য দোয়া করো। যদি এবার তুমি আমাদের ওপর থেকে এ দুর্যোগ হটিয়ে দাও, তাহলে আমরা তোমার কথা মেনে নেবো এবং বনী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দেবো।" কিন্তু যখনই তাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে নিতাম একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, অমনি তারা সেই অংগীকার ভংগ করতো। তাই আমি তাদের থেকে বদলা নিয়েছি এবং তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছি। কারণ তারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা বলেছিল এবং সেগুলোর ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল।

ইনসাফের যে প্রহসন সে সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল তা পরিহার করে সোজাসুজি জুলুম ও নির্যাতনের পথে এগিয়ে আসা ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

এ প্রসঙ্গে এ বিষয়টিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঈমানের স্ফলিংগ যাদুকরদের চরিত্রে কি বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই এ যাদুকরদের কী দাপট ছিল। নিজেদের পৈতৃক ধর্মের সাহায্যার্থে তারা নিজ নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে এসেছিল। তারা ফেরাউনকে জিজ্ঞেস করছিল, আমরা যদি মূসার আক্রমণ থেকে নিজেদের ধর্মকে রক্ষা করতে পারি তাহলে সরকার আমাদের পুরস্কৃত করবে তো? আর এখন ঈমানের নিয়ামত লাভ করার পর তাদেরই সত্যপ্রীতি, সত্য নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, মাত্র কিছুক্ষণ আগে যে বাদশাহর সামনে তারা লোভীর মত দু'হাত পেতে দিয়েছিল এখন তার প্রতাপ প্রতিপত্তি ও দর্পকে নির্ভয়ে পদাঘাত করতে লাগলো। সে যে ভয়াবহ শাস্তি দেবার হুমকি দিচ্ছিল তা বরদাশত করার জন্য তারা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে সত্যের দরজা তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল প্রাণের বিনিময়েও তাকে পরিত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না।

৯৩. এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বে দ্বিতীয় রামেসাসের আমলে নির্যাতনের একটা যুগ অতিবাহিত হয়। আর নির্যাতনের

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ ۚ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾

আর তাদের জায়গায় আমি প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম দুর্বল ও অধোপতিত করে রাখা মানব গোষ্ঠীকে। অতপর যে ভূখণ্ডকে আমি প্রাচুর্যে ভরে দিয়েছিলাম, তার পূর্ব ও পশ্চিম অংশকে তাদেরই করতলগত করে দিয়েছিলাম।[৯৭] *এভাবে বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে তোমার রবের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। কারণ তারা সবর করেছিল। আর ফেরাউন ও তার জাতি যা কিছু তৈরী করছিল ও উঁচু করছিল তা সব ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।*

বনী ইসরাঈলকে আমি সাগর পার করে দিয়েছি। তারপর তারা চলতে চলতে এমন একটি জাতির কাছে উপস্থিত হলো যারা নিজেদের কতিপয় মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। বনী ইসরাঈল বলতে লাগলো ঃ "হে মূসা! এদের মাবূদদের মত আমাদের জন্যও একটা মাবূদ বানিয়ে দাও।"[৯৮] *মূসা বললো ঃ "তোমরা বড়ই অজ্ঞের মত কথা বলছো। এরা যে পদ্ধতির অনুসরণ করছে তাতে ধ্বংস হবে এবং যে কাজ এরা করছে তা সম্পূর্ণ বাতিল।"*

দ্বিতীয় যুগটি শুরু হয় হযরত মূসার নবুওয়াত লাভের পর। এ উভয় যুগেই বনী ইসরাঈলদের ছেলেদেরকে হত্যা করা হয় এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখা হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে তাদের বংশধারা বিলুপ্ত করার এবং এ জাতিটিকে অন্যজাতির মধ্যে বিলীন করে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৯৬ সালে প্রাচীন মিসরের ধ্বংসাবশেষ খনন করার সময় সম্ভবত এ যুগেরই একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। তাতে এ মিনফাতাহ ফিরাউন নিজের কৃতিত্ব ও বিজয় ধারা বর্ণনা করার পর লিখছে, "আর ইসরাঈলকে বিলুপ্ত করে দেয়া

হয়েছে। তার বীজও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। (আরো জানার জন্য পড়ুন সূরা আল মুমিনূন ২৫ আয়াত)।

৯৪. ফেরাউনের সভাসদরা এমন একটি জিনিসকে যাদু গণ্য করছিল, যে সম্পর্কে তারা নিজেরাও নিশ্চিতভাবে জানতো যে, তা যাদুর ফল হতে পারে না। এটা তাদের চরম হঠকারিতা ও বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। একটি দেশের সমগ্র এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়া এবং একনাগাড়ে কয়েক বছর কম ফসল উৎপাদন ও ফসলহানি হওয়া কোন যাদুর কারসাজি হতে পারে বলে সম্ভবত কোন নির্বোধও বিশ্বাস করবে না। এ জন্যই কুরআন মজীদ বলছে ঃ

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا

"যখন আমার নিদর্শনসমূহ প্রকাশ্যে তাদের দৃষ্টি সমক্ষে এসে গেলো তখন তারা বললো, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। অথচ তাদের মন ভিতর থেকে স্বীকার করে নিয়েছিল, কিন্তু তারা নিছক জুলুম ও বিদ্রোহের কারণে তা অস্বীকার করলো।"

(আন নামল ১৩-১৪ আয়াত)।

৯৫. সম্ভবত এখানে বৃষ্টিজনিত দুর্যোগ বুঝানো হয়েছে। বৃষ্টির সাথে শিলাও বর্ষিত হয়েছিল। যদিও অন্য ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগও হতে পারে কিন্তু বাইবেলে শিলাবৃষ্টি জনিত দুর্যোগের কথা বলা হয়েছে। তাই এখানে এ অর্থটিকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছি।

৯৬. এখানে মূল শব্দ হচ্ছে قُمَّلُ (কুম্মাল্)। এর কয়েকটি অর্থ হয়। যেমন উকুন, ছোট মাছি, ছোট পংগপাল, মশা, ঘুণ ইত্যাদি। সম্ভবত এ বহু অর্থবোধক শব্দটি ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, একই সংগে উকুন ও মশা মানুষের ওপর এবং ঘুণ খাদ্য শস্যের ওপর আক্রমণ করে থাকবে। (তুলনামূলক পাঠের জন্য দেখুন বাইবেলের যাত্রা পুস্তক ৭-১২ অধ্যায়। এ ছাড়াও সূরা যুখরুফ-এর ৪৩ টীকাটিও দেখুন)।

৯৭. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছি। কেউ কেউ এর এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, বনী ইসরাঈলকে খোদ্ মিসরের মালিক বানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করার স্বপক্ষে একে তো কুরআনের ইংগিতগুলো যথেষ্ট পরিমাণে স্পষ্ট নয়। তদুপরি ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী থেকেও এর স্বপক্ষে কোন শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই এ অর্থ গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি দ্বিধান্বিত। (দেখুন সূরা আল কাহাফের ৫৭ টীকা এবং আশ্ শু'আরার ৪৫ টীকা)।

৯৮. বনী ইসরাঈল যে স্থান থেকে লোহিত সাগর অতিক্রম করেছিল সেটি ছিল সম্ভবত বর্তমান সুয়েজ ও ইসমাঈলীয়ার মধ্যবর্তী কোন একটি স্থান। এখান থেকে লোহিত সাগর পার হয়ে তারা সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে উপকূলের কিনারা ঘেঁষে রওয়ানা হয়েছিল। সে সময় সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম ও উত্তরাংশ মিসরের শাসনাধীন ছিল। দক্ষিণের এলাকায় বর্তমান তূর শহর ও আবু যানীমার মধ্যবর্তী স্থানে তামা ও নীলম পাথরের খনি ছিল। এ খনিজ সম্পদ দ্বারা মিসরবাসী প্রচুর লাভবান

قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

মূসা আরো বললো ঃ "আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ খুঁজবো? অথচ আল্লাহই সারা দুনিয়ার সমস্ত জাতি গোষ্ঠীর ওপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর (আল্লাহ বলেন) ঃ সেই সময়ের কথা স্মরণ করো যখন আমি ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতো, তোমাদের ছেলেদের হত্যা করতো এবং মেয়েদের জীবিত রাখতো। আর এর মধ্যে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য ছিল মহা পরীক্ষা।"

হতো। এ খনিগুলো সংরক্ষণ করার জন্য মিসরীয়রা কয়েক জায়গায় টহলদার চৌকি স্থাপন করেছিল। মাফকাহ নামক স্থানে এ ধরনের একটি চৌকি ছিল। এখানে ছিল মিসরীয়দের একটি বিরাট মন্দির। উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এখনো এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এর কাছাকাছি আর একটি স্থানে প্রাচীন সিরীয় জাতিসমূহের চন্দ্রদেবীর মন্দির ছিল। সম্ভবত এরই কোন একটি জায়গা দিয়ে যাবার সময় দীর্ঘকাল মিসরীয়দের গোলামীতে জীবন যাপন করার কারণে মিসরীয় পৌত্তলিক ভাবধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মনে একটি কৃত্রিম খোদার প্রয়োজন অনুভূত হয়ে থাকবে।

মিসরবাসীদের দাসত্ব বনি ইসরাঈলীদের মনমানসকে কিভাবে বিকৃত করে দিয়েছিল নিম্নোক্ত বিষয়টি থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। মিসর থেকে বের হয়ে আসার ৭০ বছর পর হযরত মূসার প্রথম খলীফা হযরত ইউসা ইবনে নূন বনী ইসরাঈলীদের সাধারণ সমাবেশে তাঁর শেষ ভাষণে বলেন ঃ

> "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সৎ সংকল্প ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর উপাসনা করো। আর তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা বড় নদীর (ফোরাত) ওপারে ও মিসরে যেসব দেবতার পূজা করতো তাদেরকে বাদ দাও। আর একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত যদি তোমাদের খারাপ লাগে তাহলে তোমরা যার উপাসনা করবে আজই তাকে মনোনীত করে নাও।...... এখন রইলো আমার ও আমার পরিবারবর্গের কথা, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করতে থাকবো।" (যিহোশূয় ২৪ ঃ ১৪-১৫)

এ থেকে বুঝা যায় যে, ফেরাউন শাসিত মিসরের দাসত্বের যুগে এ জাতির শিরা উপশিরায় পৌত্তলিকতার যে প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল, ৪০ বছর পর্যন্ত হযরত মূসার এবং

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤٢﴾

১৭ রুকূ'

মূসাকে আমি তিরিশ রাত-দিনের জন্য (সিনাই পর্বতের ওপর) ডাকলাম এবং পরে দশ দিন আরো বাড়িয়ে দিলাম। এভাবে তার রবের নির্ধারিত সময় পূর্ণ চল্লিশ দিন হয়ে গেলো।[৯৯] *যাওয়ার সময় মূসা তার ভাই হারুনকে বললো ঃ "আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আমার জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সঠিক কাজ করতে থাকবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথে চলবে না।"*[১০০]

২৮ বছর পর্যন্ত হযরত ইউশা'র অধীনে শিক্ষা ও অনুশীলন লাভ এবং তাঁদের নেতৃত্বে জীবন পরিচালনা করার পরও তা দূর করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় তারা নিজেদের সাবেক প্রভুদেরকে এসব মূর্তির পদতলে মাথা ঘষতে দেখেছে, মিসর থেকে বের হবার সাথে সাথেই সেই ধরনের মূর্তি দেখে তার সামনে মাথা নোয়াতে এসব বিকৃতমনা ও পথভ্রষ্ট মুসলমানরা যে উদগ্রীব হয়ে উঠবে না, সেটা কেমন করেই বা সম্ভব।

৯৯. মিসর থেকে বের হবার পর বনী ইসরাঈলীদের দাসসুলভ জীবনের অবসান ঘটলো। তারা একটি স্বাধীন জাতির মর্যাদা লাভ করলো। এ সময় বনী ইসরাঈলীদেরকে একটি শরীয়াত দান করার জন্য মহান আল্লাহর হুকুমে মূসা আলাইহিস সালামকে সিনাই পাহাড়ে ডাকা হলো। কাজেই ওপরে যে ডাকের কথা বলা হয়েছে তা ছিল এ ব্যাপারে প্রথম ডাক। আর এর জন্য চল্লিশ দিনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করার বিশেষ কারণ ছিল। হযরত মূসা চল্লিশ দিন পাহাড়ের ওপর কাটাবেন। রোযা রাখবেন। দিনরাত ইবাদাত-বন্দেগী ও চিন্তা-গবেষণা করে মন-মস্তিষ্ককে একমুখী ও একনিষ্ঠ করবেন এবং এভাবে তাঁর ওপর যে গুরুত্বপূর্ণ বাণী নাযিল হতে যাচ্ছিল তাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করার যোগ্যতা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারবেন।

হযরত মূসা এ নির্দেশ পালন করার উদ্দেশ্যে সিনাই পাহাড়ে যাবার সময় বর্তমান মানচিত্রে বনী সালেহ ও সিনাই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ওয়াদি আল শায়খ (আল শায়খ উপত্যকা) নামে অভিহিত স্থানটিতে বনী ইসরাঈলকে রেখে গিয়েছিলেন। এ উপত্যকার যে অংশে বনী ইসরাঈল তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করেছিল বর্তমানে তার নাম আল রাহা প্রান্তর। উপত্যকার এক প্রান্তে একটি ছোট পাহাড় অবস্থিত। স্থানীয় বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম সামূদের এলাকা থেকে হিজরত করে এখানে এসে অবস্থান

করেছিলেন। বর্তমানে সেখানে তাঁর স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। অন্যদিকে রয়েছে জাবাল–ই–হারুন নামে আর একটি ছোট পাহাড়। কথিত আছে, হযরত হারুন আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলীদের বাছুর পূজায় অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে এখানে এসে বসেছিলেন। তৃতীয় দিকে রয়েছে সিনাইয়ের উঁচু পর্বত। এর ওপরের ভাগ সবসময় মেঘে আচ্ছন্ন থাকে। এর উচ্চতা ৭৩৫৯ ফুট। এ পাহাড়ের শিখর দেশে অবস্থিত একটি গুহা আজো তীর্থ যাত্রীদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়ে আছে। এ গুহায় হযরত মূসা (আ)
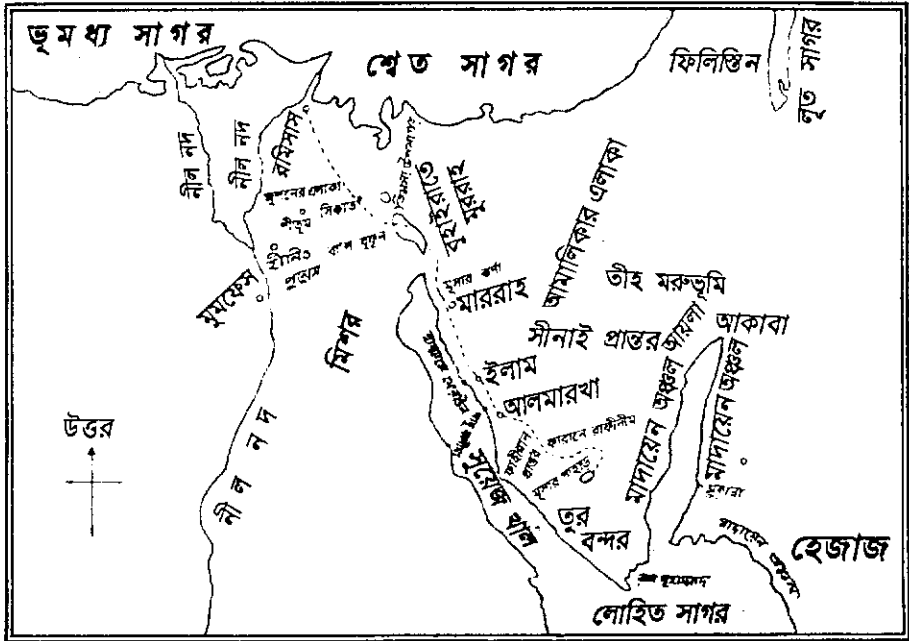
বনী ইসরাঈলের নির্গমন পথ

চিল্লা দিয়েছিলেন অর্থাৎ চল্লিশ দিন রোযা রেখে দিনরাত আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী ও চিন্তা–গবেষণায় কাটিয়েছিলেন। এর কাছেই রয়েছে মুসলমানদের একটি মসজিদ ও খৃষ্টানদের একটি গীর্জা। অন্যদিকে পাহাড়ের পাদদেশে রোম সম্রাট জাস্টিনিনের আমলের একটি খানকাহ আজো সশরীরে বিরাজ করছে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আন নামল ৯–১০ টীকা)।

১০০. হযরত হারুন আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের চেয়ে তিন বছরের বড়। তবুও নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন তাঁর সাহায্যকারী। তাঁর নবুওয়াত স্বতন্ত্র ছিল না। বরং হযরত মূসা আলাইহিস সাল্যম আল্লাহর কাছে আবেদন জানিয়ে তাঁকে নিজের উজীর নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কুরআন মজীদের সামনের দিকের আলোচনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٣﴾ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِيْ وَبِكَلَامِيْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾ وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ؕ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٥﴾

অতপর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন তখন সে আকূল আবেদন জানালো, "হে প্রভু! আমাকে দর্শনের শক্তি দাও, আমি তোমাকে দেখবো।" তিনি বললেন ঃ "তুমি আমাকে দেখতে পারো না। হাঁ, সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাও। সেটি যদি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তাহলে অবশ্যি তুমি আমাকে দেখতে পাবে।" কাজেই তার রব যখন পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলো। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে মূসা বললো ঃ "পাক-পবিত্র তোমার সত্তা। আমি তোমার কাছে তাওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম মুমিন।" বললেন ঃ "হে মূসা! আমি সমস্ত লোকদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে তোমাকে নির্বাচিত করেছি যেন আমার নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে পারো এবং আমার সাথে কথা বলতে পারো। কাজেই আমি তোমাকে যা কিছু দেই তা নিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"

এরপর আমি মূসাকে কতকগুলো ফলকে জীবনের সকল বিভাগ সম্পর্কে উপদেশ এবং প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ লিখে দিলাম[১০১] এবং তাকে বললাম ঃ

"এগুলো শক্ত হাতে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তোমার জাতিকে এর উত্তম তাৎপর্যের অনুসরণ করার হুকুম দাও।[১০২] শীঘ্রই আমি তোমাদের দেখাবো ফাসেকদের গৃহ।[১০৩]

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٧﴾

কোন প্রকার অধিকার ছাড়াই যারা পৃথিবীতে বড়াই করে বেড়ায়,[১০৪] শীঘ্রই আমার নিদর্শনসমূহ থেকে আমি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবো। তারা আমার যে কোন নিদর্শন দেখলেও তার প্রতি ঈমান আনবে না। তাদের সামনে যদি সোজা পথ এসে যায় তাহলে তারা তা গ্রহণ করবে না। আর যদি তারা বাঁকা পথ দেখতে পায় তাহলে তার ওপর চলতে আরম্ভ করবে। কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং সেগুলোর ব্যাপারে বেপরোয়া থেকেছে। আমার নিদর্শনসমূহকে যারাই মিথ্যা বলেছে এবং আখেরাতের সাক্ষাতের কথা অস্বীকার করেছে তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হয়ে গেছে।[১০৫] যেমন কর্ম তেমন ফল—এ ছাড়া লোকেরা কি আর কোন প্রতিদান পেতে পারে?

১০১. বাইবেলে এ দু'টি ফলক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এ দু'টি ছিল প্রস্তর ফলক। এ ফলকে লেখার কাজটিকে কুরআন ও বাইবেল উভয় কিতাবেই স্বয়ং আল্লাহর কীর্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে আল্লাহ নিজের কুদরত তথা অসীম ক্ষমতা বলে নিজেই সরাসরি এ ফলকে লেখার কাজ সম্পাদন করেছিলেন, না কোন ফেরেশতাকে দিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন অথবা এ কাজে হযরত মূসার হাত ব্যবহার করেছিলেন, এ ব্যাপারটি জানার কোন মাধ্যম আমাদের হাতে নেই। (তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য পড়ুন ঃ বাইবেল, যাত্রা পুস্তক ৩১ ঃ ১৮, ৩২ ঃ ১৫–১৬ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ৫ ঃ ৬–২২)।

১০২. অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের সরল, সোজা ও সুস্পষ্ট মর্ম ও তাৎপর্য গ্রহণ করো। একজন সহজ সরল বিবেক সম্পন্ন মানুষ, যার মনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য ও বক্রতা নেই, সে সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা যে অর্থ বোঝে, এখানে তার কথাই বলা হয়েছে। যারা আল্লাহর বিধানের সরল সোজা অর্থবোধক শব্দগুলো থেকে জটিল আইনগত মারপ্যাঁচ এবং বিভ্রাট বিভ্রান্তি ও কলহ কোন্দল সৃষ্টির পথ খুঁজে বের করে, তাদের সেই সব কূটতর্ককে যাতে আল্লাহর কিতাবের অনুমোদিত বিষয় মনে না করা হয় তাই এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

১৮ রুকূ'

মূসার অনুপস্থিতিতে[১০৬] তার জাতির লোকেরা নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি বাছুরের মূর্তি তৈরী করলো। তার মুখ দিয়ে গরুর মত 'হাম্বা' রব বের হতো। তারা কি দেখতে পেতো না যে, ঐ বাছুর তাদের সাথে কথাও বলে না আর কোন ব্যাপারে তাদেরকে পথনির্দেশনাও দেয় না? কিন্তু এরপরও তাকে মাবুদে পরিণত করলো। বস্তুত তারা ছিল বড়ই জালেম।[১০৭] তারপর যখন তাদের প্রতারণার জাল ছিন্ন হয়ে গেলো এবং তারা দেখতে পেল যে, আসলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তখন বলতে লাগলো ঃ "যদি আমাদের রব আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন এবং আমাদের ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।"

১০৩. অর্থাৎ সামনে অগ্রসর হয়ে তোমরা এমন সব জাতির প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখবে যারা আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং ভুল পথে চলার ব্যাপারে অবিচল ছিল। সেই ধ্বংসাবশেষগুলো দেখে এ ধরনের কর্মনীতি অবলম্বনের পরিণাম কি হয় তা তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে।

১০৪. অর্থাৎ আমার প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী এ ধরনের লোকেরা কোন শিক্ষাপ্রদ ঘটনা অনুধাবন করতে এবং কোন শিক্ষণীয় বিষয় থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে না।

'বড়র আসন গ্রহণ করা' বা 'বড়াই করে বেড়ানো' বাক্যাংশটি কুরআন মজীদে এমন এক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা থেকে বুঝা যায় যে, বান্দা নিজেকে আল্লাহর বন্দেগী করার উর্ধে স্থান দেয়, আল্লাহর আদেশ নিষেধের কোন ধার ধারে না এবং এমন একটি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে যাতে মনে হয়, সে আল্লাহর বান্দা নয় এবং আল্লাহ তার রব নয়। একটি মিথ্যা ও ভূয়া আত্মম্ভরিতা ছাড়া এ ধরনের অহংকারের কোন অর্থ হয় না। কারণ আল্লাহর যমীনে বাস করে কোন মানুষের অন্যের বান্দা হয়ে থাকার কোন অধিকার নেই। তাই এখানে বলা হয়েছে ঃ "কোন প্রকার অধিকার ছাড়াই যারা পৃথিবীতে বড়াই করে বেড়ায়।"

১০৫. ব্যর্থ হয়ে গেছে অর্থাৎ ফলদায়ক হয়নি এবং তা অলাভজনক ও অর্থহীন হয়ে পড়েছে। কারণ আল্লাহর দরবারে মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা ও কর্ম সফল হওয়া নির্ভর করে

দু'টি বিষয়ের ওপর। এক, সেই প্রচেষ্টা ও কর্মটি অনুষ্ঠিত হতে হবে শরীয়াতের আইনের আওতাধীনে। দুই, দুনীয়ার পরিবর্তে আখেরাতের সাফল্য হবে সেই প্রচেষ্টা ও কর্মের লক্ষ্য। এ শর্ত দু'টি পূর্ণ না হলে অনিবার্যভাবেই সমস্ত কৃতকর্ম পণ্ড ও বৃথা হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর হেদায়াত গ্রহণ করে না বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে বিদ্রোহাত্মক পদ্ধতিতে দুনিয়ায় কাজ করে, সে কোনক্রমেই আল্লাহর কাছে কোন প্রকার প্রতিদানের আশা করার অধিকার রাখে না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্যই সব কিছু করে এবং আখেরাতের জন্য কিছুই করে না, সোজা কথায় বলা যায়, আখেরাতে তার কোন সুফল লাভের আশা করা উচিত নয় এবং সেখানে তার কোন ধরনের সুফল লাভ করার কোন কারণও নেই। আমার মালিকানাধীন জমিকে কোন ব্যক্তি যদি আমার অনুমোদন ছাড়াই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে থাকে তাহলে আমার পক্ষ থেকে শাস্তি পাওয়া ছাড়া সে আর কিসের প্রত্যাশা করতে পারে? আর সেই জমির ওপর অন্যায়ভাবে নিজের দখলী স্বত্ব বহাল রাখার সময় যদি এ সমস্ত কাজ সে নিজে এ উদ্দেশ্যেই করে থাকে যে, যত দিন আসল মালিক তার অন্যায় ধৃষ্টতাকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সে এ দ্বারা লাভবান হতে থাকবে এবং জমি পুনরায় মালিকের দখলে চলে যাওয়ার পর সে আর তা থেকে লাভবান হবার আশা করবে না। বা লাভবান হতে চাইবে না, তাহলে এ ধরনের অবৈধ দখলদারের কাছ থেকে নিজের জমি ফেরত নেবার পর কি কারণে আমি আবার নিজের উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ অনর্থক তাকে দিতে থাকবো?

১০৬. অর্থাৎ ৪০ দিন পর্যন্ত হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর ডাকে সিনাই পাহাড়ে গিয়ে অবস্থান করছিলেন এবং তার জাতি পাহাড়ের পাদদেশে 'আর রাহা' প্রান্তরে অবস্থান করছিল সেই সময়।

১০৭. বনী ইসরাঈলীরা যে মিসরীয় কৃষ্টি নিয়ে মিসর ত্যাগ করেছিল এটি ছিল তার দ্বিতীয় প্রকাশ। মিসরে গো–পূজা ও গরুর পবিত্রতার যে ধারণা প্রচলিত ছিল তাতে এ জাতিটি এমন গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল যে, এ সম্পর্কে কুরআন বলছে : وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ অর্থাৎ "তাদের মনের গভীরে গো–বৎসের ভাবমূর্তি বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।" সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সবেমাত্র তিন মাস হলো তারা মিসর ত্যাগ করেছিল। সাগরের দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাওয়া, সাগর বুকে ফেরাউনের সলিল সমাধি লাভ করা, এমন একটি দাসত্বের নিগড় ভেঙে তাদের বেরিয়ে আসা যা ভাঙার কোন আশাই ছিল না এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন ঘটনা এখনো তাদের স্মৃতিতে জীবন্ত ছিল। তারা খুব ভাল করেই জানতো, এসব কিছুই আল্লাহর অসীম ক্ষমতা বলেই সম্ভব হয়েছিল। অন্য কারোর শক্তির সামান্যতম অংশও এতে ছিল না। কিন্তু এরপরও তারা প্রথমে নবীর কাছে একটি কৃত্রিম ইলাহর চাহিদা পেশ করলো, তারপর নবীর অনুপস্থিতির প্রথম সুযোগেই নিজেরাই একটি মূর্তি বানিয়ে ফেললো। এ ধরনের কার্যকলাপের কারণেই বনী ইসরাঈলের কোন কোন নবী নিজের জাতিকে এমন এক ব্যভিচারী নারীর সাথে তুলনা করেছেন, যে নিজের স্বামী ছাড়া অন্য যে কোন পুরুষের সাথে প্রেম করে এবং বিয়ের প্রথম রাতেই যে স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দ্বিধা করে না।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي
مِن بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ
أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا
يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنتَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾

ওদিকে মূসা ফিরে এলেন তার জাতির কাছে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায়। এসেই বললেন ঃ "আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার বড়ই নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছো! তোমরা কি নিজেদের রবের হুকুমের অপেক্ষা করার মত এতটুকু সবরও করতে পারলে না।?" সে ফলকগুলো ছুঁড়ে দিল এবং নিজের ভাইয়ের (হারুন) মাথার চুল ধরে টেনে আনলো। হারুন বললো ঃ "হে আমার সহোদর! এ লোকগুলো আমাকে দুর্বল করে ফেলেছিল এবং আমাকে হত্যা করার উপক্রম করেছিল। কাজেই তুমি শত্রুর কাছে আমাকে হাস্যাস্পদ করো না এবং আমাকে এ জালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।[১০৮] *তখন মূসা বললো ঃ "হে আমার রব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো এবং তোমার অনুগ্রহের মধ্যে আমাদের দাখিল করে নাও, তুমি সবচাইতে বেশী অনুগ্রহকারী।"*

১০৮. ইহুদীরা জোরপূর্বক হযরত হারুনের ওপর একটি জঘন্য অপবাদ আরোপ করে আসছিল। কুরআন মজীদ এখানে তা খণ্ডন করেছে। বাইবেলে বাছুর পূজার ঘটনাটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত মূসার যখন পাহাড় থেকে নেমে আসতে দেরি হলো তখন বনী ইসরাঈলীরা অধৈর্য হয়ে হযরত হারুনকে বললো, আমাদের জন্য একটি মাবূদ বানিয়ে দাও। হযরত হারুন তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী একটি সোনার বাছুর বানিয়ে দিলেন। বাছুরটিকে দেখেই বনী ইসরাঈলীরা বলে উঠলো, হে বনী ইসরাঈল! এ তো তোমাদের সেই খোদা, যা তোমাদেরকে মিসর থেকে বের করে নিয়ে এসেছে। তারপর হযরত হারুন তার জন্য একটি বেদী নির্মাণ করলেন, এক ঘোষণার মাধ্যমে পরের দিন সমস্ত বনী ইসরাঈলকে একত্রিত করলেন এবং সেই গো-দেবতার বেদীমূলে কুরবানী দিলেন। (যাত্রা পুস্তক ৩২ ঃ ১-৬) কুরআন মজীদের একাধিক স্থানে এ মিথ্যা বর্ণনার প্রতিবাদ করা হয়েছে, এবং যথার্থ সত্য ঘটনা বর্ণনা করে সেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

১৯ রুকূ'

(জওয়াবে বলা হলো) "যারা বাছুরকে মাবুদ বানিয়েছে তারা নিশ্চয়ই নিজেদের রবের ক্রোধের শিকার হবেই এবং দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত হবে। মিথ্যা রচনাকারীদেরকে আমি এমনি ধরনের শাস্তিই দিয়ে থাকি। আর যারা খারাপ কাজ করে তারপর তাওবা করে নেয় এবং ঈমান আনে, এ ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে এ তাওবা ও ঈমানের পর তোমার রব ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

তারপর মূসার ক্রোধ প্রশমিত হলে সে ফলকগুলি উঠিয়ে নিল। যারা নিজেদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য ঐ সব ফলকে ছিল পথনির্দেশ ও রহমত।

নবী হারুন এ ঘৃণ্য অপরাধটি করেননি বরং এটি করেছিল আল্লাহর দুশমন ও বিদ্রোহী সামেরী। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা তা–হা ৯০–৯৪ আয়াত)।

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি বড় বিস্ময়কর মনে হয়। বনী ইসরাঈলীরা যাদেরকে আল্লাহর নবী বলে মানে তাদের মধ্য থেকে কারোর চরিত্রে তারা কলংক লেপন না করে ছাড়েনি, আবার কলংক লেপনও করেছে এমন বিশ্রীভাবে, যা শরীয়াত ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম অপরাধ বিবেচিত হয়। যেমন শিরক, যাদু, ব্যভিচার, মিথ্যাচার, প্রতারণা এবং এমনি ধরনের আরো বিভিন্ন জঘন্য গুনাহের কাজ, যেগুলোতে লিপ্ত হওয়া একজন নবী তো দূরের কথা সাধারণ মুমিন ও ভদ্রলোকের পক্ষেও মারাত্মক লজ্জার ব্যাপার মনে করা হয়। বাহ্যত কথাটি বড়ই অদ্ভুত মনে হয়। কিন্তু বনী ইসরাঈলীদের নৈতিকতার ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায়, আসলে এ জাতিটির ব্যাপারে এটি মোটেই বিস্ময়কর নয়। এ জাতিটি যখন নৈতিক ও ধর্মীয় অধপতনের শিকার হলো এবং তাদের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত এমনকি উলামা, মাশায়েখ ও দীনী পদাধিকারী ব্যক্তিরাও গোমরাহী ও চরিত্রহীনতার সয়লাবে ভেসে গেলো তখন তাদের অপরাধী বিবেক নিজেদের এ অবস্থার জন্য ওযর তৈরী করতে শুরু করে দিল এবং যেসব অপরাধ তারা নিজেরা করে চলছিল সেগুলো সবই নবীদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে তাদের

وَاخْتَارَ مُوسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ۭ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاۗءُ
مِنَّا ۚ اِنْ هِىَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ۭ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاۗءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَاۗءُ ۭ اَنْتَ
وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾ وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ
هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ۭ قَالَ عَذَابِيْٓ
اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاۗءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۭ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ
يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٦﴾

আর মূসা (তার সাথে) আমার নির্ধারিত সময়ে হাযির হবার জন্য নিজের জাতির সত্তর জন লোককে নির্বাচিত করলো।[১০৯] যখন তারা একটি ভয়াবহ ভূমিকম্পে আক্রান্ত হলো তখন মূসা বললো : "হে প্রভু! তুমি চাইলে আগেই এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করে দিতে পারতে। আমাদের মধ্য থেকে কিছু নির্বোধ লোক যে অপরাধ করেছিল সে জন্য কি তুমি আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবে? এটি তো ছিল তোমার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা, এর মাধ্যমে তুমি যাকে চাও পথভ্রষ্ট করো আবার যাকে চাও হেদায়াত দান করো।[১১০] তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। কাজেই আমাদের মাফ করে দাও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। আর আমাদের জন্য এ দুনিয়ার কল্যাণ লিখে দাও এবং আখেরাতেরও, আমরা তোমার দিকে ফিরেছি।" জওয়াবে বলা হলো : "শাস্তি তো আমি যাকে চাই তাকে দিয়ে থাকি কিন্তু আমার অনুগ্রহ সব জিনিসের ওপর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।[১১১] কাজেই তা আমি এমন লোকদের নামে লিখবো যারা নাফরমানী থেকে দূরে থাকবে, যাকাত দেবে এবং আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনবে।"

নবীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। এভাবে তারা বলতে চাইলো যে, নবীরাই যখন এসব থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারেননি তখন অন্যেরা আর কেমন করে বাঁচতে পারে? এ ব্যাপারে হিন্দুদের সাথে ইহুদীদের অবস্থার মিল রয়েছে। হিন্দুদের মধ্যেও যখন নৈতিক অধপতন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তখন এমন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে দেবতা,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

(আজ তারাই এ রহমতের অংশীদার) যারা এ প্রেরিত উম্মী নবীর আনুগত্য করে,[১১২] যার উল্লেখ নিকট এখানে তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত অবস্থায় পাওয়া যায়।[১১৩] সে তাদের সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে, তাদের জন্য পাক পবিত্র জিনিসগুলো হালাল ও নাপাক জিনিসগুলো হারাম করে[১১৪] এবং তাদের ওপর থেকে এমন সব বোঝা নামিয়ে দেয়। যা তাদের ওপর চাপানো ছিল আর এমন সব বাঁধন থেকে তাদেরকে মুক্ত করে যাতে তারা আবদ্ধ ছিল।[১১৫] কাজেই যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সাহায্য সহায়তা দান করে এবং তার সাথে অবতীর্ণ আলোক রশ্মির অনুসরণ করে তারাই সফলতা লাভের অধিকারী।

মুনি-ঋষি, অবতার তথা জাতির যারা সর্বোত্তম আদর্শ ব্যক্তিত্ব ছিল তাদের সবার গায়ে কলংক লেপন করে দেয়া হয়েছিল। এভাবে তারা বলতে চেয়েছিল যে, এত বড় মহান ব্যক্তিত্বরাই যখন এসব খারাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে তখন আমরা সাধারণ মানুষরা আর কোন্ ছার? আর এ কাজগুলো যখন এ ধরনের মহীম মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য লজ্জাকর নয় তখন আমাদের জন্যই বা তা কলংকজন হতে যাবে কেন?

১০৯. জাতীয় প্রতিনিধিদের তলব করার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। জাতির ৭০ জন প্রতিনিধি সিনাই পাহাড়ে আল্লাহর সমীপে হাযির হয়ে সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে গো-বৎস পূজার অপরাধের ক্ষমা চাইবে এবং নতুন করে আল্লাহর আনুগত্যের অংগীকার করবে, এই ছিল এর উদ্দেশ্য। বাইবেল ও তালমূদে এ বিষয়টির উল্লেখ নেই। তবে হযরত মূসা যে ফলকগুলি ছুঁড়ে দিয়ে ভেঙে ফেলেছিলেন সেগুলোর বদলে অন্য ফলক দেবার জন্য তাঁকে সিনাই পাহাড়ে ডেকে পাঠানো হয়েছিল একথা অবশ্যি সেখানে উল্লেখিত হয়েছে। (যাত্রা পুস্তক ৩৪ অধ্যায়)।

১১০. এর অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেকটি পরীক্ষাকাল মানুষের জন্য চূড়ান্তই হয়ে থাকে। এ পরীক্ষা চালুনীর মত একটি মিশ্রিত দল থেকে কর্মঠ লোকগুলোকে বাছাই করে নিয়ে

অকর্মণ্য লোকগুলোকে দূরে নিক্ষেপ করে দল থেকে আলাদা করে দেয়। এই ধরনের পরীক্ষা মাঝে মাঝে আসতে থাকে, এটা আল্লাহর একটি কর্ম কৌশল। এসব পরীক্ষায় যারা সফলকাম হয় তারা মূলত আল্লাহর সাহায্য ও পথনির্দেশেই সাফল্য লাভ করে থাকে। আর যারা ব্যর্থ হয় তারা আল্লাহর সাহায্য ও পথনির্দেশ থেকে বঞ্চিত হবার কারণেই ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। যদিও আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও পথনির্দেশনা লাভ করারও একটি নিয়ম আছে এবং এ নিয়মটি সম্পূর্ণরূপে প্রজ্ঞা ও ইনসাফের ওপর নির্ভরশীল। তবুও এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে, পরীক্ষায় কারোর সফলকাম বা অসফল হওয়া আসলে আল্লাহরই সাহায্য, অনুগ্রহ ও পথনির্দেশনার ওপর নির্ভর করে।

১১১. অর্থাৎ মহান আল্লাহ যে পদ্ধতিতে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন সেখানে ক্রোধ মুখ্য নয় এবং অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী সেখানে মাঝে মধ্যে দেখা যায় এমন নয়। বরং অনুগ্রহই সেখানে মুখ্য এবং সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা তারই ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর সেখানে ক্রোধের প্রকাশ কেবল তখনই ঘটে যখন মানুষের দম্ভ ও অহংকার সীমা ছাড়িয়ে যায়।

১১২. ওপরের বাক্যটি পর্যন্ত হযরত মূসার দোয়ার জওয়াব শেষ হয়ে গিয়েছিল। অতপর সুযোগ বুঝে এবার সাথে সাথেই বনী ইসরাঈলকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এ ভাষণটির মূল বক্তব্য হচ্ছে তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হবার জন্য হযরত মূসা আলাইহিস সালামের যুগে যেসব শর্ত আরোপ করা হয়েছিল আজো সেগুলোই বহাল রয়ে গেছে। আর তোমাদের এ নবীর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারটি আসলে সেই শর্তগুলোরই দাবী। তোমাদের বলা হয়েছিল, যারা আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে থাকে আল্লাহর রহমত তাদেরই প্রাপ্য। তাইতো যে নবীকে আল্লাহ নিযুক্ত করেছেন তার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করাই হচ্ছে আজকের সবচেয়ে বড় মৌলিক নাফরমানী। কাজেই যতদিন তোমরা এ নাফরমানী থেকে বিরত হবে না ততদিন তোমরা খুটিনাটি ও ছোটখাটো তাকওয়ার বিষয় নিয়ে যতই মাতামাতি কর না কেন তাকওয়ার ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত হবে না। তোমাদের বলা হয়েছিল যাকাতও আল্লাহর রহমতের অংশ পাওয়ার একটি শর্ত। তাইতো আজ এ নবীর নেতৃত্বে দীন প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম চলছে যতদিন তার সাথে সেই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা হবে না ততদিন কোন প্রকার অর্থ ব্যয় যাকাতের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না। কাজেই তোমরা যতই দান খয়রাত করো এবং নজর–নিয়াজ দাও না কেন এ পথে অর্থ ব্যয় না করা পর্যন্ত যাকাতের মৌলিক ভিত্তিই প্রতিষ্ঠিত হবে না। তোমাদের বলা হয়েছিল, যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি ঈমান আনে আল্লাহ নিজের রহমত কেবল তাদের জন্যই লিখে রেখেছেন। তাইতো আজ এ নবীর ওপর যেসব আয়াত নাযিল হচ্ছে সেগুলো অস্বীকার করে তোমরা কোনক্রমেই আল্লাহর আয়াত মান্যকারী হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারো না। কাজেই তোমরা তাওরাতের প্রতি ঈমান রাখার যতই দাবী কর না কেন যতদিন তোমরা এ নবীর প্রতি ঈমান আনবে না ততদিন এ শেষ শর্তটিও পূর্ণ হবে না।

এখানে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য "উম্মী" শব্দটির ব্যবহারও বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। বনী ইসরাঈলীরা নিজেদের ছাড়া দুনিয়ার অন্য জাতিদেরকে উম্মী (GENTILES) বলতো। কোন উম্মীর নেতৃত্ব গ্রহণ করা তো দূরের কথা উম্মীদের জন্য নিজেদের সমান মানবিক অধিকার স্বীকার করাও ছিল তাদের জাতীয় মর্যাদা ও অহংকারের

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٨﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٩﴾

২০ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! বলে দাও, "হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের জন্য সেই আল্লাহর রসূল হিসেবে এসেছি, যিনি পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলীর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। কাজেই ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তার প্রেরিত সেই নিরক্ষর নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীর প্রতি ঈমান আনে এবং তার আনুগত্য করো। আশা করা যায়, এভাবে তোমরা সঠিক পথ পেয়ে যাবে।"

মূসার[১১৬] জাতির মধ্যে এমন একটি দলও ছিল যারা সত্য অনুযায়ী পথনির্দেশ দিতো এবং সত্য অনুযায়ী ইনসাফ করতো।[১১৭]

পরিপন্থী। তাই কুরআনেই বলা হয়েছে : لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيِّيْنَ سَبِيْلٌ (উম্মীদের ধন-সম্পদ ভোগ দখল করার জন্য আমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না। (আলে ইমরান ৭৫ আয়াত) কাজেই আল্লাহ এ ক্ষেত্রে তাদেরই পরিভাষা ব্যবহার করে বলছেন, এখন তো এ উম্মীর সাথে তোমাদের ভাগ্য জুড়ে দেয়া হয়েছে। এর আনুগত্য স্বীকার করলে তোমরা আমার অনুগ্রহের অংশ লাভ করবে, নয়তো শত শত বছর থেকে তোমরা আমার যে ক্রোধের শিকার হয়ে আসছো এখনো তাই তোমাদের কপালে লেখা হবে।

১১৩. দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাওরাত ও ইনজীলের নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন। এসব স্থানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ : ১৫-১৯, মথি ২১ : ৩৩-৪৬, যোহন ১:১৯-২১, যোহন ১৪ : ১৫-১৭ এবং ২৫-৩০, যোহন ১৫ : ২৫-২৬, যোহন ১৬ : ৭-১৫)

১১৪. অর্থাৎ যে পাক-পবিত্র জিনিসগুলো তারা হারাম করে রেখেছে সেগুলো তিনি হালাল করে দেন এবং যেসব নাপাক ও অপবিত্র জিনিস তারা হালাল করে নিয়েছে সেগুলো তিনি হারাম গণ্য করেন।

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ
قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ
قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ
الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۚ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ
كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

আর তার জাতিকে আমি বারোটি পরিবারে বিভক্ত করে তাদেরকে স্বতন্ত্র গোত্রের রূপ দিয়েছিলাম।[১১৮] আর যখন মূসার কাছে তার জাতি পানি চাইলো তখন আমি তাকে ইঙ্গিত করলাম, অমুক পাথরে তোমার লাঠি দিয়ে আঘাত করো। ফলে সেই পাথরটি থেকে অকস্মাত বারোটি ঝরণাধারা প্রবাহিত হলো এবং প্রত্যেকটি দল তাদের পানি গ্রহণ করার জায়গা নির্দিষ্ট করে নিল। আমি তাদের ওপর মেঘমালার ছায়া দান করলাম এবং তাদের ওপর অবতীর্ণ করলাম মান্না ও সালওয়া[১১৯]—যেসব ভাল ও পাক জিনিস তোমাদের দিয়েছি সেগুলো খাও। কিন্তু এরপর তারা যা কিছু করেছে তাতে আমার ওপর জুলুম করেনি বরং নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে।

১১৫. অর্থাৎ তাদের ফকীহরা নিজেদের আইনগত সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক নেতৃবর্গ নিজেদের ধার্মিকতা ও পরহেজগারীর অতি বাড়াবাড়ির সাহায্যে এবং মূর্খ সাধারণ মানুষ নিজেদের কল্প কুসংস্কার ও মনগড়া নীতি-নিয়মের বেড়াজালে আটকে তাদের জীবনকে যেসব বোঝার নীচে দাবিয়ে রাখে এবং যেসব বাঁধনে তাদেরকে বেঁধে রাখে এ নবী সেই সমস্ত বোঝা নামিয়ে দেন এবং সমস্ত বাঁধন খুলে দেন।

১১৬. মূল আলোচনা চলছিল বনী ইসরাঈল সম্পর্কে। মাঝখানে প্রসঙ্গক্রমে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এখান থেকে আবার বক্তৃতার ধারা পরিবর্তন করে আগের আলোচনায় ফিরে আসা হয়েছে।

১১৭. অধিকাংশ অনুবাদক এ আয়াতের অনুবাদ এভাবে করেছেন—"মূসার জাতির মধ্যে এমন একটি দল আছে যারা সত্য অনুযায়ী পথনির্দেশ দেয় ও ইনসাফ করে।" অর্থাৎ তাদের মতে কুরআন নাযিল হবার সময় বনী ইসরাঈলীদের যে নৈতিক ও মানসিক অবস্থা বিরাজমান ছিল তারই কথা এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বাপর আলোচনা বিশ্লেষণ করে আমরা এ মতটিকেই অগ্রাধিকার দিতে চাই যে, এখানে হযরত মূসার সময়

বনী ইসরাঈলীদের যে অবস্থা ছিল তারই কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে এ বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ জাতির মধ্যে যখন বাছুর পূজার অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর পাকড়াও করা হয় তখন সমগ্র জাতি গোমরাহ ছিল না। বরং তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তখনো সৎ ছিল।

১১৮. সূরা মায়েদার ১২ আয়াতে বনী ইসরাঈলের সমাজ কাঠামো পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস প্রসংগে যে কথা বলা হয়েছে এবং বাইবেলের গণনা পুস্তকে যে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সেদিকেই এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, আল্লাহর আদেশে হযরত মূসা সিনাই পাহাড়ের জনবসতিহীন এলাকায় অবস্থানকালে বনী ইসরাঈল জাতির আদম শুমারী সম্পন্ন করেন। হযরত ইয়াকূবের দশ ছেলে এবং হযরত ইউসুফের দুই ছেলের বংশের ভিত্তিতে ১২টি পরিবারকে পৃথকভাবে ১২টি গোত্র বা গোষ্ঠীতে বিন্যস্ত ও সংগঠিত করেন। প্রত্যেকটি দলে একজন সরদার নিযুক্ত করেন। তাদের দায়িত্ব ছিল নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক দিক দিয়ে দলের মধ্যে নিয়ম-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং তাদের মধ্যে শরীয়াতের বিধান জারি করা। এ ছাড়া হযরত ইয়াকুবের যে দ্বাদশতম পুত্র লাবীর বংশে হযরত মূসা ও হযরত হারুনের জন্ম হয়েছিল, সেই শাখাটিকে বাদবাকী সব ক'টি গোত্রের মধ্যে সত্যের আলোক শিখা সমুজ্জ্বল রাখার দায়িত্ব পালনের জন্য একটি পৃথক দলের আকারে সংগঠিত করেন।

১১৯. ওপরে যে পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে সেটি ছিল মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলীদের ওপর যেসব অনুগ্রহ করেছিলেন তার অন্যতম। এরপর এখানে আরো তিনটি অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

এক ঃ সিনাই উপদ্বীপের জনমানবহীন এলাকায় তাদের জন্য অলৌকিক উপায়ে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। দুই, রৌদ্র তাপ থেকে বাঁচাবার জন্য তাদের ওপর আকাশে মেঘমালার ছায়া রচনা করা হয়। তিন, মান্না ও সালওয়ার আকারে তাদের জন্য খাদ্য সরবরাহের অস্বাভাবিক ব্যবস্থা করা হয়। তাদের জীবন ধারণের জন্য এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা না করা হলে কয়েক লাখ জনসংখ্যা সম্বলিত এ জাতিটি এ খাদ্য-পানীয় বিহীন পাহাড়-মরু-প্রান্তরে ক্ষুধা পিপাসায় একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। আজো কোন ব্যক্তি সেই এলাকায় গেলে সেখানকার পরিবেশ দেখে অবাক হয়ে যাবে। অকস্মাত পনের বিশ লাখ মানুষ যদি সেই এলাকায় গিয়ে ওঠে তাহলে তাদের জন্য খাদ্য, পানি ও ছায়াদানের কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তা তার মাথায়ই আসবে না। বর্তমানে সমগ্র সিনাই উপদ্বীপের জনসংখ্যা ৫৫ হাজারের বেশী নয়। আর আজ এই বিশ শতকেও যদি কোন দেশের শাসক সেখানে ৫ লাখ সৈন্য নিয়ে যেতে চায় তাহলে তাদের জন্য খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থাপনায় তার বিশেষজ্ঞদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ কারণে আল্লাহর কিতাব অমান্যকারী ও মুজিযা অস্বীকারকারী বহু আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদ ও গবেষকগণ একথা মানতেই চান না যে, বনী ইসরাঈলীরা সিনাই উপদ্বীপের কুরআনে ও বাইবেলে উল্লেখিত অংশ অতিক্রম করেছিল। তাদের ধারণা, সম্ভবত এ ঘটনাগুলো

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ۭ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾

স্মরণ করো[১২০] সেই সময়ের কথা যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, এ জনপদে গিয়ে বসবাস করো, সেখানে উৎপাদিত ফসল থেকে নিজেদের ইচ্ছামত আহার্য সংগ্রহ করো, 'হিত্তাতুন' 'হিত্তাতুন' বলতে বলতে যাও এবং শহরের দরজা দিয়ে সিজদানত হয়ে প্রবেশ করতে থাকো। তাহলে আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবো এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে অতিরিক্ত অনুগ্রহ দান করবো।" কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জালেম ছিল তারা তাদেরকে যে কথা বলা হয়েছিল তা পরিবর্তিত করে ফেললো। এর ফলে তাদের জুলুমের বদলায় আমি আকাশ থেকে তাদের প্রতি আযাব পাঠিয়ে দিলাম।[১২১]

ফিলিস্তিনের দক্ষিণে ও আরবের উত্তরের এলাকায় কোথাও সংঘটিত হয়ে থাকবে। সিনাই উপদ্বীপের প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক পরিবেশ যে রকম, তা দেখে তারা কল্পনাও করতে পারেন না যে, এত বড় একটা জাতির পক্ষে এখানে বছরের পর বছর এক একটি এলাকায় তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করতে করতে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। বিশেষ করে যখন মিসরের দিক থেকেও তাদের খাদ্য সরবরাহের পথ রুদ্ধ ছিল এবং অন্যদিকে পূর্ব ও উত্তরে আমালিকা গোত্রগুলো তাদের বিরোধিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এসব বিষয় বিবেচনা করলে সঠিকভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, এ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলীদের প্রতি নিজের যে সমস্ত অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করেছেন, তা আসলে কত বড় অনুগ্রহ ছিল। এরপর আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের এ ধরনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নিদর্শনাবলী দেখার পরও আল্লাহর সাথে এ জাতির নাফরমানী ও বিশ্বাসঘাতকতার যে ধারাবাহিক ঘটনাবলীতে ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ, তা থেকে বুঝা যায় যে, তারা কত বড় অকৃতজ্ঞ ছিল। (তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা বাকারা ৭২, ৭৩ ও ৭৬ টীকা)

১২০. মহান আল্লাহর উপরোল্লিখিত অনুগ্রহসমূহের জবাবে বনী ইসরাঈল কি ধরনের অপরাধমূলক ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য দেখাতে থাকে এবং কিভাবে ক্রমাগত ধ্বংসের আবর্তে নেমে যেতে থাকে, তা তুলে ধরার জন্য এখানে এ জাতির সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে।

১২১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল বাকারা ৭৪ ও ৭৫ টীকা।

وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ إِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَأْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾

২১ রুকূ'

আর সমূদ্রের তীরে যে জনপদটি অবস্থিত ছিল তার অবস্থা সম্পর্কেও তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করো।[১২২] তাদের সেই ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দাও যে, সেখানকার লোকেরা শনিবারে আল্লাহর হুকুম অমান্য করতো এবং শনিবারেই মাছেরা পানিতে ভেসে ভেসে তাদের সামনে আসতো[১২৩] অথচ শনিবার ছাড়া অন্য দিন আসতো না। তাদের নাফরমানীর কারণে তাদেরকে আমি ক্রমাগত পরীক্ষার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিলাম বলেই এমনটি হতো।[১২৪]

১২২. বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের মতে এ স্থানটি ছিল 'আয়লা', আয়লাত বা 'আয়লুত"। ইসরাঈলের ইহুদী রাষ্ট্র বর্তমানে এখানে এ নামে একটি বন্দর নির্মাণ করেছে। এর কাছেই রয়েছে জর্দানের বিখ্যাত বন্দর আকাবা। লোহিত সাগরের যে শাখাটি সিনাই উপদ্বীপের পূর্ব উপকূল ও আরবের পশ্চিম উপকূলের মাঝখানে একটি লম্বা উপসাগরের মত দেখায় তার ঠিক শেষ মাথায় এ স্থানটি অবস্থিত। বনী ইসরাঈলের উত্থান যুগে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এ শহরেই তাঁর লোহিত সাগরের সামরিক ও বাণিজ্যিক নৌবহরের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।

এখানে যে ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থসমূহে আমরা তার কোন উল্লেখ পাই না। তাদের ইতিহাসও এ প্রসংগে নীরব। কিন্তু কুরআন মজীদে যেভাবে এ ঘটনাটিকে এখানে ও সূরা বাকারায় বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন নাযিলের সময় বনী ইসরাঈলীরা সাধারণভাবে এ ঘটনাটি সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত ছিল। এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতার প্রশ্নে যেখানে মদীনার ইহুদীরা কোন একটি সুযোগও হাতছাড়া হতে দিতো না সেখানে কুরআনের এ বর্ণনার বিরুদ্ধে তারা আদৌ কোন আপত্তিই তোলেনি।

১২৩. কুরআনে 'সাবৃত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'সাবৃত' মানে শনিবার। বনী ইসরাঈলীদের জন্য এ দিনটিকে পবিত্র দিন গণ্য করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ এ দিনটিকে নিজের ও বনী ইসরাঈলীদের সন্তান–সন্তুতিদের মধ্যে সম্পাদিত পুরুষানুক্রমিক স্থায়ী অংগীকার গণ্য করে তাকীদ করেছিলেন যে, এ দিন কোন পার্থিব কাজ করা যাবে না, ঘরে আগুন পর্যন্ত জ্বালানো যাবে না, গৃহপালিত পশু এমন কি চাকর–বাকর–দাসদাসীদের থেকেও কোন সেবা গ্রহণ করা চলবে না এবং যে ব্যক্তি এ নিয়ম লংঘন করবে তাকে

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا
نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا
الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾

আর তাদের একথাও স্মরণ করিয়ে দাও, যখন তাদের একটি দল অন্য দলকে বলেছিল : "তোমরা এমন লোকদের উপদেশ দিচ্ছো কেন যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন বা কঠোর শাস্তি দেবেন?" জবাবে তারা বলেছিল, "এসব কিছু এ জন্যই করছি যেন আমরা তোমাদের রবের সামনে নিজেদের ওযর পেশ করতে পারি এবং এ আশায় করছি যে, হয়তো এ লোকেরা তাঁর নাফরমানী করা ছেড়ে দেবে।" শেষ পর্যন্ত তাদেরকে যে সমস্ত হেদায়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল তারা যখন সেগুলো সম্পূর্ণ ভুলে গেলো তখন যারা খারাপ কাজে বাধা দিতো তাদেরকে আমি বাঁচিয়ে নিলাম এবং বাকি সমস্ত লোক যারা দোষী ছিল তাদের নাফরমানীর জন্য তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিলাম।[১২৫]

হত্যা করা হবে। কিন্তু উত্তরকালে বনী ইসরাঈল প্রকাশ্যে এ আইনের বিরোধিতা করতে থাকে। ইয়ারমিয়াহ (যিরমিয়) নবীর আমলে (যিনি খৃষ্টপূর্ব ৬২৮ ও ৫৮৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে বেঁচে ছিলেন) লোকেরা খাস জেরুসালেমের সিংহ দরজাগুলো দিয়ে মালপত্র নিয়ে চলাফেরা করতো। এতে ঐ নবী ইহুদীদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তোমরা যদি এভাবে প্রকাশ্যে শরীয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত না হও তাহলে জেরুসালেমে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে। (যিরমিয় ১৭ : ২১-২৭) হযরত হিযকিঈল (যিহিস্কেল) নবীও এ একই অভিযোগ করেন। তাঁর আমল ছিল খৃষ্টপূর্ব ৫৯৫ ও ৫৩৬ এর মধ্যবর্তী সময়ে। তাঁর গ্রন্থে শনিবারের অবমাননাকে ইহুদীদের একটি মস্তবড় জাতীয় অপরাধ গণ্য করা হয়েছে। (যিহিস্কেল ২০ : ১২-২৪) এসব উদ্ধৃতি থেকে অনুমান করা যেতে পারে, কুরআন মজীদ এখানে যে ঘটনাটির কথা বলছে সেটিও সম্ভবত এ একই যুগের ঘটনা।

১২৪. মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহ যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন তার মধ্যে এও একটি পদ্ধতি যে, যখন কোন ব্যক্তি বা দলের মধ্যে আনুগত্য বিচ্যুতি ও নাফরমানীর প্রবণতা বাড়তে থাকে তখন তাকে আরো বেশী করে নাফরমানী করার সুযোগ দেয়া হয়। যেন তার যেসব প্রবণতা ভেতরে লুকিয়ে থাকে সেগুলো পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং যেসব অপরাধে সে নিজেকে কলুষিত করতে চায় কেবলমাত্র সুযোগের অভাবে সে সেগুলো থেকে বিরত থেকে না যায়।

১২৫. এ বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ জনপদে তিন ধরনের লোক ছিল। এক, যারা প্রকাশ্যে ও পূর্ণ ঔদ্ধত্য সহকারে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। দুই, যারা নিজেরা বিরুদ্ধাচরণ করছিল না কিন্তু অন্যের বিরুদ্ধাচরণকে নীরবে হাত পা গুটিয়ে বসে বসে দেখছিল এবং উপদেশ দানকারীদের বলছিল, এ হতভাগাদের উপদেশ দিয়ে কী লাভ? তিন, যারা ঈমানী সম্ভ্রমবোধ ও মর্যাদাবোধের কারণে আল্লাহর আইনের এহেন প্রকাশ্য অমর্যাদা বরদাশত করতে পারেনি এবং তারা এ মনে করে সৎকাজের আদেশ দিতে ও অসৎকাজ থেকে অপরাধীদেরকে বিরত রাখতে তৎপর ছিল যে, হয়তো ঐ অপরাধীরা তাদের উপদেশের প্রভাবে সৎপথে এসে যাবে, আর যদি তারা সৎপথে নাও আসে তাহলে অন্তত নিজেদের সামর্থ মোতাবিক কর্তব্য পালন করে তারা আল্লাহর সামনে নিজেদের দায় মুক্তির প্রমাণ পেশ করতে পারবে। এ অবস্থায় এ জনপদের ওপর যখন আল্লাহর আযাব নেমে এলো তখনকার অবস্থা বিশ্লেষণ করে কুরআন মজীদ বলছে, এ তিনটি দলের মধ্য থেকে একমাত্র তৃতীয় দলটিকেই বাঁচিয়ে নেয়া হয়েছিল। কারণ একমাত্র তারাই আল্লাহর সামনে নিজেদের ওযর পেশ করার চিন্তা করছিল এবং একমাত্র তারাই নিজেদের দায়িত্ব মুক্তির প্রমাণ সংগ্রহ করে রেখেছিল। বাকি দল দু'টিকে অপরাধীদের মধ্যে গণ্য করা হলো এবং নিজেদের অপরাধ অনুপাতে তারা শাস্তি ভোগ করলো।

কোন কোন তাফসীরকার এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ প্রথম দলটির শাস্তি ভোগ করার এবং দ্বিতীয় দলটির উদ্ধার প্রাপ্তির ব্যাপারে স্পষ্ট উক্তি করেছেন। কিন্তু তৃতীয় দলটির ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কাজেই তারা শাস্তি ভোগ করেছিল না উদ্ধার পেয়েছিল, এ ব্যাপারে কিছুই বলা যায় না। আবার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে, তিনি প্রথমে দ্বিতীয় দলটি শাস্তি লাভ করেছিল বলে মত পোষণ করতেন। পরে তাঁর ছাত্র ইকরামা তাঁকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করে দেন যে, দ্বিতীয় দলটি উদ্ধার পেয়েছিল। কিন্তু কুরআনের বর্ণনা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয়, হযরত ইবনে আব্বাসের প্রথম চিন্তাটিই সঠিক ছিল। একথা সুস্পষ্ট যে, কোন জনপদের ওপর আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হলে সমগ্র জনপদবাসীরা দু'ভাগেই বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। এক ভাগে এমন সব লোকেরা থাকে যারা আযাব ভোগ করে এবং অন্য ভাগে থাকে তারা যারা আযাব থেকে বেঁচে যায়। এখন কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী উদ্ধারপ্রাপ্ত যদি কেবল তৃতীয় দলটিই হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যারা উদ্ধার পায়নি তাদের মধ্যে থাকবে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় দলই। এরি সমর্থন পাওয়া যায় مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ (অর্থাৎ এসব কিছুই করছি আমরা তোমাদের রবের সামনে নিজের ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে) বাক্যাংশটির মধ্যে। এ বাক্যাংশটিতে আল্লাহ নিজেই একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আল্লাহর কাছে ওযর পেশ করার জন্য অবশ্যি নিজেদের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে যেতে হবে। এভাবে দায়িত্বমুক্তির প্রমাণ যারা সংগ্রহ করতে পারবে একমাত্র তারাই আল্লাহর কাছে ওযর পেশ করতে পারবে। এ থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে, যে জনপদে প্রকাশ্যে আল্লাহর বিধান লংঘন করা চলতে থাকে সেখানকার সবাই জবাবদিহির সম্মুখীন হয়। সেখানকার কোন অধিবাসী শুধু নিজেই আল্লাহর বিধান লংঘন করেনি বলেই আল্লাহর সামনে জবাবদিহি থেকে বাঁচতে পারে না। বরং আল্লাহর সামনে নিজের সাফাই পেশ করার জন্য তাকে অবশ্যই এ মর্মে

فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾ وَإِذْ
تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ
الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٧﴾
وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ
وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ
خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ
سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ۚ

তারপর যে কাজ থেকে তাদেরকে বাধা দেয়া হয়েছিল তাই যখন তারা পূর্ণ ঔদ্ধত্যসহকারে করে যেতে লাগলো তখন আমি বললাম, তোমরা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত বানর হয়ে যাও।[১২৬]

আর স্মরণ করো যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেন[১২৭] *"কিয়ামত পর্যন্ত তিনি সবসময় বনী ইসরাঈলীদের ওপর এমন সব লোককে চাপিয়ে দিয়ে যেতে থাকবেন যারা তাদেরকে দেবে কঠিনতম শাস্তি।"*[১২৮] *নিসন্দেহে তোমাদের রব দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চিতভাবেই তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়ও।*

আমি তাদেরকে পৃথিবীতে খণ্ড বিখণ্ড করে বহু সংখ্যক জাতিতে বিভক্ত করে দিয়েছি। তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল সৎ এবং কিছু লোক অন্য রকম। আর আমি ভাল ও খারাপ অবস্থায় নিক্ষেপ করার মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করতে থাকি, হয়তো তারা ফিরে আসবে। তারপর পরবর্তী বংশধরদের পর এমন কিছু অযোগ্য লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় যারা আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়ে এ তুচ্ছ দুনিয়ার স্বার্থ আহরণে লিপ্ত হয় এবং বলতে থাকে আশা করা যায়, আমাদের ক্ষমা করা হবে। পরক্ষণে সেই ধরনের পার্থিব সামগ্রী যদি আবার তাদের সামনে এসে যায় তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে তা লুফে নেয়।[১২৯]

প্রমাণ পেশ করতে হবে যে, নিজের সামর্থ মোতাবিক মানুষের সংশোধন ও আল্লাহর সত্য দীনের প্রতিষ্ঠার জন্য সে প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। এ ছাড়া কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বক্তব্য থেকেও আমরা সামষ্টিক অপরাধের ক্ষেত্রে আল্লাহর এ একই ধরনের আইনের কথা জানতে পারি। তাই আমরা দেখি কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَّ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً

(সেই বিপর্যয় থেকে সাবধান হও, যার কবলে বিশেষভাবে কেবলমাত্র তোমাদের মধ্য থেকে যারা জুলুম করেছে তারাই পড়বে না।) আর এর ব্যাখ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتّٰى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانِيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّنْكِرُوْهُ فَلاَ يُنْكِرُوْهُ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَذَّبَ اللّٰهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ -

"মহান আল্লাহ বিশেষ লোকদের অপরাধের দরুন সর্বসাধারণকে শাস্তি দেন না, যতক্ষণ সাধারণ লোকদের অবস্থা এমন পর্যায়ে না পৌঁছে যায় যে, তারা নিজেদের চোখের সামনে খারাপ কাজ হতে দেখে এবং তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশের ক্ষমতাও রাখে এরপরও কোন অসন্তোষ প্রকাশ করে না। কাজেই লোকেরা যখন এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন আল্লাহ সাধারণ ও অসাধারণ নির্বিশেষে সবাইকে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেন।"

এ ছাড়াও আলোচ্য আয়াত থেকে একথাও জানা যায় যে, এ জনপদের ওপর দুই পর্যায়ে আল্লাহর আযাব নাযিল হয়। প্রথম পর্যায়ে নাযিল হয় عَذَابٍ بَئِيْسٍ (কঠিন শাস্তি) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে নাফরমানী যারা অব্যাহত রেখেছিল তাদেরকে বানরে পরিণত করা হয়। আমার মতে প্রথম পর্যায়ের আযাবে উভয় দলই শামিল ছিল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের আযাব দেয়া হয়েছিল কেবলমাত্র প্রথম দলকে।

এ ক্ষেত্রে অবশ্যি সঠিক ব্যাপার একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। যদি আমার অভিমত সঠিক হয়ে থাকে তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। আর যদি আমি ভুল করে থাকি তাহলে সে জন্য আমিই দায়ী। আল্লাহ অবশ্যি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১২৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল বাকারা ৮৩ টীকা।

১২৭. এখানে মূল শব্দ হচ্ছে تَاَذَّنَ এর অর্থ হয় অনেকটা নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেবার মত।

১২৮. প্রায় খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে বনী ইসরাঈলকে এভাবে ক্রমাগত সতর্ক করে দিয়ে আসা হচ্ছিল। তাই দেখা যায়, ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থ সমষ্টিতে ইয়াসইয়াহ (যিশাইয়) ও ইয়ারমিয়াহ (যিরমিয়) এবং তাঁদের পর আগমনকারী নবীদের সকল গ্রন্থে কেবল এ সতর্কবাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে। তারপর ঈসা আলাইহিস সালামও তাদেরকে এ একই

أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۗ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾

তাদের কাছ থেকে কি কিতাবের অংগীকার নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর নামে কেবলমাত্র সত্য ছাড়া আর কিছুই বলবে না? আর কিতাবে যা লেখা আছে তাতো তারা নিজেরাই পড়ে নিয়েছে।[১৩০] আখেরাতের আবাস তো আল্লাহর ভয়ে ভীত লোকদেরই জন্য ভাল[১৩১]—এতটুকু কথাও কি তোমরা বুঝো না? যারা কিতাবের বিধান যথাযথভাবে মেনে চলে এবং নামায কায়েম করে, নিসন্দেহে এহেন সৎকর্মশীল লোকদের কর্মফল আমি নষ্ট করবো না। তাদের কি সেই সময়টার কথা কিছু মনে আছে যখন আমি পাহাড়কে হেলিয়ে তাদের ওপর ছাতার মত এমনভাবে বিস্তৃত করে দিয়েছিলাম যে, তারা ধারণা করছিল, তা বুঝি তাদের ওপর পতিত হবে? সে সময় আমি তাদেরকে বলেছিলাম, তোমাদেরকে আমি যে কিতাব দিচ্ছি তাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তাতে যা কিছু লেখা আছে তা স্মরণ রাখো, আশা করা যায়, তোমরা ভুল পথ অবলম্বন করা থেকে বাঁচতে পারবে।[১৩২]

সতর্কবাণী শুনান। বিভিন্ন ইনজীল গ্রন্থে তাঁর একাধিক ভাষণ থেকেই এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সবশেষে কুরআন মজীদও একথাটিকে দৃঢ়ভাবে পুনর্ব্যক্ত করেছে। সে সময় থেকে নিয়ে আজো পর্যন্ত ইতিহাসের এমন একটি যুগও অতিক্রান্ত হয়নি যখন ইহুদী জাতির ওপর দুনিয়ার কোথাও না কোথাও নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা অব্যাহত থাকেনি। ইহুদী জাতির এ অবস্থা কুরআন ও তার পূর্বেকার আসমানী গ্রন্থাবলীর সত্যতারই সুস্পষ্ট সাক্ষবহ।

১২৯. অর্থাৎ গুনাহ করে। তারা জানে এ কাজটি করা গুনাহ তবুও এ আশায় তারা এ কাজটি করে যে, কোন না কোনভাবে তাদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। কারণ তারা মনে করে, তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র এবং তারা যত কঠিন অপরাধই করুক না কেন তাদের ক্ষমালাভ অপরিহার্য। এ ভুল ধারণার ফলে কোন গুনাহ করার পর তারা লজ্জিত

হয় না এবং তাওবাও করে না। বরং ঐ একই ধরনের গুনাহ করার সুযোগ এলে তারা আবার তাতে জড়িয়ে পড়ে। এ হতভাগ্য লোকেরা এমন একটি কিতাবের উত্তরাধিকারী ছিল, যা তাদেরকে দুনিয়ার নেতৃত্বের পদে আসীন করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের হীনমন্যতা ও নীচাশয়তার ফলে তারা এ সৌভাগ্যের পরশমণিটির সাহায্যে তুচ্ছ পার্থিব সম্পদ আহরণ করার চাইতে বড় কোন জিনিস উপার্জনের হিম্মতই করলো না। তারা দুনিয়ায় ন্যায়–ইনসাফ, সত্য–সততার পতাকাবাহী এবং কল্যাণ ও সুকৃতির অগ্রপথিক ও পথপ্রদর্শক হবার পরিবর্তে নিছক দুনিয়ার কুকুর হয়েই রইল।

১৩০. অর্থাৎ তারা নিজেরাই জানে, তাওরাতের কোথাও বনী ইসরাঈলের জন্য শর্তহীন মুক্তি সনদ দেয়ার উল্লেখ নেই। আল্লাহ কখনো তাদেরকে একথা বলেননি এবং তাদের নবীগণও কখনো তাদেরকে এ ধরনের নিশ্চয়তা দেননি যে, তোমরা যা ইচ্ছা করতে পারো, তোমাদের সকল গুনাহ অবশ্যি মাফ হয়ে যাবে। তাছাড়া আল্লাহ নিজে যে কথা কখনো বলেননি তাকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করার কি অধিকারই বা তাদের থাকতে পারে? অথচ তাদের কাছ থেকে অংগীকার নেয়া হয়েছিল যে, আল্লাহর নামে কোন অসত্য কথা তারা বলবে না।

১৩১. এ আয়াতটির দু'টি অনুবাদ হতে পারে। একটি অনুবাদ আমি এখানে করেছি। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, "আল্লাহর ভয়ে ভীত লোকদের জন্য তো আখেরাতের আবাসই ভাল" প্রথম অনুবাদের আলোকে আয়াতের তাৎপর্য হবে এই যে, মাগফেরাত কারোর একচেটিয়া ব্যক্তিগত বা পারিবারিক অধিকার নয়। তুমি এমন কাজ করবে যা শাস্তি লাভের যোগ্য কিন্তু আখেরাতে তুমি নিছক ইহুদী বা ইসরাঈলী হবার কারণে ভাল জায়গা পেয়ে যাবে, এটা কখনো হতে পারে না। তোমাদের মধ্যে সামান্যতম বিবেক–বুদ্ধি থাকলেও তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে, আখেরাতের ভাল জায়গা একমাত্র তারাই পেতে পারে যারা দুনিয়ায় আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে কাজ করে। আর দ্বিতীয় অনুবাদটি গ্রহণ করলে মর্ম এ দাঁড়ায় যে, যেসব লোক আল্লাহর ভয়ে ভীত নয় একমাত্র তারাই দুনিয়াবী লাভ ও স্বার্থকে আখেরাতের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। আল্লাহর ভয়ে ভীত লোকেরা নিশ্চিতভাবে আখেরাতের স্বার্থকে দুনিয়ার স্বার্থের ওপর এবং আখেরাতের কল্যাণ ও লাভকে দুনিয়ার আয়েশ–আরামের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

১৩২. মূসা আলাইহিস সালামকে অংগীকারনামা খোদিত শিলালিপিগুলো দেবার সময় সিনাই পাহাড়ের পাদদেশে যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেদিকে এখানে ইংগিত করা হয়েছে। বাইবেলে নিম্নোক্ত ভাষায় এ ঘটনাটির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

> "পরে মূসা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেয়ার জন্য লোকদেরকে শিবির থেকে বাইরে আনলেন। আর তারা পর্বতের তলায় দাঁড়ালো। তখন সমস্ত সিনাই পর্বত ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কারণ মহান আল্লাহ অগ্নিশিখার মধ্য দিয়ে তার ওপর নেমে এলেন। আর ভাঁটির ধোঁয়ার মত ধোঁয়া ওপরে উঠছিল এবং গোটা পর্বত ভীষণভাবে কাঁপছিল।" (যাত্রা পুস্তক ১৯ ঃ ১৭–১৮)

এভাবে আল্লাহ কিতাবের বিধান মেনে চলার জন্য বনী ইসরাঈলীদের কাছ থেকে অংগীকার নেন। এ অংগীকার নিতে গিয়ে বাইরে তাদের জন্য একটি বিশেষ পরিবেশ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۚ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوٓا إِنَّمَآ أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

২২ রুকূ'

আর হে নবী![133] লোকদের স্মরণ করিয়ে দাও সেই সময়ের কথা যখন তোমাদের রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করেছিলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ "আমি কি তোমাদের রব নই?" তারা বলেছিল ঃ "নিশ্চয়ই তুমি আমাদের রব, আমরা এর সাক্ষ দিচ্ছি।"[134] এটা আমি এ জন্য করেছিলাম যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা না বলে বসো, "আমরা তো একথা জানতাম না।" অথবা না বলে ওঠো, "শিরকের সূচনা তো আমাদের বাপ–দাদারা আমাদের পূর্বেই করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশে আমাদের জন্ম হয়েছে। তবে কি ভ্রষ্টাচারী লোকেরা যে অপরাধ করেছিল সে জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করছো?"[135] দেখো, এভাবে আমি নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে পেশ করে থাকি।[136] আর এ জন্য করে থাকি যাতে তারা ফিরে আসে।[137]

সৃষ্টি করেন যাতে আল্লাহর প্রতাপ–প্রতিপত্তি, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব এবং এ অংগীকারের গুরুত্ব তাদের মনে পুরোপুরি অনুভূত হয় এবং বিশ্ব জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী শাহানশাহের সাথে অংগীকার ও চুক্তি সম্পাদন করাকে তারা যেন মামুলি ব্যাপার মনে করতে না পারে। এ থেকে এ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, তারা আল্লাহর সাথে অংগীকার করতে প্রস্তুত ছিল না, ভয় দেখিয়ে জোর জবরদস্তি করে তাদেরকে অংগীকারাবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, তারা সবাই ছিল মুমিন। সিনাই পাহাড়ের পাদদেশে তারা গিয়েছিল অংগীকারাবদ্ধ হতে। কিন্তু আল্লাহ তাদের সাথে মামুলীভাবে অংগীকার ও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হবার পরিবর্তে এ অংগীকারের অনুভূতি তাদের মনে ভালভাবে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করেন। অংগীকার করার সময় কোন্ মহাশক্তিধর সত্তার সাথে তারা অংগীকার করছে এবং তাঁর সাথে অংগীকার ভংগ করার পরিণাম কি হতে পারে, তা যেন তারা অনুভব করতে পারবে, এটাই ছিল আল্লাহর অভিপ্রায়।

এখানে এসে বনী ইসরাঈল জাতিকে সম্বোধনের পালা শেষ হয়ে যায়। পরবর্তী রুকূ'গুলোতে সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদেরকে সরাসরি ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তাদেরকে লক্ষ করে বক্তব্য রাখা হয়েছে।

১৩৩. পূর্ববর্তী আলোচনা যেখানে শেষ হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল, মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে বন্দেগী ও আনুগত্যের অংগীকার নিয়েছিলেন এখন সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে তাদেরকে জানানো হচ্ছে যে, এ ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের কোন বিশেষত্ব নেই বরং প্রকৃতপক্ষে তোমরা সবাই নিজেদের স্রষ্টার সাথে একটি অংগীকারে আবদ্ধ এবং এ অংগীকার তোমরা কতটুকু পালন করেছো সে ব্যাপারে তোমাদের একদিন জবাবদিহি করতে হবে।

১৩৪. বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, এটি আদম সৃষ্টির সময়কার একটি ঘটনা। সে সময় একদিকে যেমন ফেরেশতাদের একত্র করে প্রথম মানুষটিকে সিজদা করানো হয়েছিল এবং পৃথিবীতে মানুষের খিলাফতের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, অন্যদিকে ঠিক তেমনি কিয়ামত পর্যন্ত আদমের যে অগণিত সংখ্যক বংশধর জন্মলাভ করবে মহান আল্লাহ তাদের সবাইকে একই সংগে সজীব ও সচেতন সত্তায় আবির্ভূত করে নিজের সামনে উপস্থিত করেছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে তাঁর রব হবার ব্যাপারে সাক্ষ গ্রহণ করেছিলেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্ভবত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জ্ঞান লাভ করে যা কিছু বর্ণনা করেন তা এ বিষয়ের সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

> "মহান আল্লাহ সবাইকে একত্র করেন। (এক এক ধরনের বা এক এক যুগের) লোকদেরকে আলাদা আলাদা দলে সংগঠিত করেন। তাদেরকে মানবিক আকৃতি ও বাকশক্তি দান করেন। তারপর তাদের থেকে অংগীকার গ্রহণ করেন। তাদেরকে নিজেদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলে ঃ অবশ্যই তুমি আমাদের রব। তখন আল্লাহ বলেন ঃ কিয়ামতের দিন যাতে তোমরা না বলতে পারো আমরা তো একথা জানতাম না, তাই আমি তোমাদের ওপর পৃথিবী ও আকাশ এবং তোমাদের পিতা আদমকে সাক্ষী করছি। ভালভাবে জেনে রাখো, আমি ছাড়া ইবাদাত লাভের যোগ্য আর কেউ নেই এবং আমি ছাড়া আর কোন রব নেই। তোমরা আমার সাথে আর কাউকে শরীক করো না। আমি তোমাদের কাছে আমার নবী পাঠাবো। আমার সাথে তোমরা যেসব অংগীকার করছো তারা সেসব তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে। আর তোমাদের প্রতি আমার কিতাব নাযিল করবো। এ কথায় সমস্ত মানুষ বলে ওঠে ঃ আমরা সাক্ষ দিচ্ছি, তুমিই আমাদের রব, তুমিই আমাদের মাবুদ, তুমি ছাড়া আমাদের আর কোন রব ও মাবুদ নেই।"

কেউ কেউ এ ব্যাপারটিকে নিছক রূপক বা উপমা হিসেবে বর্ণিত একটি ব্যাপার মনে করে থাকেন। তাদের মতে এখানে কুরআন মজীদ কেবল একথাই বুঝাতে চায় যে, আল্লাহর রব হবার বিষয়টির স্বীকৃতি মানবিক প্রকৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং এ কথাটি এখানে এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যেন এটি বাস্তব জগতে অনুষ্ঠিত একটি ঘটনা ছিল। কিন্তু এ ব্যাখ্যাকে আমি সঠিক মনে করি না। কুরআন ও হাদীসে এটিকে একটি

বাস্তব ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর শুধু ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেই শেষ করে দেয়া হয়নি বরং এই সংগে একথাও বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন অনাদিকালের এ অংগীকারটিকে মানুষের বিরুদ্ধে একটি দলীল ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হবে। কাজেই একে নিছক একটি রূপক বর্ণনা গণ্য করার কোন কারণ আমি দেখি না। আমার মতে, বাস্তবে যেমন বিভিন্ন ঘটনা ঘটে থাকে ঠিক তেমনিভাবে এ ঘটনাটিও ঘটেছিল। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত যেসব মানুষকে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তাদের সবাইকে বাস্তবে একই সংগে জীবন, চেতনা ও বাকশক্তি দান করে নিজের সামনে হাযির করেছিলেন এবং বাস্তবে তাদেরকে এ সত্যটি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত করেছিলেন যে, তাঁর মহান, পবিত্র ও উন্নত সত্তা ছাড়া তাদের আর কোন রব ও ইলাহ নেই এবং তাঁর বন্দেগী ও হুকুমের আনুগত্য (ইসলাম) ছাড়া তাদের জন্য আর কোন সঠিক জীবন বিধান নেই। এ সম্মেলন অনুষ্ঠানকে কোন ব্যক্তি যদি অসম্ভব মনে করে থাকে তাহলে এটি নিছক তার চিন্তার পরিসরের সংকীর্ণতার ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যথায় বাস্তবে মানব সন্তানের বর্তমান পর্যায়ক্রমিক জন্ম ও বিকাশ যতটা সম্ভব সৃষ্টির আদিতে তার সামষ্টিক আবির্ভাব ও অন্তে তার সামষ্টিক পুনরুত্থান ও সমাবেশ ঠিক ততটাই সম্ভবপর। তাছাড়া মানুষের মত একটি সচেতন, বুদ্ধিমান ও স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টিকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্তির প্রাক্কালে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে প্রকৃত সত্য জানিয়ে দেয়া এবং তার কাছ থেকে নিজের পক্ষে বিশ্বস্ততার অংগীকার নিয়ে নেয়াটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হচ্ছে। এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটা মোটেই বিস্ময়কর নয়। বরং এ ধরনের একটি ঘটনা না ঘটলেই অবাক হতে হতো।

১৩৫. আদিকালে তথা সৃষ্টির সূচনা লগ্নে সমগ্র মানব জাতির কাছ থেকে যে অংগীকার নেয়া হয়েছিল এখানে তার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জাতির মধ্য থেকে যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করবে তারা যেন নিজেরাই নিজেদের এ অপরাধের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী হয়। নিজেদের সাফাই গাইবার জন্য না জানার ওজুহাত পেশ করার কোন সুযোগ যেন তাদের না থাকে এবং পূর্ববর্তী বংশধরদের ওপর নিজেদের গোমরাহীর সমস্ত দায়–দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হতেও না পারে। অন্য কথায় বলা যায়, প্রত্যেকটি মানুষ ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজের মধ্যে আল্লাহর একমাত্র ইলাহ ও একমাত্র রব হবার সাক্ষ ও স্বীকৃতি বহন করে চলেছে, আদিতম অংগীকারকে আল্লাহ প্রত্যেকটি মানুষের জন্য এরি প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছেন। এ জন্য কোন ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতা অথবা ভ্রান্ত পরিবেশে লালিত হবার কারণে তার গোমরাহীর জন্য মোটেই দায়ী নয়, একথা কোনক্রমেই বলা যেতে পারে না।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, সৃষ্টির প্রথম দিনের এ অংগীকার যদি বাস্তবে সংঘটিত হয়েও থাকে তাহলে তা কি আমাদের চেতনা ও স্মৃতিপটে সংরক্ষিত আছে? আমাদের মধ্য থেকে কোন একজনও কি একথা জানে, সৃষ্টির সূচনা লগ্নে তাকে আল্লাহর সামনে পেশ করা হয়েছিল, সেখানে তার সামনে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের রব নই?) প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং তার জবাবে সে বলেছিল بَلٰى (হাঁ)? জবাব যদি নেতিবাচক হয়ে থাকে, তাহলে যে অংগীকারের কথা আমাদের চেতনা ও স্মৃতিপট থেকে উধাও হয়ে গেছে তাকে কেমন করে আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে?

এর জবাবে বলা যায়, সেই অংগীকারের কথা যদি মানুষের চেতনা ও স্মৃতিপটে জাগরুক রাখা হতো, তাহলে মানুষকে দুনিয়ার বর্তমান পরীক্ষাগারে পাঠানোর ব্যাপারটা একেবারে অর্থহীন হয়ে যেতো। কারণ এরপর পরীক্ষার আর কোন অর্থই থাকতো না। তাই এ অংগীকারের কথা চেতনা ও স্মৃতিপটে জাগরুক রাখা হয়নি ঠিকই কিন্তু অবচেতন মনে (Sub-conscious mind) ও সুপ্ত অনভূতিতে (Intution) তাকে অবশ্যি সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। তার অবস্থা আমাদের অবচেতন ও অনুভূতি সঞ্জাত অন্যান্য জ্ঞানের মতই। সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনের সকল বিভাগে মানুষ আজ পর্যন্ত যা কিছুর উদ্ভব ঘটিয়েছে তা সবই আসলে মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে (Potentially) বিরাজিত ছিল। বাইরের কার্যকারণ ও ভিতরের উদ্যোগ আয়োজন ও চেষ্টা সাধনা মিলেমিশে কেবলমাত্র অব্যক্তকে ব্যক্ত করার কাজটুকুই সম্পাদন করেছে। এমন কোন জিনিস যা মানুষের মধ্যে অব্যক্তভাবে বিরজিত ছিল না, তাকে কোন শিক্ষা, অনুশীলন, পরিবেশের প্রভাব ও আভ্যন্তরীণ চেষ্টা–সাধনার বলে কোনক্রমেই তার মধ্যে সৃষ্টি করা সম্ভব নয় এটি একটি জাজ্বল্যমান সত্য। আর এ প্রভাব–প্রচেষ্টাসমূহ নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করলেও মানুষের মধ্যে যেসব জিনিস অব্যক্তভাবে বিরাজিত রয়েছে তাদের কোনটিকেও পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেবার ক্ষমতা রাখে না। বড় জোর তারা তাকে তার মূল স্বভাব প্রকৃতি থেকে বিকৃত (Pervert) করতে পারে মাত্র। তবুও সব রকমের বিকৃতি ও বিপথগামিতা সত্ত্বেও সেই জিনিসটি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে এবং বাইরের আবেদনে সাড়া দেয়ার জন্য সর্বক্ষণ উন্মুখ থাকবে। এ ব্যাপারটি যেমন আমি ইতিপূর্বে বলেছি, আমাদের সকল প্রকার অবচেতন ও প্রচ্ছন্ন অনুভূতি লব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সত্য ঃ

ঃ এগুলো সবই আমাদের মধ্য অব্যক্তভাবে রয়েছে। আমরা বাস্তবে যা কিছু ব্যক্ত করি এবং যেসব কাজ করি তার মাধ্যমেই এগুলোর অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি।

ঃ এগুলোর কার্যকর অভিব্যক্তির জন্য বাইরের আলোচনা (স্মরণ করিয়ে দেয়া), শিক্ষা, অনুশীলন ও কাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন হয়। আর আমাদের দ্বারা বাস্তবে যা কিছু সংঘটিত হয়, তা আসলে বাইরের সেই আবেদনেরই সাড়া বলে প্রতীয়মান হয় যা আমাদের মধ্যে সুপ্তভাবে বিরাজমান জিনিসসমূহের পক্ষ থেকে এসে থাকে।

ঃ ভিতরের ভ্রান্ত কামনা বাসনা ও বাইরের প্রতিকূল প্রভাব, প্রতিপত্তি ও কার্যক্রম এগুলোকে দাবিয়ে দিয়ে বিকৃত ও বিপথগামী করে এবং এগুলোর ওপর আবরণ ফেলে দিয়ে এগুলোকে নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে না। আর এ জন্যই ভিতরের চেতনা ও বাইরের প্রচেষ্টা–উভয়ের সহায়তায় সংস্কার, সংশোধন ও পরিবর্তন (Conversion) সম্ভবপর।

বিশ্ব জাহানে আমাদের যথার্থ মর্যাদা এবং বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টার সাথে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে আমরা যে সুপ্ত চেতনা লব্ধ জ্ঞানের অধিকারী তার অবস্থাও এ একই পর্যায়ভুক্ত ঃ এ জ্ঞান যে আবহমানকাল ধরেই বিরাজমান তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তা মানব জীবনের প্রতি যুগে পৃথিবীর সব এলাকায়, প্রতিটি জনপদে প্রত্যেকটি বংশে, প্রজন্মে

ও পরিবারে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং কখনো দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হয়নি।

ঃ ঐ জ্ঞান যে প্রকৃত সত্যের অনুরূপ, তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, যখনই তা আত্মপ্রকাশ করে আমাদের জীবনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে তখনই তা সুস্থ ও কল্যাণকর ফল প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে।

ঃ তার আত্মপ্রকাশ করার ও কার্যকর রূপলাভ করার জন্য সবসময় একটি বহিরাগত আবেদনের প্রয়োজন হয়েছে। তাই নবীগণ, আসমানী কিতাবসমূহ ও তাদের আনুগত্যকারী সত্যের আহবায়কদের সবাই এ দায়িত্বই পালন করে এসেছেন। এ জন্যই কুরআনে তাদেরকে মুযাক্‌কির (স্মারক) এবং তাদের কাজকে তায্‌কীর (স্মরণ করিয়ে দেয়া), যিক্‌র (স্মরণ) ও তায্‌কিরাহ (স্মৃতি) ইত্যাদি শব্দাবলীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, নবীগণ, কিতাবসমূহ ও সত্যের আহবায়কগণ মানুষের মধ্যে কোন নতুন জিনিস সৃষ্টি করেন না বরং তার মধ্যে আগে থেকেই যে জিনিসটির অস্তিত্ব বিরাজ করছিল তাকে জাগিয়ে তোলেন ও নতুন জীবনীশক্তি দান করেন মাত্র।

ঃ মানবাত্মার পক্ষ থেকে প্রতি যুগে এ স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়াসে ইতিবাচক সাড়া দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে যে প্রকৃতপক্ষে এমন এক জ্ঞান সুপ্ত ছিল, যা নিজের আহবানকারীর আওয়াজ চিনতে পেরে তার জবাব দেবার জন্য জেগে উঠেছে, এটি তার আর একটি প্রমাণ।

ঃ তারপর মূর্খতা, অজ্ঞতা, ইন্দ্রিয় লিপ্সা, স্বার্থপ্রীতি এবং মানুষ ও জিনের বংশদ্ভুত শয়তানদের বিভ্রান্তিকর শিক্ষা ও প্ররোচনা তাকে সবসময় দাবিয়ে রাখার, বিপথগামী ও বিকৃত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এর ফলে শিরক, আল্লাহ বিমুখতা, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং নৈতিক ও কর্ম ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার এ সমুদয় শক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সেই জ্ঞানের জন্মগত ছাপ মানুষের হৃদয়পটে কোন না কোন পর্যায়ে অক্ষুণ্ণ থেকেছে। এ জন্যই স্মরণ করিয়ে দেয়া ও নবায়নের প্রচেষ্টা তাকে জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে সফল ভূমিকা পালন করে এসেছে।

অবশ্যি দুনিয়ার বর্তমান জীবনে যারা পরম সত্য ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে বদ্ধপরিকর তারা নিজেদের তথাকথিত যুক্তিবাদের ভিত্তিতে জন্মগতভাবে হৃদয়ফলকে খোদিত এ লিপিটির অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে অথবা কমপক্ষে একে সন্দেহযুক্ত সাব্যস্ত করতে পারে। কিন্তু যেদিন হিসেব নিকেশ ও বিচারের আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন মহাশক্তিশালী স্রষ্টা তাদের চেতনা ও স্মৃতিপটে সৃষ্টির প্রথম দিনের সেই সম্মেলনটির স্মৃতি জাগিয়ে তুলবেন। সৃষ্টির প্রথম দিনে তারা একযোগে যে মহান স্রষ্টাকে তাদের একমাত্র রব ও মাবুদ বলে স্বীকার করে নিয়েছিল সেই স্মৃতি আবার পুরোদমে তরতাজা করে দেবেন। তারপর তিনি তাদের নিজেদের অভ্যন্তর থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে এ অংগীকারলিপি যে তাদের হৃদয়ে সবসময় খোদিত ছিল তা দেখিয়ে দেবেন। তাদের জীবনের সংরক্ষিত কার্যবিবরণী থেকে সর্বসমক্ষে এও দেখিয়ে দেবেন যে, তারা কিভাবে হৃদয়ফলকে খোদিত সে লিপিটি উপেক্ষা করেছে, কখন কোন্‌ সময় তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে এ লিপির সত্যতার স্বীকৃতি স্বগতভাবে উচ্চারিত হয়েছে, নিজের ও নিজের

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْۤ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗۤ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٧٦﴾ سَآءَ مَثَلَاۨ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٧٧﴾ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٧٨﴾

আর হে মুহাম্মাদ! এদের সামনে সেই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করো যাকে আমি দান করেছিলাম আমার আয়াতের জ্ঞান।[১৩৮] কিন্তু সে তা যথাযথভাবে মেনে চলা থেকে দূরে সরে যায়। অবশেষে শয়তান তার পিছনে লাগে। শেষ পর্যন্ত সে বিপথগামীদের অন্তরভুক্ত হয়েই যায়। আমি চাইলে ঐ আয়াতগুলোর সাহায্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম কিন্তু সে তো দুনিয়ার প্রতিই ঝুঁকে রইল এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। কাজেই তার অবস্থা হয়ে গেল কুকুরের মত, তার ওপর আক্রমণ করলেও সে জিভ্ ঝুলিয়ে রাখে আর আক্রমণ না করলেও জিভ ঝুলিয়ে রাখে।[১৩৯] যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তাদের দৃষ্টান্ত এটাই।

তুমি এ কাহিনী তাদেরকে শুনাতে থাকো, হয়তো তারা কিছু চিন্তা–ভাবনা করবে। যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছে তাদের দৃষ্টান্ত বড়ই খারাপ এবং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম চালিয়ে গেছে। আল্লাহ যাকে সুপথ দেখান সে–ই সঠিক পথ পেয়ে যায় এবং যাকে আল্লাহ নিজের পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করেন সে–ই ব্যর্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

চারপাশের ভ্রষ্টতার ওপর তাদের বিবেক কোথায় কখন অসম্মতি ও বিদ্রোহের আওয়াজ বুলন্দ করেছে, সত্যের আহবায়কদের আহবানের জবাব দেবার জন্য তাদের অভ্যন্তরের লুকানো জ্ঞান কতবার কত জায়গায় আত্মপ্রকাশে উন্মুখ হয়েছে এবং তারা নিজেদের স্বার্থপ্রীতি ও প্রবৃত্তির লালসার বশবর্তী হয়ে কোন্ ধরনের তাট বাহানার মাধ্যমে তাকে ক্রমাগত প্রতারিত ও স্তব্ধ করে দিয়েছে। সেদিন যখন এসব গোপন কথা প্রকাশ হয়ে

পড়বে তখন যুক্তি-তর্ক করার অবকাশ থাকবে না বরং পরিষ্কারভাবে অপরাধ স্বীকার করে নিতে হবে। তাই কুরআন মজীদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ সেদিন অপরাধীরা একথা বলবে না, আমরা মূর্খ ছিলাম, অজ্ঞ ছিলাম, আমরা গাফেল ছিলাম বরং তারা একথা বলতে বাধ্য হবে, আমরা কাফের ছিলাম, অর্থাৎ আমরা জেনে বুঝে সত্যকে অস্বীকার করেছিলাম।

وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ

"আর তারা নিজেদের ব্যাপারেই সাক্ষ দেবে, তারা কাফের তথা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানকারী ছিল।" (আন'আম ঃ ১৩০)

১৩৬. অর্থাৎ সত্যকে উপলব্ধি করার ও চিনে নেবার যেসব উপকরণ ও নিদর্শন মানুষের নিজের মধ্যে রয়েছে সেগুলো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরি।

১৩৭. অর্থাৎ বিদ্রোহ ও বিকৃতি-বিভ্রান্তির নীতি পরিত্যাগ করে বন্দেগী ও আল্লাহর আনুগত্যের আচরণের দিকে যেন ফিরে আসে।

১৩৮. এ বাক্যটিতে কোন এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উৎকৃষ্টতম নৈতিক মানও এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা যখনই কারোর কোন দুষ্কৃতির উদাহরণ দেন তখন সাধারণত তার নাম উল্লেখ করেন না। বরং তার ব্যক্তিত্বকে উহ্য রেখে শুধুমাত্র তার দোষটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন। এভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবমাননা ও লাঞ্ছনা ছাড়াই আসল উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায়। তাই যে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা হয়েছে কুরআন ও হাদীসের কোথাও তার পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। মুফাস্সিরগণ রসূলের যুগের এবং তাঁর পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে এ দৃষ্টান্তের লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করেছেন। কেউ বাল'আম ইবনে বাউরার নাম নিয়েছেন। কেউ নিয়েছেন উমাইয়া ইবনে আবীস সালতের নাম। আবার কেউ বলেছেন, এ ব্যক্তি ছিল সাইফী ইবনুর রাহেব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদাহরণ হিসেবে যে বিশেষ ব্যক্তির ভূমিকা এখানে পেশ করা হয়েছে সে তো পর্দান্তরালেই রয়ে গেছে। তবে যে ব্যক্তিই এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে তার ব্যাপারে এ উদাহরণটি প্রযোজ্য হবেই।

১৩৯. এ দু'টি সংক্ষিপ্ত বাক্যে অতন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এখানে যে ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করা হয়েছে সে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানের অধিকারী ছিল। অর্থাৎ প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত ছিল। এ ধরনের জ্ঞানের অধিকারী হবার কারণে যে কর্মনীতিকে সে ভুল বলে জানতো তা থেকে দূরে থাকা এবং যে কর্মনীতিকে সঠিক মনে করতো তাকে অবলম্বন করাই তার উচিত ছিল। এ যথার্থ জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করলে আল্লাহ তাকে মানবতার উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করতেন। কিন্তু সে দুনিয়ার স্বার্থ, স্বাদ ও আরাম আয়েশের দিকে ঝুঁকে পড়ে। প্রবৃত্তির লালসার মোকাবিলা করার পরিবর্তে সে তার সামনে নতজানু হয়। উচ্চতর বিষয়সমূহ লাভের জন্য সে পার্থিব লোভ-লালসার উর্ধে ওঠার পরিবর্তে তার মধ্যে এমনভাবে ডুবে যায় যার ফলে নিজের সমস্ত উচ্চতর আশা-আকাংখা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক উন্নতির সমস্ত সম্ভাবনা পরিত্যাগ করে বসে। তার নিজের জ্ঞান যেসব সীমানা

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ
قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ
آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾
وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾

আর এটি একটি অকাট্য সত্য যে, বহু জিন ও মানুষ এমন আছে যাদেরকে আমি জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি।[১৪০] তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা পশুর মত বরং তাদের চাইতেও অধম। তারা চরম গাফলতির মধ্যে হারিয়ে গেছে।

ভাল নামগুলো[১৪১] আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। সুতরাং ভাল নামেই তাঁকে ডাকো এবং তাঁর নাম রাখার ব্যাপারে যারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাদেরকে বর্জন কর। তারা যা কিছু করে এসেছে। তার ফল অবশ্যি পাবে।[১৪২] আমার সৃষ্টির মধ্যে একটি দল এমনও আছে যে, যথার্থ সত্য অনুযায়ী পথনির্দেশ দেয় এবং সত্য অনুযায়ী বিচার করে।

রক্ষণাবেক্ষণের দাবী জানিয়ে আসছিল সেগুলো লংঘন করে এগিয়ে চলতে থাকে। তারপর যখন সে নিছক নিজের নৈতিক দুর্বলতার কারণে জেনে বুঝে সত্যকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চললো। তখন তার নিকটেই ওঁৎ পেতে থাকা শয়তান তার পেছনে লেগে যায় এবং অনবরত তাকে এক অধপতন থেকে আর এক অধপতনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে এ জালেম শয়তান তাকে এমন সব লোকের দলে ভিড়িয়ে দেয় যারা তার ফাঁদে পা দিয়ে বুদ্ধি বিবেক সব কিছু হারিয়ে বসেছিল।

এরপর আল্লাহ এ ব্যক্তির অবস্থাকে এমন একটি কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন যার জিভ সবসময় ঝুলে থাকে এবং এ ঝুলন্ত জিভ থেকে অনবরত লালা টপকে পড়তে থাকে। এহেন অবস্থা তার উদগ্র লালসার আগুন ও অতৃপ্ত কামনার কথা প্রকাশ করে। যে কারণে আমাদের ভাষায় আমরা এহেন পার্থিব লালসায় অন্ধ ব্যক্তিকে দুনিয়ার কুকুর বলে থাকি। ঠিক সেই একই কারণে এ বিষয়টিকে এখানে উপমার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

কুকুরের স্বভাব কি? লোভ ও লালসা। চলাফেরার পথে তার নাক সব সময় মাটি শুঁকতে থাকে, হয়তো কোথাও কোন খাবারের গন্ধ পাওয়া যাবে এ আশায়। তার গায়ে কেউ কোন পাথর ছুঁড়ে মারলেও তার ভুল ভাংবে না। বরং তার মনে সন্দেহ জাগবে, যে জিনিসটি দিয়ে তাকে মারা হয়েছে সেটি হয়তো কোন হাড় বা রুটির টুকরো হবে। পেট পূজারি লোভী কুকুর একবার লাফিয়ে দৌড়ে গিয়ে সেই নিক্ষিপ্ত পাথরটিও কামড়ে ধরে। পথিক তার দিকে কোন দৃষ্টি না দিলেও দেখা যাবে সে লোভ–লালসার প্রতিমূর্তি হয়ে বিরাট আশায় বুক বেঁধে জিভ্ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। সে তার পেটের দৃষ্টি দিয়ে সারা দুনিয়াকে দেখে। কোথাও যদি কোন বড় লাশ পড়ে থাকে, কয়েকটি কুকুরের পেট ভরার জন্য সেটি যথেষ্ট হলেও একটি কুকুর তার মধ্য থেকে কেবলমাত্র তার নিজের অংশটি নিয়েই ক্ষান্ত হবে না বরং সেই সম্পূর্ণ লাশটিকে নিজের একার জন্য আগলে রাখার চেষ্টা করবে এবং অন্য কাউকে তার ধারে কাছেও ঘেঁসতে দেবে না। এ পেটের লালসার পর যদি দ্বিতীয় কোন বস্তু তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে যৌন লালসা। সারা শরীরের মধ্যে কেবলমাত্র লজ্জাস্থানটিই তার কাছে আকর্ষণীয় এবং সেটিরই সে ঘ্রাণ নিতে ও তাকেই চাটতে থাকে। কাজেই এখানে এ উপমা দেবার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথাটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা যে, দুনিয়া পূজারী ব্যক্তি যখন জ্ঞান ও ঈমানের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে প্রবৃত্তির অন্ধ লালসার কাছে আত্মসমর্পন করে এগিয়ে চলতে থাকে তখন তার অবস্থা পেট ও যৌনাংগ সর্বস্ব কুকুরের মত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

১৪০. এর অর্থ এটা নয় যে, আমি তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্যই সৃষ্টি করেছিলাম এবং তাদেরকে সৃষ্টি করার সময় এ সংকল্প করেছিলাম যে, তাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করবো। বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, আমি তো তাদেরকে হৃদয়, মস্তিষ্ক, কান, চোখ সবকিছুসহ সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু এ বেকুফরা এগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করেনি এবং নিজেদের অসৎ কাজের বদৌলতে শেষ পর্যন্ত তারা জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হয়েছে। চরম দুঃখ প্রকাশ ও আক্ষেপ করার জন্য মানুষের ভাষায় যে ধরনের বাকরীতির প্রচলন রয়েছে এখানেও এ বিষয়বস্তুটি প্রকাশ করার জন্য সেই একই ধরনের বাকরীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন মায়ের কয়েক জন জোয়ান ছেলে যুদ্ধে মারা গেলে সে লোকদের বলতে থাকে, আমি তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে জীবন দান করার জন্যই বুঝি খাইয়ে পরিয়ে বড় করেছিলাম। এ বাক্যে মায়ের বক্তব্যের উদ্দেশ্য এ নয় যে, সত্যই সে তার সন্তানদেরকে এ উদ্দেশ্যে লালন পালন করেছিল বরং এ ধরনের আক্ষেপের সুরে সে আসলে বলতে চায়, আমি নিজের সন্তানদেরকে বড়ই পরিশ্রম করে নিজের শরীরের রক্ত পানি করে বড় করে তুলেছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী যুদ্ধবাজদেরকে শাস্তি দিন। কারণ তাদের জন্যই আমার পরিশ্রম ও ত্যাগের ফসল এভাবে মাটি হয়ে গেলো।

১৪১. এখন ভাষণ শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। তাই উপসংহারে উপদেশ ও তিরস্কার মিশ্রিত পদ্ধতিতে লোকদেরকে তাদের কয়েকটি প্রধান প্রধান গোমরাহীর ব্যাপারে সতর্ক

করে দেয়া হচ্ছে। এই সংগে নবীর দাওয়াতের মোকাবিলায় তারা যে অস্বীকার, প্রত্যাখ্যান ও বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করেছিল তার ভুল বুঝিয়ে দিয়ে তার অশুভ পরিণাম সম্পর্কেও তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে।

১৪২. মানুষের মনে বিভিন্ন জিনিসের যে ধারণা থাকে এবং বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে মানুষ যেসব কল্পনা করে থাকে তারই ভিত্তিতে নিজের ভাষায় সে তাদের নাম রাখে। ধারণা ও কল্পনায় গলদ থাকলে তা নামের মধ্যেও ফুটে ওঠে। আবার নামের ভ্রান্তি ধারণা ও কল্পনার ভ্রান্তির কথাই প্রকাশ করে। তারপর বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে মানুষের মনে যে ধারণা থাকে তারই ভিত্তিতে তার সাথে তার সম্পর্কও গড়ে ওঠে এবং সেই হিসেবে তার সাথে সে ব্যবহারও করে। ধারণা ও কল্পনার ত্রুটি সম্পর্ক ও ব্যবহারের ত্রুটির আকারে আত্মপ্রকাশ করে। আবার ধারণা ও কল্পনা নির্ভুল হলে পারস্পরিক সম্পর্কও নির্ভুল ও সঠিক রূপ নেয়। একথা দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত জিনিসের ব্যাপারে যেমন সত্য তেমনি আল্লাহর ব্যাপারেও সত্য। মানুষ আল্লাহর নাম (তাঁর সত্তা সম্পর্কিত হোক বা গুণবাচক নাম হোক) স্থির করার ব্যাপারে যে ভুল করে থাকে তা হয় আসলে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত তার আকীদা বিশ্বাসের ফলশ্রুতি। তারপর আল্লাহ সম্পর্কে নিজের ধারণা ও আকীদার মধ্যে মানুষ যতটুকু ও যে ধরনের ভুল করে ঠিক ততটুকু ও সেই ধরনের ভুল তার নিজের জীবনের সমগ্র নৈতিক দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি গড়ে তোলার ব্যাপারেও সংঘটিত হয়ে যায়। কারণ মানুষ আল্লাহর ব্যাপারে এবং আল্লাহর সাথে নিজের ও বিশ্ব-জাহানের সম্পর্কের ব্যাপারে যে ধারণা গড়ে তোলে পুরোপুরি তারই ভিত্তিতে তার নৈতিক দৃষ্টিভংগী গড়ে ওঠে। তাই বলা হয়েছে, আল্লাহর নাম রাখার ব্যাপারে ভুল করা থেকে দূরে থাকো। ভাল নামই আল্লাহর উপযোগী এবং তার সাহায্যেই তাঁকে স্মরণ করা উচিত। তার নাম ঠিক করার ব্যাপারে 'ইলহাদ' তথা বিদ্রোহাত্মক দৃষ্টিভংগী মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে।

"ভাল ভাল নাম" বলতে এমন সব নাম বুঝায় যার মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব, তাঁর পাক-পবিত্রতা ও তাঁর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর প্রকাশ ঘটে। কুরআনে উল্লেখিত 'ইলহাদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে, মধ্যবর্তী স্থান থেকে সরে যাওয়া এবং সোজা সরল দিক থেকে বিপথগামী হয়ে যাওয়া। তীর যখন সোজা নিশানায় না লেগে অন্য কোন দিকে লাগে তখন আরবীতে বলা হয় الحد السهم الهدف অর্থাৎ তীর নিশানা থেকে ইলহাদ করেছে। অর্থাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। আল্লাহর নাম রাখার ব্যাপারে 'ইলহাদ' হচ্ছে এই যে, আল্লাহর এমনভাবে নামকরণ করা, যাতে তাঁর মর্যাদাহানি হয়, যা তাঁর আদবের পরিপন্থী হয়। যার মাধ্যমে তাঁর প্রতি দোষ-ত্রুটি আরোপ করা হয় অথবা যার সাহায্যে তাঁর উন্নত ও পবিত্র সত্তা সম্পর্কে কোন প্রকার ভুল আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে থাকে। যে নাম একমাত্র আল্লাহর উপযোগী সৃষ্টি জগতের কাউকে সে নামে ডাকাও ইলহাদের অন্তরভুক্ত। তারপর কুরআনের আয়াতে যে বলা হয়েছে "আল্লাহর নাম রাখার ব্যাপারে যারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় (ইলহাদ করে) তাদেরকে বর্জন কর। এর অর্থ হচ্ছে, সোজাভাবে বুঝাবার পর যদি তারা না বোঝে তাহলে তাদের সাথে অনর্থক বিতর্কে জড়িত হবার তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই। নিজেদের গোমরাহীর ফল তারা নিজেরাই ভুগবে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۲﴾ وَاُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿۱۸۳﴾ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۸۴﴾ اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّاَنْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۸۵﴾ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ؕ وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۱۸۶﴾

২৩ রুকূ'

আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদেরকে আমি এমন পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো যে, তারা জানতেও পারবে না। আমি তাদেরকে ঢিল দিচ্ছি। আমার কৌশল অব্যর্থ।

তারা কি কখনো চিন্তা করে না, তাদের সাথীর ওপর উন্মাদনার কোন প্রভাব নেই? সে তো একজন সতর্ককারী মাত্র, (অশুভ পরিণতির উদ্ভব হবার আগেই) সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিচ্ছে। তারা কি কখনো আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা করেনি এবং আল্লাহর সৃষ্ট কোন জিনিসের দিকে চোখ মেলে তাকায়নি?১৪৩ আর তারা কি এটাও ভেবে দেখেনি যে, সম্ভবত তাদের জীবনের অবকাশকাল পূর্ণ হবার সময় ঘনিয়ে এসেছে?১৪৪ তাহলে নবীর এ সতর্কীকরণের পর আর এমন কি কথা থাকতে পারে যার প্রতি তারা ঈমান আনবে? আল্লাহ যাকে পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করেন তার জন্য আর কোন পথ নির্দেশক নেই। আর আল্লাহ তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দেন।

১৪৩. সাথী বলতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। তিনি তাদের মধ্যেই জন্মলাভ করেন। তাদের মধ্যে বসবাস করেন। শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে পদার্পণ করেন। নবুওয়াত লাভের পূর্বে সমগ্র জাতি তাঁকে একজন অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট-ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাব প্রকৃতি ও সুস্থ মন-মগজধারী মানুষ বলে জানতো। নবুওয়াত লাভের পর যে-ই তিনি মানুষের কাছে আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছাতে শুরু করলেন, অমনি তাঁকে পাগল বলা আরম্ভ হয়ে গেল। একথা সুস্পষ্ট, নবী হবার আগে

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ۖ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلَّا هُوَ ۘ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٧﴾ قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۛ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٨﴾

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামত কবে ও কখন হবে? বলে দাও, "এক মাত্র আমার রবই এর জ্ঞান রাখেন। সঠিক সময়ে তিনিই তা প্রকাশ করবেন। আকাশ ও পৃথিবীতে তা হবে ভয়ংকর কঠিন সময়। সহসাই তা তোমাদের ওপর এসে পড়বে।" তারা তোমার কাছে এ ব্যাপারে এমনভাবে জিজ্ঞেস করছে যেন তুমি তার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছ? বলে দাও, "একমাত্র আল্লাহই এর জ্ঞান রাখেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্যটি জানে না।"

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, "নিজের জন্য লাভ–ক্ষতির কোন ইখতিয়ার আমার নেই। একমাত্র আল্লাহই যা কিছু চান তাই হয়। আর যদি আমি গায়েবের খবর জানতাম, তাহলে নিজের জন্য অনেক ফায়দা হাসিল করতে পারতাম এবং কখনো আমার কোন ক্ষতি হতো না।[১৪৫] আমি তো যারা আমার কথা মেনে নেয় তাদের জন্য নিছক একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা মাত্র।"

তিনি যেসব কথা বলতেন সেগুলোর জন্য তাঁকে পাগল বলা হয়নি বরং নবী হবার পর তিনি যেসব কথা প্রচার করতে থাকেন সেগুলোর জন্য তাঁকে পাগল বলা হতে থাকে। তাই এখানে বলা হচ্ছে, তারা কি কখনো ভেবে দেখেছে, যে কথাগুলো তিনি বলছেন তার মধ্যে কোন্‌টি পাগলামির কথা? কোন্ কথাটি অর্থহীন, ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক? যদি তারা আসমান ও যমীনের ব্যবস্থাপনা নিয়ে চিন্তা করতো অথবা আল্লাহর তৈরী যে কোন একটি জিনিসকে গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতো তাহলে তারা নিজেরাই বুঝতে পারতো যে, শিরকের মতবাদ খণ্ডন, তাওহীদের প্রমাণ, রবের বন্দেগীর দাওয়াত এবং মানুষের দায়িত্ব পালন ও জবাবদিহি সম্পর্কে তাদের ভাই তাদেরকে যা কিছু বুঝাচ্ছেন এই সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা ও আল্লাহর সৃষ্টিলোকের প্রতিটি অনুকণিকা তারই সত্যতার সাক্ষ দিয়ে যাচ্ছে।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۚ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾

২৪ রুকূ'

আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র প্রাণ থেকে এবং তারই প্রজাতি থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যাতে তার কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। তারপর যখন পুরুষ নারীকে ঢেকে ফেলে তখন সে হালকা গর্ভধারণ করে। তাকে বহন করে সে চলাফেরা করে। গর্ভ যখন ভারি হয়ে যায় তখন তারা দু'জনে মিলে এক সাথে তাদের রব আল্লাহর কাছে দোয়া করে ঃ যদি তুমি আমাদের একটি ভাল সন্তান দাও তাহলে আমরা তোমার শোকরগুজারী করবো। কিন্তু যখন আল্লাহ তাদেরকে একটি সুস্থ-নিখুঁত সন্তান দান করেন, তখন তারা তাঁর এ দান ও অনুগ্রহে অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করতে থাকে। তারা যেসব মুশরিকী কথাবার্তা বলে আল্লাহ তার অনেক উর্ধে।[১৪৬] কি ধরনের নির্বোধ লোক এরা! আল্লাহর শরীক গণ্য করে তাদেরকে, যারা কোন জিনিস সৃষ্টি করেনি বরং নিজেরাই সৃষ্ট।

১৪৪. অর্থাৎ এ নির্বোধরা এতটুকুও চিন্তা করে না যে, মৃত্যুর সময় কারোর জানা নেই। কেউ জানে না কার মৃত্যু কখন এসে পড়বে। তারপর যখন কারোর মৃত্যুর সময় এসে যাবে এবং তার কর্মনীতির সংশোধন করার জন্য ইহকালীন জীবনকালের যে অবকাশটুকু সে পেয়েছিল তাকে যদি সে তখন গোমরাহী ও অসৎকাজে নষ্ট করে দিয়ে থাকে তাহলে তার পরিণাম কি হবে?

১৪৫. এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামতের সঠিক তারিখ একমাত্র সে-ই বলতে পারে, যে গায়েবের জ্ঞান রাখে, আর আমার অবস্থা এমন যে, আমি আগামীকাল আমার ও আমার পরিবারবর্গের কি অবস্থা হবে তাও বলতে পারি না। তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারো, যদি আমি এ জ্ঞানের অধিকারী হতাম তাহলে পূর্বাহ্নে অবগত হয়ে বহু ক্ষতির হাত থেকে আমি বেঁচে যেতাম এবং নিছক আগেভাগে জানতে পারার কারণে নিজের বহু স্বার্থোদ্ধার করা আমার পক্ষে সহজতর হতো। এ অবস্থা দেখার ও জানার পরও তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছো—কিয়ামত কবে হবে? এটা তোমাদের কত বড় অজ্ঞতার পরিচায়ক।

১৪৬. এখানে মুশরিকদের জাহেলিয়াত প্রসূত গোমরাহীর সমালোচনা করা হয়েছে। এ ভাষণটির মূল বক্তব্য হচ্ছে, মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহই সর্বপ্রথম মানব জাতিকে সৃষ্টি করেন। মুশরিকরাও একথা অস্বীকার করে না। তারপর পরবর্তী কালের প্রত্যেকটি মানুষকেও তিনিই অস্তিত্ব দান করেন। আর একথাটিও মুশরিকরা জানে। নারী গর্ভে শুক্রকে সংরক্ষণ, তারপর এ সামান্য হালকা গর্ভটি লালন করে তাকে একটি জীবন্ত মানব শিশুতে পরিণত করা, এরপর সেই শিশুটির মধ্যে বিভিন্ন ধরনে শক্তি ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে তাকে একটি সুস্থ ও পরিপূর্ণ অবয়বের অধিকারী মানুষ হিসেবে দুনিয়ার বুকে ভূমিষ্ঠ করা—এসব কিছু আল্লাহর ইচ্ছাধীন। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি নারীর গর্ভে সাপ, বাঁদর বা অন্য কোন অদ্ভুত দেহাবয়ব বিশিষ্ট জীব সৃষ্টি করে দেন অথবা মায়ের গর্ভেই শিশুকে অন্ধ, বধির, বোবা, খঞ্জ করে দেন বা তার শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক শক্তির মধ্যে কোন ত্রুটি জন্মিয়ে দেন, তাহলে আল্লাহর গড়া এ আকৃতিকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারোর নেই। একক আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসীদের ন্যায় মুশরিকরাও এ সত্যটি সম্পর্কে সমানভাবে অবগত। তাই দেখা যায়, গর্ভাবস্থায় সুস্থ, সবল ও নিখুঁত অবয়বধারী শিশু ভূমিষ্ঠ হবার ব্যাপারে আল্লাহর ওপরই পূর্ণ ভরসা করা হয়। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হয়ে যদি চাঁদের মত ফুটফুটে সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলেও জাহেলী কর্মকাণ্ড নবতর রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন দেবী, অবতার, অলী ও পীরের নামে নজরানা ও শিন্নী নিবেদন করা হয় এবং শিশুকে এমন সব নামে অভিহিত করা হয় যেন মনে হয় সে আল্লাহর নয়, বরং অন্য কারোর অনুগ্রহের ফল। যেমন তার নামকরণ করা হয় হোসাইন বখ্‌শ (হোসাইনের দান), পীর বখশ্‌ (পীরের দান), আবদুর রসূল (রসূলের গোলাম), আবদুল উয্‌যা (উয্‌যা দেবতার দাস), আবদে শামস (সূর্য দাস) ইত্যাদি ইত্যাদি।

সূরার এ অংশটি অনুধাবন করার ব্যাপারে আরো একটি বড় ধরনের ভুল হয়ে থাকে। বিভিন্ন দুর্বল হাদীসের বর্ণনা এ ভুলের ভিত্তিকে আরো শক্তিশালী করে দিয়েছে। শুরুতে একটি মাত্র প্রাণ থেকে মানব জাতির জন্মের সূচনা হবার কথা বলা হয়েছে। এ প্রথম মানব প্রাণটি হচ্ছে হযরত আদম আলাইহিস সালাম। তারপর তার সাথে সাথেই একটি পুরুষ ও একটি নারীর কথা বলা হয়েছে। তারা প্রথমে সুস্থ ও পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন শিশুর জন্মের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে। তারপর যখন শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তখন তারা আল্লাহর দানের সাথে অন্যদেরকেও শরীক করে নেয়। এ বর্ণনাভংগীর কারণে একদল লোক মনে করে নিয়েছে যে, আল্লাহর সাথে শরীককারী এ স্বামী-স্ত্রী নিশ্চয়ই হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামই হবেন। মজার ব্যাপার এই যে, এ ভুল ধারণার সাথে আবার কিছু দুর্বল হাদীসের মিশ্রণ ঘটিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প রচনা করা হয়েছে। গল্পটি এ রকম যে, হযরত হাওয়ার ছেলে মেয়ে পয়দা হবার পর মরে যেতো। অবশেষে এক সন্তান জন্মের পর শয়তানের প্ররোচনায় তিনি তার নাম আবদুল হারেস (শয়তানের বান্দা) রাখতে উদ্বুদ্ধ হন। সবচেয়ে মারাত্মক ও সর্বনাশা ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ হাদীসগুলোর মধ্য থেকে কোন কোনটির সনদ খোদ্‌ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্তও পৌছিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মূলত এ জাতীয় সমস্ত হাদীসই ভুল। কুরআনের বক্তব্যও এর সমর্থন করে না। কুরআন কেবল এতটুকুই বলছে ঃ মানব জাতির যে প্রথম দম্পতির মাধ্যমে পৃথিবীতে মানব বংশের সূচনা হয়েছিল তার স্রষ্টাও ছিলেন আল্লাহ, অন্য কেউ নয়। তাই সৃষ্টিকর্মে কেউ তার সাহায্যকারী ছিল না। তারপর প্রত্যেকটি পুরুষ ও

নারীর মিলনে যে শিশু জন্ম নেয় তার স্রষ্টাও সেই একই আল্লাহ যার সাথে কৃত অঙ্গীকারের ছাপ তোমাদের সবার হৃদয়ে সংরক্ষিত আছে। তাই এ অংগীকারের কারণে তোমরা আশা–নিরাশার দোলায় আন্দোলিত হয়ে যখন দোয়া করো তখন সেই আল্লাহর কাছেই দোয়া করে থাকো। কিন্তু পরে আশা পূর্ণ হয়ে গেলে তোমাদের মাথায় আবার শিরকের উদ্ভব হয়। এ আয়াতে কোন বিশেষ পুরুষ ও বিশেষ নারীর কথা বলা হয়নি বরং মুশরিকদের প্রত্যেকটি পুরুষ ও নারীর অবস্থা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও প্রণিধানযোগ্য। এসব আয়াতে আল্লাহ যাদের নিন্দাবাদ করেছেন তারা ছিল আরবের মুশরিক সম্প্রদায়। তাদের অপরাধ ছিল, তারা সুস্থ, সবল ও পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন সন্তান জন্মের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতো কিন্তু সন্তানের জন্মের পর আল্লাহর এ দানে অন্যদেরকে অংশীদার করতো। নিসন্দেহে তাদের এ অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু বর্তমানে তাওহীদের দাবীদারদের মধ্যে আমরা যে শিরকের চেহারা দেখছি তা তার চাইতেও খারাপ। এ তাওহীদের তাথাকথিত দাবীদাররা সন্তানও চায় আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে। গর্ভ সঞ্চারের পর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের নামে মানত মানে এবং সন্তান জন্মের পর তাদেরই আস্তানায় যেয়ে নজরানা নিবেদন করে। এরপরও জাহেলী যুগের আরবরাই কেবল মুশরিক, আর এরা নাকি পাক্কা তাওহীদবাদী। তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত ছিল আর এদের জন্য রয়েছে নাজাতের গ্যারান্টি, তাদের গোমরাহীর কঠোর সমালোচনা ও নিন্দা করা হয় কিন্তু এদের গোমরাহীর সমালোচনা করলে ধর্মীয় নেতাদের দরবারে বিরাট অস্থিরতা দেখা দেয়। কবি আলতাফ হোসাইন হালী তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "মুসাদ্দাস"–এ এ অবস্থারই চিত্র এঁকেছেন ঃ

کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ جا جا کے نذریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

"অন্যে করে মূর্তি পূজা
সে হয় কাফের সন্দেহ নেই
অন্যে বানায় খোদার পুত্র
সে হয় কাফের সন্দেহ নেই
অগ্নিতে যে নোয়ায় মাথা
সে হয় কাফের সন্দেহ নেই
তারার শক্তি মানলে তুমি
কাফের হবে সন্দেহ নেই,
কিন্তু মুমিন তারা তাই প্রশস্ত এসব পথই তাদের জন্য
করুক পূজা ইচ্ছা যাকে অনেক খোদার ভিন্ন ভিন্ন।

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ
إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ
صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ
فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ
يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ
بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ
فَلَا تُنظِرُونِ ﴿١٩٥﴾

যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং নিজেরাও নিজেদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না। যদি তোমরা তাদেরকে সত্য–সরল পথে আসার দাওয়াত দাও তাহলে তারা তোমাদের পেছনে আসবে না, তোমরা তাদেরকে ডাকো বা চুপ করে থাকো উভয় অবস্থায়ই ফল তোমাদের জন্য সমানই থাকবে।[১৪৭] তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকো তারা তো তোমাদের মতই বান্দা। তাদের কাছে দোয়া চেয়ে দেখো, তাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে তারা তোমাদের দোয়ায় সাড়া দিক। তাদের কি পা আছে, যা দিয়ে তারা চলতে পারে? তাদের কি হাত আছে, যা দিয়ে তারা ধরতে পারে? তাদের কি চোখ আছে, যার সাহায্যে তারা দেখতে পারে? তাদের কি কান আছে, যা দিয়ে তারা শুনতে পারে?[১৪৮] হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, "তোমাদের বানানো শরীকদেরকে ডেকে নাও তারপর তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো এবং আমাকে একদম অবকাশ দিয়ো না।

নবীকে বসাও যদি আল্লাহর আসনে
ইমামকে বসাও যদি নবীজির সামনে
পীরের মাজারে চাও সিন্নী চড়াও
শহীদের কবরে গিয়ে দোয়া যদি চাও
তবুও তাওহীদের গায়ে লাগে না আঁচড়
ঈমান অটুট থাকে ইসলাম অনড়।"

إِنَّ وَلِـۧيَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖۗ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩٦﴾ وَالَّذِيْنَ
تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٧﴾
وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ؕ وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ
لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٩٨﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾
وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٠٠﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ
مُّبْصِرُوْنَ ﴿٢٠١﴾ وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾

আমার সহায় ও সাহায্যকারী সেই আল্লাহ যিনি কিতাব নাযিল করেছেন এবং তিনি সৎ–লোকদের সহায়তা দান করে থাকেন।[১৪৯] *অন্যদিকে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডেকে থাকো তারা তোমাদেরও সাহায্য করতে পারে না এবং নিজেরাও নিজেদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না। বরং তোমরা যদি তাদেরকে সত্য–সঠিক পথে আসতে বলো তাহলে তারা তোমাদের কথা শুনতেও পাবে না। বাহ্যত তোমরা দেখছো, তারা তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু আসলে তারা কিছুই দেখছে না।"*

হে নবী! কোমলতা ও ক্ষমার পথ অবলম্বন করো। সৎকাজের উপদেশ দিতে থাকো এবং মূর্খদের সাথে বিতর্কে জড়িও না। যদি কখনো শয়তান তোমাকে উত্তেজিত করে তাহলে আল্লাহর আশ্রয় চাও। তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন! প্রকৃতপক্ষে যারা মুত্তাকী, তাদেরকে যদি কখনো শয়তানের প্রভাবে অসৎচিন্তা স্পর্শও করে যায় তাহলে তারা তখনই সতর্ক হয়ে ওঠে, তারপর তারা নিজেদের সঠিক কর্মপদ্ধতি পরিষ্কার দেখতে পায়। আর তাদের অর্থাৎ (শয়তানদের) ভাই–বন্ধুরা তো তাদেরকে তাদের বাঁকা পথেই টেনে নিয়ে যেতে থাকে এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে তারা কোন ত্রুটি করে না।[১৫০]

১৪৭. অর্থাৎ মুশরিকদের বাতিল মাবুদদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের পক্ষে কাউকে সঠিক পথ দেখানো এবং নিজেদের অনুগামী ও পূজারীদেরকে পথের সন্ধান দেয়া তো দূরের কথা, তারা তো কোন পথপ্রদর্শকের অনুসরণ করারও যোগ্যতা রাখে না। এমন কি কোন আহবানকারীর আহবানের জবাব দেবার ক্ষমতাও তাদের নেই।

১৪৮. এখানে একটি কথা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে হবে। শিরূক আশ্রিত ধর্মগুলোয়

তিনটি জিনিস আলাদা আলাদা পাওয়া যায়, এক, যেসব মূর্তি, ছবি বা নিদর্শনকে পূজা করা হয় এবং যেগুলোকে কেন্দ্র করে সমগ্র পূজা কর্মটি অনুষ্ঠিত হয়। দুই, যেসব ব্যক্তি, আত্মা বা ভাবদেবীকে আসল মাবুদ গণ্য করা হয় এবং মূতি, ছবি ইত্যাদির মাধ্যমে যেগুলোর প্রতিনিধিত্ব করা হয়। তিন, এসব মুশরিকী পূজা অনুষ্ঠানাদির গভীরে যেসব আকীদা বিশ্বাস কার্যকর থাকে। কুরআন বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ তিনটি জিনিসের ওপর আঘাত হেনেছে। তবে এখানে তার সমালোচনার লক্ষ হচ্ছে প্রথম জিনিসটি। অর্থাৎ মুশরিকরা যেসব মূর্তির সামনে পূজার অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে এবং যাদের সামনে নিজেদের আবেদন নিবেদন ও নজরানা পেশ করে তাদেরকেই এখানে সমালোচনার বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৪৯. মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে হুমকি দিয়ে আসছিল এটা হচ্ছে তার জবাব। তারা বলতো, যদি তুমি আমাদের এসব মাবুদের বিরোধিতা করা থেকে বিরত না হও এবং তাদের বিরুদ্ধে লোকদের বিশ্বাস এভাবে নষ্ট করে যেতে থাকো, তাহলে তুমি তাদের গযবের শিকার হবে এবং তারা তোমাকে একেবারে নেস্তনাবুদ করে দেবে।

১৫০. এ আয়াতগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রচার, পথনির্দেশনা দান, সংস্কার ও সংশোধন কৌশলের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নয়, বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিসিক্ত হয়ে যেসব লোক দুনিয়াবাসীকে সঠিক পথ দেখাবার দায়িত্ব পালন করার জন্য এগিয়ে আসবে তাদেরকেও তাঁরই মাধ্যমে এ একই কৌশল শিখানোও এর উদ্দেশ্য। এ বিষয়গুলোকে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় ঃ

(১) ইসলামের আহবায়কের জন্য যে গুণগুলো সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, তাকে কোমল স্বভাবের, সহিষ্ণু ও উদার হৃদয় হতে হবে। তাকে হতে হবে নিজের সংগী–সহযোগীদের জন্য স্নেহশীল, সাধারণ মানুষের জন্য দয়াদ্র হৃদয় এবং নিজের বিরোধীদের জন্য সহিষ্ণু। নিজের সাথীদের দুর্বলতাগুলোও তাকে সহ্য করে নিতে হবে এবং নিজের বিরোধীদের কঠোর ব্যবহারকেও। চরম উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যেও তার নিজের আচরণে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। অত্যন্ত বিরক্তিকর ও অপছন্দনীয় কথাগুলোও উদার মনে এড়িয়ে যেতে হবে। বিরোধীদের পক্ষ থেকে যতই কড়া ভাষায় কথা বলা হোক, যতই দোষারোপ করা ও মনে ব্যথা দেয়া হোক এবং যতই বর্বরোচিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা হোক না কেন, তাকে অবশ্যি এসব কিছুকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা, কর্কশ আচরণ করা, তিক্ত ও কড়া কথা বলা এবং প্রতিশোধমূলক মানসিক উত্তেজনায় ভোগা এ কাজের জন্য বিষতুল্য। এতে গোটা কাজ পণ্ড হয়ে যায়। এ জিনিসটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "আমার রব আমাকে হুকুম দিয়েছেন, আমি যেন ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায়ই ইনসাফের কথা বলি, যে আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তার সাথে সম্পর্ক জুড়ি, যে আমাকে আমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাকে তার অধিকার দান করি, যে আমার প্রতি জুলুম করে আমি তাকে মাফ করে দেই।" ইসলামের কাজে তিনি নিজের পক্ষ থেকে যাদেরকে পাঠাতেন তাদেরকেও এ একই বিষয়গুলো মেনে চলার নির্দেশ দিতেন। তিনি বলেন ঃ

بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا وَيَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا

"যেখানে তোমরা যাবে সেখানে তোমাদের পদার্পণ যেন লোকদের জন্য সুসংবাদ হিসেবে দেখা দেয়, তা যেন লোকদের মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার না করে। লোকদের জীবন যেন তোমাদের কারণে সহজ হয়ে যায়, কঠিন ও সংকীর্ণ হয়ে না পড়ে।"

আল্লাহ নিজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ গুণেরই প্রশংসা করেছেন :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ –

"আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের জন্য কোমল প্রমাণিত হয়েছো, নয়তো যদি তোমার ব্যবহার কর্কশ হতো এবং তোমার মন হতো সংকীর্ণ ও অনুদার, তাহলে এসব লোক তোমার চারদিক থেকে সরে যেতো।" (আলে ইমরান : ১৫৯)

(২) সত্যের দাওয়াতের সাফল্যের মূলমন্ত্র হচ্ছে, দাওয়াতদানকারীরা দার্শনিক তত্ত্ব ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বালোচনার পরিবর্তে লোকদেরকে এমনসব সহজ সরল সৎকাজের নির্দেশ দেবেন যা সবার কাছে সৎকাজ হিসেবে পরিচিত অথবা যাদের সৎকাজ হবার ব্যাপারটি বুঝার জন্য প্রত্যেক মানুষের সাধারণ জ্ঞানই (Common sense) যথেষ্ট হয়। এভাবে সত্যের আহবায়কের আবেদন সাধারণ–অসাধারণ নির্বিশেষে সবাইকে প্রভাবিত করে এবং প্রত্যেকটি শ্রোতার কান থেকে হৃদয় অভ্যন্তরে প্রবেশের পথ সে নিজেই তৈরী করে নেয়। এ ধরনের পরিচিত সৎকর্মের দাওয়াতের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদের ঝড় তোলে তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যর্থতা ও এ দাওয়াতের সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে। কারণ সাধারণ মানুষ যতই বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হোক না কেন যখন তারা দেখে যে, একদিকে সৎ, ভদ্র ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী এক ব্যক্তি সরল সহজভাবে সোজাসুজি সৎকাজের দাওয়াত দিচ্ছে এবং অন্যদিকে এক দল লোক তার বিরোধিতায় নেমে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করছে যা নৈতিকতা ও মানবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, তখন স্বাভাবিকভাবেই ধীরে ধীরে সত্য বিরোধীদের প্রতি তাদের মন বিরূপ হয়ে উঠতে থাকে এবং সত্যের আহবায়কের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত মোকাবিলার ময়দানে কেবলমাত্র এমন সব লোক থেকে যায়, বাতিল ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার মধ্যে যাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত অথবা পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুকরণের প্রেরণা ও জাহেলী বিদ্বেষ যাদের মনে যে কোন ধরনের আলো গ্রহণ করার ক্ষমতা বিনষ্ট করে দিয়েছে। এ কর্মকৌশলের বদৌলতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবে সাফল্য অর্জন করেন এবং তাঁর পর মাত্র কিছু দিনের মধ্যে নিকটবর্তী দেশগুলোয় ইসলাম এমনভাবে বিস্তার লাভ করে যে, সেখানে কোথাও মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা একশ ভাগ, কোথাও নব্বই ভাগ এবং কোথাও আশী ভাগ।

(৩) সত্যের এ দাওয়াতের ক্ষেত্রে যেখানে একদিকে ন্যায় ও কল্যাণ অনুসন্ধানীদেরকে সৎকাজের দিকে উদ্বুদ্ধ করা জরুরী, সেখানে মূর্খদের সাথে কোন প্রকার সংঘর্ষ ও বিরোধে জড়িয়ে না পড়াও অপরিহার্য, চাই তারা সংঘর্ষ ও বিরোধ সৃষ্টি করার জন্য যত চেষ্টাই করুক। যারা ন্যায়সংগতভাবে বুদ্ধি বিবেচনার সাথে বক্তব্য

অনুধাবন করতে চায় আহবায়কের উচিত একমাত্র তাদেরকেই সম্বোধন করা। এ ব্যাপারে তাঁকে অতি সাবধানী হতে হবে। অন্যদিকে যখন কোন ব্যক্তি নিরেট মূর্খের মত ব্যবহার শুরু করে দেয়, তর্ক–বিতর্ক, গোঁয়ার্তুমি, ঝগড়া–ঝাঁটি ও গালিগালাজের পর্যায়ে নেমে আসে তখন আহবায়কের তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে অস্বীকার করা উচিত। কারণ এ ধরনের বিতর্ক ও ঝগড়া–ঝাঁটিতে লিপ্ত হয়ে কোন লাভ নেই। বরঞ্চ এতে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ আহবায়কের যে শক্তি ইসলামী দাওয়াত সম্প্রসারণ ও ব্যক্তি চরিত্র সংশোধনের কাজে ব্যয়িত হওয়া উচিত তা অযথা এ বাজে কাজে ব্যয় হয়ে যায়।

(৪) তিন নম্বরে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেই প্রসংগে আরো নির্দেশ হচ্ছে এই যে, সত্যের আহবায়ক যখনই বিরোধীদের জুলুম, নির্যাতন ও অনিষ্টকর কার্যকলাপ এবং তাদের মূর্খতা প্রসূত অভিযোগ–আপত্তির কারণে মানসিক উত্তেজনা অনুভব করবে তখনই তার বুঝে নেয়া উচিত যে, এটি শয়তানের উস্কানি ছাড়া আর কিছুই নয়। তখনই তার আল্লাহর কাছে এ মর্মে আশ্রয় চাওয়া উচিত যে, আল্লাহ যেন তাঁর বান্দাকে এ উত্তেজনার স্রোতে ভাসিয়ে না দেন এবং তাকে এমন অসংযমী ও নিয়ন্ত্রণবিহীন না করেন যার ফলে সে সত্যের দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মত কোন কাজ করে বসে। সত্যের দাওয়াতের কাজ ঠাণ্ডা মাথায়ই করা যেতে পারে। আবেগ–উত্তেজনার বশবর্তী না হয়ে পরিবেশ পরিস্থিতি এবং সময়–সুযোগ দেখে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করে যে পদক্ষেপটি নেয়া হয় একমাত্র সেটিই সঠিক হতে পারে। কিন্তু শয়তান যেহেতু এ কাজটির উন্নতি কখনো দু'চোখে দেখতে পারে না তাই সে হামেশা নিজের সংগী–সাথীদের সাহায্যে সত্যের আহবায়কের ওপর নানান ধরনের আক্রমণ পরিচালনার চেষ্টা চালায়। আবার প্রত্যেকটি আক্রমণের পর সে আহবায়ককে এই বলে ক্ষেপাতে থাকে যে, এ আক্রমণের জবাব তো অবশ্যই দেয়া দরকার। আহবায়কের মনের দুয়ারে শয়তানের এ আবেদন অধিকাংশ সময় অতিশয় প্রতারণাপূর্ণ ব্যাখ্যা ও ধর্মীয় সংস্কারের মোড়কে আবৃত হয়ে আসে। কিন্তু এর গভীরে সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতি ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাই শেষ দু' আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যারা মুত্তাকী (অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে কাজ করে এবং অসৎকাজ থেকে দূরে থাকতে চায়) তারা নিজেদের মনে কোন শয়তানী প্ররোচনার প্রভাব এবং কোন অসৎ চিন্তার ছোঁয়া অনুভব করতেই সাথে সাথেই সজাগ হয়ে ওঠে। তারপর এ পর্যায়ে কোন্ ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বনে দীনের স্বার্থ রক্ষিত হবে এবং সত্য প্রীতির প্রকৃত দাবী কি তা তারা পরিষ্কার দেখতে পায়। আর যাদের কাজের সাথে স্বার্থপ্রীতি অংগাংগীভাবে জড়িত এবং এ জন্য শয়তানের সাথে যাদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তারা অবশ্যি শয়তানী প্ররোচনার মোকাবিলায় টিকে থাকতে পারে না এবং তার কাছে পরাজিত হয়ে ভুল পথে পা বাড়ায়। তারপর শয়তান তাদেরকে নাকে রসি লাগিয়ে যেখানে ইচ্ছা ঘোরাতে থাকে এবং কোথাও গিয়ে স্থির হতে দেয় না। বিরোধীদের প্রত্যেকটি গালির জবাবে তাদের কাছে গালির স্তূপ এবং তাদের প্রত্যেকটি অপকৌশলের জবাবে তার চাইতেও বড় অপকৌশল তাদের কাছে তৈরী থাকে।

এ বক্তব্যের একটি সাধারণ প্রয়োগ ক্ষেত্রও রয়েছে। মুত্তাকী লোকেরা নিজেদের জীবনে সাধারণত অমুত্তাকী লোকদের থেকে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে ভয় করে এবং সর্বান্তকরণে অসৎকাজ থেকে দূরে থাকতে চায়

وَاِذَا لَمۡ تَاۡتِهِمۡ بِاٰیَۃٍ قَالُوۡا لَوۡ لَا اجۡتَبَیۡتَهَا ؕ قُلۡ اِنَّمَاۤ اَتَّبِعُ مَا یُوۡحٰۤی اِلَیَّ مِنۡ رَّبِّیۡ ۚ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنۡ رَّبِّکُمۡ وَهُدًی وَّرَحۡمَۃٌ لِّقَوۡمٍ یُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۲۰۳﴾ وَاِذَا قُرِیَٔ الۡقُرۡاٰنُ فَاسۡتَمِعُوۡا لَهٗ وَاَنۡصِتُوۡا لَعَلَّکُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ﴿۲۰۴﴾ وَاذۡکُرۡ رَّبَّکَ فِیۡ نَفۡسِکَ تَضَرُّعًا وَّخِیۡفَۃً وَّدُوۡنَ الۡجَهۡرِ مِنَ الۡقَوۡلِ بِالۡغُدُوِّ وَالۡاٰصَالِ وَلَا تَکُنۡ مِّنَ الۡغٰفِلِیۡنَ ﴿۲۰۵﴾ اِنَّ الَّذِیۡنَ عِنۡدَ رَبِّکَ لَا یَسۡتَکۡبِرُوۡنَ عَنۡ عِبَادَتِهٖ وَیُسَبِّحُوۡنَهٗ وَلَهٗ یَسۡجُدُوۡنَ

হে নবী! যখন তুমি তাদের সামনে কোন নিদর্শন (অর্থাৎ মুজিযা) পেশ করো না তখন তারা বলে, তুমি নিজের জন্য কোন নিদর্শন বেছে নাওনি কেন?[১৫১] তাদেরকে বলে দাও, "আমি তো কেবল সেই অহীরই আনুগত্য করি যা আমার রব আমার কাছে পাঠান। এটি তো অন্তরদৃষ্টির আলো তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এবং হেদায়াত ও রহমত তাদের জন্য যারা একে গ্রহণ করে।[১৫২] যখন কুরআন তোমাদের সামনে পড়া হয়, তা শোনো মনোযোগ সহকারে এবং নীরব থাকো, হয়তো তোমাদের প্রতিও রহমত বর্ষিত হবে।[১৫৩]

হে নবী! তোমার রবকে স্মরণ করো সকাল-সাঁঝে মনে মনে কান্নাজড়িত স্বরে ও ভীতি বিহ্বল চিত্তে এবং অনুচ্চ কন্ঠে। তুমি তাদের অন্তরভুক্ত হয়ো না যারা গাফলতির মধ্যে ডুবে আছে।[১৫৪] তোমার রবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ কখনো নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে তাঁর ইবাদাতে বিরত হয় না,[১৫৫] বরঞ্চ তারা তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে[১৫৬] এবং তাঁর সামনে বিনত থাকে।[১৫৭]

তাদের মনে যদি কখনো অসৎ চিন্তার সামান্যতম স্পর্শও লাগে তাহলে তাদের মনকে তা ঠিক তেমনিভাবে আহত করে যেমন আঙুলে কাঁটা বিঁধে গেলে বা চোখে বালির কণা পড়লে মানুষ যন্ত্রণা বোধ করে। যেহেতু তারা অসৎ চিন্তা, অসৎ কামনা-বাসনা ও অসৎ সংকল্প করতে অভ্যস্ত নয় তাই এ জিনিসগুলো তাদের জন্য আঙুলে কাঁটা ফুটে যাওয়া, চোখে বালি পড়া অথবা স্পর্শকাতর ও পরিচ্ছন্নতা প্রিয় ব্যক্তির কাপড়ে কালির দাগ লেগে যাওয়া বা ময়লার ছিঁটে পড়ার মত অস্বস্তিকর বোধ হয়। তারপর তাদের মনে এভাবে অস্বস্তির কাঁটা বিঁধে যাবার পর তাদের চোখ খুলে যায় এবং তাদের বিবেক জেগে উঠে, অসৎ প্রবণতার এ ধূলোমাটি ঝেড়ে ফেলার কাজে ব্যাপৃত হয়। অন্যদিকে যারা আল্লাহকে

ভয় করে না, অসৎকাজ থেকে বাঁচতেও চায় না এবং শয়তানের সাথে নিবিড় সম্পর্কও কায়েম করে রেখেছে, তাদের মনে অসৎ চিন্তা, অসৎ সংকল্প ও অসৎ উদ্দেশ্য পরিপক্কতা লাভ করতে থাকে এবং তারা এসব পচা দুর্গন্ধময় আবর্জনায় কোন প্রকার অস্বস্তি অনুভব করে না। তাদের অবস্থা হয় ঠিক তেমনি যেমন কোন ডেকচিতে শূয়োরের মাংস রান্না করা হচ্ছে কিন্তু ডেকচি এর কোন খবরই রাখে না যে, তার মধ্যে কি রান্না হচ্ছে। অথবা কোন ধাঙড়ের সারা দেহ ও কাপড় চোপড় ময়লায় ভরে গেছে এবং তা থেকে ভীষণ দুর্গন্ধও বেরুচ্ছে কিন্তু তার মধ্যে কোন অনুভূতিই নেই যে, সে কিসের মধ্যে আছে।

১৫১. কাফেরদের এ প্রশ্নের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বিদ্রূপের ভাব ফুটে উঠেছিল। অর্থাৎ তাদের কথাটার অর্থ ছিল ঃ আরে মিয়া! তুমি যেভাবে নবী হয়ে বসেছো ঠিক তেমনিভাবে নিজের জন্য একটি মু'জিযাও বেছে খুটে সাথে নিয়ে এলে পারতে। কিন্তু এ বিদ্রূপের জবাব কিভাবে দেয়া হয়েছে তা দেখুন।

১৫২. অর্থাৎ যে জিনিসটির চাহিদা দেখা দেয় বা আমি নিজে যার প্রয়োজন অনুভব করি সেটি আমি নিজে উদ্ভাবন বা তৈরী করে পেশ করে দেবো, এটা আমার কাজ নয়। আমি তো একজন রসূল—আল্লাহর প্রেরিত। আমার দায়িত্ব কেবল এতটুকু, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যাবো। মু'জিযার পরিবর্তে আমার প্রেরণকারী আমার কাছে এ কুরআন পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে আছে অন্তরদৃষ্টির আলো। এর প্রধানতম বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, যারা একে মেনে নেয় তারা জীবনের সঠিক–সরল পথ পেয়ে যায় এবং তাদের নৈতিক বৃত্তিতে আল্লাহর অনুগ্রহের নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

১৫৩. অর্থাৎ বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা ও হঠকারিতার কারণে তোমরা কুরআনের বাণী শুনতেই যে কানে আঙুল দাও এবং নিজেরা না শুনার ও অন্যদের না শুনতে দেয়ার উদ্দেশ্যে যে হৈ চৈ ও শোরগোল শুরু করে থাকো, এ নীতি পরিহার করো। বরং কুরআনের বাণী গভীর মনোযোগসহকারে শোনো এবং তার শিক্ষা অনুধাবন করো। এর শিক্ষার সাথে পরিচিত হবার পর ঈমানদারদের মত তোমাদের নিজেদেরও এর রহমতের আংশীদার হয়ে যাওয়া কোন বিচিত্র ব্যাপার নয়। বিরোধীদের বিদ্রূপাত্মক বক্রোক্তির জবাবে এটি এমন একটি মার্জিত মধুর ও হৃদয়গ্রাহী প্রচার নীতি, যার চমৎকারিত্ব বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। যে ব্যক্তি প্রচার কৌশল শিখতে চায় গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে এ জবাব থেকে সে তা শিখতে পারে।

এ আয়াতের মূল উদ্দেশ্য তো আমি ওপরে বর্ণনা করেছি। কিন্তু পরোক্ষভাবে এ থেকে এ বিধানটিও পাওয়া যায় যে, যখন আল্লাহর কালাম পাঠ করা হয় তখন লোকদের আদব সহকারে নীরব থাকা এবং মনোযোগ সহকারে তা শোনা উচিত। এ থেকে এ কথাটিও প্রমাণিত হয় যে, নামাযের মধ্যে ইমাম যখন কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকেন তখন মুকতাদীদের নীরবে তা শোনা উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং তাঁর সাথীদের মতে ইমামের কেরাআত উচ্চস্বরে হোক বা অনুচ্ছ স্বরে হোক সব অবস্থায় মুকতাদীদের নীরব থাকতে হবে। ইমাম মালিক (র) ও ইমাম আহমদের (র) মতে কেবলমাত্র ইমাম যখন উচ্চ স্বরে কেরাআত পড়বেন তখনই মুকতাদীদের নীরব থাকতে হবে। কিন্তু ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, ইমামের উচ্চ ও

অনুচ্চ স্বরে কেরাআত পড়ার উভয় অবস্থায়ই মুকতাদীদের কেরাআত পড়তে হবে। কারণ কোন কোন হাদীসের ভিত্তিতে তিনি মনে করেন, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ে না তার নামায হয় না।

১৫৪. স্মরণ করা অর্থ নামাযও এবং অন্যান্য ধরনের স্মরণ করাও। চাই মুখে মুখে বা মনে মনে যে কোনভাবেই তা হোক না কেন। সকাল–সাঁঝ বলতে নির্দিষ্টভাবে এ দু'টি সময়ও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। আর এ দু' সময়ে আল্লাহর স্মরণ বলতে বুঝানো হয়েছে নামাযকে। পক্ষান্তরে সকাল–সাঁঝ কথাটা "সর্বক্ষণ" অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং তখন এর অর্থ হয় সবসময় আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকা। এ ভাষণটির উপসংহারে সর্বশেষ উপদেশ হিসেবে এটি বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে, তোমাদের অবস্থা যেন গাফেলদের মত না হয়ে যায়। দুনিয়ায় যা কিছু গোমরাহী ছড়িয়েছে এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রে ও কর্মকাণ্ডে যে বিপর্যয়ই সৃষ্টি হয়েছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, মানুষ ভুলে যায়, আল্লাহ তার রব, সে আল্লাহর বান্দা, দুনিয়ায় তাকে পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছে এবং এ দুনিয়ার জীবন শেষ হবার পর তাকে তার রবের কাছে হিসাব দিতে হবে। কাজেই যে ব্যক্তি নিজেও সঠিক পথে চলতে চায় এবং দুনিয়ার অন্যান্য মানুষকেও তদনুসারে চালাতে চায় সে নিজে যেন কখনো এ ধরনের ভুল না করে, এ ব্যাপারে তাকে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এ জন্যেই নামায ও আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে সব সময় স্থায়ীভাবে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট থাকার ও তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য বার বার তাকীদ করা হয়েছে।

১৫৫. এর অর্থ হচ্ছে, শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করা ও রবের বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া শয়তানের কাজ। এর ফল হয় অধপতন ও অবনতি। পক্ষান্তরে তার আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়া এবং তাঁর বন্দেগীতে অবিচল থাকা একটি ফেরেশতাসুলভ কাজ। এর ফল হয় উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ। যদি তোমরা এ উন্নতি চাও তাহলে নিজেদের কর্মনীতিকে শয়তানের পরিবর্তে ফেরেশতাদের কর্মনীতির অনুরূপ করে গড়ে তোল।

১৫৬. মহিমা ঘোষণা করে অর্থাৎ আল্লাহ যে ত্রুটিমুক্ত, দোষমুক্ত, ভুলমুক্ত সব ধরনের দুর্বলতা থেকে তিনি যে একেবারেই পাক–পবিত্র এবং তিনি যে লা–শরীক, তুলনাহীন ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এ বিষয়টি সর্বান্তকরণে মেনে নেয়। মুখে তার স্বীকৃতি দেয় ও অংগীকার করে এবং স্থায়ীভাবে সবসময় এর প্রচার ও ঘোষণায় সোচ্চার থাকে।

১৫৭. এ ক্ষেত্রে শরীয়াতের বিধান এই যে, যে ব্যক্তি এ আয়াতটি পড়বে বা শুনবে তাকে সিজদা করতে হবে। এভাবে তার অবস্থা হয়ে যাবে আল্লাহর নিকটতম ফেরেশতাদের মত। এভাবে সারা বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থাপনা পরিচালনাকারী কর্মীরা যে মহান আল্লাহর সামনে নত হয়ে আছে তারাও তাদের সাথে তাঁর সামনে নত হয়ে যাবে এবং নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সংগে সংগেই একথা প্রমাণ করে দেবে যে, তারা কোন অহমিকায় ভোগে না এবং আল্লাহর বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াও তাদের স্বভাব নয়।

কুরআন মজীদে চৌদ্দটি স্থানে সিজদার আয়াত এসেছে। এ আয়াতগুলো পড়লে বা শুনলে সিজদা করতে হবে, এটি ইসলামী শরীয়াতের একটি বিধিবদ্ধ বিষয়, এ ব্যাপারে

সবাই একমত। তবে এ সিজদা ওয়াজিব হবার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহে আলাইহে তেলাওয়াতের সিজদাকে ওয়াজিব বলেন। অন্যান্য উলামা বলেন, এটি সুন্নাত। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক সময় একটি বড় সমাবেশে কুরআন পড়তেন এবং সেখানে সিজদার আয়াত এলে তিনি নিজে তৎক্ষণাৎ সিজদা করতেন এবং সাহাবীগণের যিনি যেখানে থাকতেন তিনি সেখানেই সিজদানত হতেন। এমনকি কেউ কেউ সিজদা করার জায়গা না পেয়ে নিজের সামনের ব্যক্তির পিঠের ওপর সিজদা করতেন। হাদীসে একথাও এসেছে, মক্কা বিজয়ের সময় তিনি কুরআন পড়েন। সেখানে সিজদার আয়াত এলে যারা মাটির ওপর দাঁড়িয়েছিলেন তারা মাটিতে সিজদা করেন এবং যারা ঘোড়া ও উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন তারা নিজেদের বাহনের পিঠেই ঝুঁকে পড়েন। কখনো নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুত্‌বার মধ্যে সিজদার আয়াত পড়তেন, তখন মিম্বার থেকে নেমে সিজদা করতেন তারপর আবার মিম্বারের ওপর উঠে খুত্‌বা দিতেন।

অধিকাংশ আলেমের মতে নামাযের জন্য যেসব শর্ত নির্ধারিত এ তেলাওয়াতের সিজদার জন্যও তাই নির্ধারিত। অর্থাৎ অযুসহকারে কিবলার দিকে মুখ করে নামাযের সিজদার মত করে মাটিতে মাথা ঠেকাতে হবে। কিন্তু তেলাওয়াতের সিজদার অধ্যায়ে আমরা যতগুলো হাদীস পেয়েছি সেখানে কোথাও এ শর্তগুলোর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। সেখান থেকে তো একথাই জানা যায় যে, সিজদার আয়াত শুনে যে ব্যক্তি যেখানে যে অবস্থায় থাকে সে অবস্থায়ই যেন সিজদা করে—তার অযু থাক বা না থাক, কিবলামুখী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হোক বা না হোক, মাটিতে মাথা রাখার সুযোগ পাক বা না পাক তাতে কিছু আসে যায় না। প্রথম যুগের আলেমদের মধ্যেও আমরা এমন অনেক লোক দেখি যারা এভাবেই তেলাওয়াতের সিজদা করেছেন। ইমাম বুখারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি অযু ছাড়াই তেলাওয়াতের সিজদা করতেন। ফাত্‌হুল বারীতে আবু আবদুর রহমান সুলামী সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি পথ চলতে কুরআন মজীদ পড়তেন এবং কোথাও সিজদার আয়াত এলেই মাথা ঝুঁকিয়ে নিতেন। অযু সহকারে থাকুন বা না থাকুন এবং কিবলার দিকে মুখ ফিরানো থাক বা না থাক, তার পরোয়া করতেন না। এসব কারণে আমি মনে করি, যদিও অধিকাংশ আলেমের মতটিই অধিকতর সতর্কতামূলক তবুও কোন ব্যক্তি যদি অধিকাংশ আলেমের মতের বিপরীত আমল করে তাহলে তাকে তিরস্কার করা যেতে পারে না। কারণ অধিকাংশ আলেমের মতের স্বপক্ষে কোন প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত নেই। আবার প্রথম দিকের আলেমদের মধ্যে এমনসব লোকও পাওয়া গেছে যাদের রীতি ছিল পরবর্তীকালের অধিকাংশ আলেমদের থেকে ভিন্নতর।

আল আনফাল

৮

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটি দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পরে নাযিল হয়। ইসলাম ও কুফরের মধ্যে সংঘটিত এ প্রথম যুদ্ধের ওপর এতে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূরার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে অনুমান করা যায়, সম্ভবত এ সমগ্র সূরাটি একটি মাত্র ভাষণের অন্তরভুক্ত এবং একই সংগে এ ভাষণটি নাযিল করা হয়। তবে এর কোন কোন আয়াত বদর যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পরে নাযিল হয়ে থাকতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে ভাষণের ধারবাহিকতায় এগুলোকে উপযুক্ত স্থানে রেখে এ সমগ্র ভাষণটিকে একটি ধারাবাহিক ভাষণের রূপ দান করা হয়েছে। কিন্তু দু'–তিনটি আলাদা আলাদা ভাষণকে এক সাথে জুড়ে দিয়ে একটি অখণ্ড ভাষণে রূপান্তরিত করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে এমন কোন জোড়ের সন্ধান এ সমগ্র ভাষণের কোথাও পাওয়া যাবে না।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরাটি পর্যালোচনা করার আগে বদরের যুদ্ধ এবং তার সাথে সম্পর্কিত অবস্থা ও ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাওয়াতের প্রথম দশ বারো বছর মক্কা মুয়ায্যমায় অবস্থান করেছিলেন। এ সময় তাঁর দাওয়াত যথেষ্ট পরিপক্কতা ও স্থিতিশীলতা অর্জন করেছিল। কারণ এর পেছনে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহী উন্নত চরিত্র ও বিশাল হৃদয়বৃত্তির অধিকারী এক জ্ঞানী পুরুষ। তিনি নিজের ব্যক্তি সত্তার সমস্ত যোগ্যতা ও সামর্থ এ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর কার্যধারা থেকে এ সত্যটি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, এ আন্দোলনকে তার সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প। এ লক্ষে উপনীত হবার জন্য পথের যাবতীয় বিপদ–আপদ ও সংকট–সমস্যার মোকাবিলায় তিনি সর্বক্ষণ প্রস্তুত। অন্যদিকে এ দাওয়াতের মধ্যে ছিল এমন এক অদ্ভুত ও তীব্র আকর্ষণী ক্ষমতা যে, হৃদয়–মস্তিষ্কের গভীরে তার অনুপ্রবেশ কার্য চলছিল দ্রুত ও অপ্রতিহত গতিতে। মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার এবং হিংসা ও সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতির প্রাচীর তার পথ রোধ করতে পারছিল না। এ কারণে আরবের প্রাচীন জাহেলী ব্যবস্থার সমর্থক শ্রেণী প্রথম দিকে একে হালকাভাবে এবং অবজ্ঞার চোখে দেখলেও মক্কী যুগের শেষের দিকে একে একটি গুরুতর বিপদ বলে মনে করছিল। একে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা নিজেদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তখনো পর্যন্ত এ দাওয়াতের মধ্যে কোন কোন দিক দিয়ে বেশ কিছুটা অভাব রয়ে গিয়েছিল।

এক ঃ তখনো একথা পুরোপুরি প্রমাণ হয়নি যে, এমন ধরনের যথেষ্ট সংখ্যক অনুসারী এ দাওয়াতের পতাকা তলে সমবেত হয়েছে যারা শুধু তার অনুগতই নয় বরং তার নীতিকে মনেপ্রাণে ভালও বাসে, তাকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে নিজেদের সর্বশক্তি ও সকল উপায়-উপকরণ ব্যয় করতে প্রস্তুত এবং এ জন্য নিজেদের সব কিছু কুরবানী করে দিতে, সারা দুনিয়ার সাথে লড়াই করতে, এমন কি নিজেদের প্রিয়তম আত্মীয়তার বাঁধনগুলো কেটে ফেলতেও উদগ্রীব। যদিও মক্কায় ইসলামের অনুসারীরা কুরাইশদের জুলুম-নির্যাতন বরদাশত করে নিজেদের ঈমানের অবিচলতা ও নিষ্ঠা এবং ইসলামের সাথে তাদের অটুট সম্পর্কের পক্ষে বেশ বড় আকারের প্রমাণ পেশ করেছিল, তবুও একথা প্রমাণিত হওয়া তখনো বাকী ছিল যে, ইসলামী আন্দোলন এমন একদল উৎসর্গীত প্রাণ অনুসারী পেয়ে গেছে যারা নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষের মোকাবিলায় অন্য কোন জিনিসকেই প্রিয়তর মনে করে না। বস্তুত একথা প্রমাণ করার জন্য তখনো অনেক পরীক্ষারও প্রয়োজন ছিল।

দুই ঃ এ দাওয়াতের আওয়াজ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়লেও এর প্রভাবগুলো ছিল চারদিকে বিক্ষিপ্ত ও অসংহত। এ দাওয়াত যে জনশক্তি সংগ্রহ করেছিল তা এলোমেলো অবস্থায় সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। পুরাতন জাহেলী ব্যবস্থার সাথে চূড়ান্ত মোকাবিলা করার জন্য যে ধরনের সামষ্টিক শক্তির প্রয়োজন ছিল তা সে তখনো অর্জন করেনি।

তিন ঃ এ দাওয়াত তখনো মাটিতে কোথাও শিকড় গাড়তে পারেনি। তখনো তা কেবল বাতাসেই উড়ে বেড়াচ্ছিল। দেশের অভ্যন্তরে এমন কোন এলাকা ছিল না যেখানে দৃঢ়পদ হয়ে নিজের ভূমিকাকে সুসংহত করে সে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারতো। তখনো পর্যন্ত যেখানেই যে মুসলমান ছিল, কুফর ও শিরকে নিমজ্জিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তার অবস্থান ছিল ঠিক খালি পেটে গেলা কুইনিনের মত। অর্থাৎ খালি পেটে কুইনিন গিললে পেট তাকে বমি করে উগ্‌রে দেবার জন্য সর্বক্ষণ চাপ দিতে থাকে এবং কোথাও তাকে এক দণ্ড তিষ্টাতে দেয় না।

চার ঃ সে সময় পর্যন্ত এ দাওয়াত বাস্তব জীবনের কার্যাবলী নিজের হাতে পরিচালনা করার সুযোগ পায়নি। তখনো সে তার নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়নি। নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা রচনাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অন্যান্য শক্তির সাথে তার যুদ্ধ ও সন্ধির কোন ঘটনাই ঘটেনি। তাই যেসব নৈতিক বিধানের ভিত্তিতে এ দাওয়াত সমগ্র দেশ ও সমাজকে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করতে চাচ্ছিল তার কোন প্রদর্শনীও করা যায়নি। আর এ দাওয়াতের বাণীবাহক ও তাঁর অনুসারীরা যে জিনিসের দিকে সমগ্র দুনিয়াবাসীকে আহবান জানিয়ে আসছিলেন তাকে কার্যকর করার ব্যাপারে তারা নিজেরা কতটুকু নিষ্ঠাবান, এখনো কোন পরীক্ষার মানদণ্ডে যাচাই বাছাই করার পর তার সুস্পষ্ট চেহারাও সামনে আসেনি।

মক্কী যুগের শেষ তিন-চার বছরে ইয়াসরেবে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে অপ্রতিহত গতিতে। সেখানকার লোকেরা আরবের অন্যান্য এলাকার গোত্রগুলোর তুলনায় অধিকতর সহজে ও নির্দ্বিধায় এ আলো গ্রহণ করতে থাকে। শেষে নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে হজ্জের সময় ৭৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল রাতের আঁধারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলো, তারা কেবল ইসলাম গ্রহণই করেননি

বরং তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে নিজেদের শহরে স্থান দেয়ারও আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসের একটি বৈপ্লবিক পটপরিবর্তন। মহান আল্লাহ তাঁর নিজ অনুগ্রহে এ দুর্লভ সুযোগটি দিয়েছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হাত বাড়িয়ে তা লুফে নিয়েছিলেন। ইয়াসরেববাসীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুধুমাত্র একজন শরণার্থী হিসেবে নয় বরং আল্লাহর প্রতিনিধি এবং নেতা ও শাসক হিসেবেও আহবান করছিলেন। আর তাঁর অনুসারীদেরকে তারা একটি অপরিচিত দেশে নিছক মুহাজির হিসেবে বসবাস করার জন্য আহবান জানাচ্ছিলেন না। বরং আরবের বিভিন্ন এলাকায় ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যেসব মুসলমান ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাদের সবাইকে ইয়াসরেবে জমা করে ইয়াসরেবী মুসলমানদের সাথে মিলে একটি সুসংবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এভাবে মূলত ইয়াসরেব নিজেকে "মদীনাতুল ইসলাম" তথা ইসলামের নগর হিসেবে উপস্থাপিত করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে সেখানে আরবের প্রথম দারুল ইসলাম গড়ে তুললেন।

এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের অর্থ কি হতে পারে সে সম্পর্কে মদীনাবাসীরা অনবহিত ছিল না। এর পরিষ্কার অর্থ ছিল, একটি ছোট্ট শহর সারাদেশের উদ্যত তরবারি এবং সমগ্র দেশবাসীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বয়কটের মোকাবিলায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কাজেই আকাবার বাইআত গ্রহণ করার সময় সেদিনের সেই রাত্রিকালীন মজলিসে ইসলামের প্রাথমিক সাহায্যকারীরা (আনসারগণ) এ পরিণাম সম্পর্কে পুরোপুরি জেনে বুঝেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে নিজেদের হাত রেখেছিলেন। যখন এ বাইআত অনুষ্ঠিত হচ্ছিল ঠিক তখনই ইয়াসরেবী প্রতিনিধি দলের সর্বকনিষ্ঠ যুব সদস্য আস'আদ ইবনে যুরারাহ (রা) উঠে বললেন ঃ

رويدا يا اهل يثرب ! انالم نضرب اليه اكباد الابل الاونحن نعلم انه رسول الله ، وان اخراجه اليوم مناواة للعرب كافة ، وقتل خياركم ، وتعضكم السيوف – فاما انتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه واجره على الله ، واما انتم قوم تخافون من انفسكم خيفة فذروه فبينوا ذلك فهو اعذر لكم عند الله –

"থামো, হে ইয়াসরেব বাসীরা! আমরা একথা জেনে বুঝেই এঁর কাছে এসেছি যে, ইনি আল্লাহর রসূল এবং আজ এঁকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে সমগ্র আরববাসীর শত্রুতার ঝুঁকি নেয়া। এর ফলে তোমাদের শিশু সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে এবং তোমাদের ওপর তরবারি বর্ষিত হবে। কাজেই যদি তোমাদের এ আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা থাকে তাহলে এঁর দায়িত্ব গ্রহণ করো। আল্লাহ এর প্রতিদান দেবেন। আর যদি তোমরা নিজেদের প্রাণকে প্রিয়তর মনে করে থাকো তাহলে দায়িত্ব ছেড়ে দাও এবং পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের অক্ষমতা জানিয়ে দাও। কারণ এ সময় অক্ষমতা প্রকাশ করা আল্লাহর কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য হতে পারে।"

প্রতিনিধি দলের আর একজন সদস্য আব্বাস ইবনে উবাদাহ ইবনে নাদ্‌লাহ (রা) একথারই পুনরাবৃত্তি করেন এভাবে ঃ

اتعلمون علام تبايعون هذا الرجل ؟ (قالوا نعم ، قال) انكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناس - فان كنتم ترون انكم اذا نهكت اموالكم مصيبة واشرافكم قتلا اسلمتموه فمن الان فدعوه ، فهو والله ان فعلتم خزى الدنيا والاخرة وان كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه اليه على نهكة الاموال وقتل الاشراف فخذوه ، فهو والله خير الدنيا والاخرة -

"তোমরা কি জানো, এ ব্যক্তির হাতে কিসের বাইআত করছো? (ধ্বনি ঃ হাঁ আমরা জানি) তোমরা এঁর হাতে বাইআত করে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ঝুঁকি নিচ্ছো। কাজেই যদি তোমরা মনে করে থাকো, যখন তোমাদের ধন-সম্পদ ধ্বংসের মুখোমুখি হবে এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হবার আশংকা দেখা দেবে তখন তোমরা এঁকে শত্রুদের হাতে সোপর্দ করে দেবে, তাহলে আজই বরং এঁকে ত্যাগ করাই ভাল। কারণ আল্লাহর কসম, এটা দুনিয়ায় ও আখেরাতে সবখানেই লাঞ্ছনার কারণ হবে। আর যদি তোমরা মনে করে থাকো, এ ব্যক্তিকে তোমরা যে আহবান জানাচ্ছো, নিজেদের ধন-সম্পদ ধ্বংস ও নেতৃস্থানীয় লোকদের জীবন নাশ সত্ত্বেও তোমরা তা পালন করতে প্রস্তুত থাকবে, তাহলে অবশ্যি তাঁর হাত আঁকড়ে ধরো। কারণ আল্লাহর কসম, এরই মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ।"

একথায় প্রতিনিধি দলের সবাই এক বাক্যে বলে উঠলেন ঃ

فانا ناخذه على مصيبة الاموال وقتل الاشراف

"আমরা এঁকে গ্রহণ করে আমাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করতে ও নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হবার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।"

এ ঘটনার পর সেই ঐতিহাসিক বাইআত অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে একে আকাবার দ্বিতীয় বাইআত বলা হয়।

অন্যদিকে মক্কাবাসীর কাছেও এ ঘটনাটির তাৎপর্য ছিল সুবিদিত। ইতিপূর্বে কুরাইশরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিপুল প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ যোগ্যতার সাথে পরিচিত হয়েছিল এবং এখন সেই মুহাম্মাদই (সা) যে, একটি আবাস লাভ করতে যাচ্ছিলেন, তা তারা বেশ অনুধাবন করতে পারছিল। তাঁর নেতৃত্বে ইসলামের অনুসারীরা যে একটি সুসংগঠিত দলের আকারে অচিরেই গড়ে উঠবে এবং সমবেত হবে একথাও তারা বুঝতে পারছিল। আর ইসলামের এ অনুসারীরা সংকল্পে কত দৃঢ়, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগে কত অবিচল, এতদিনে সেটা তাদের কাছে অনেকটা পরীক্ষিত হয়ে

গিয়েছিল। এহেন সত্যাভিসারী কাফেলার এ নব উথান পুরাতন ব্যবস্থার জন্য মৃত্যুর ঘন্টাস্বরূপ। তাছাড়া মদীনার মত জায়গায় এই মুসলিম শক্তির একত্র সমাবেশ কুরাইশদের জন্য আরো নতুন বিপদের সংকেত দিচ্ছিল। কারণ লোহিত সাগরের কিনারা ধরে ইয়ামন থেকে সিরিয়ার দিকে যে বাণিজ্য পথটি চলে গিয়েছিল তার সংরক্ষিত ও নিরাপদ থাকার ওপর কুরাইশ ও অন্যান্য বড় বড় গোত্রের অর্থনৈতিক জীবন নির্ভরশীল ছিল। আর এটি এখন মুসলমানদের প্রভাবাধীনে চলে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত। এ প্রধান বাণিজ্য পথটি দখল করে মুসলমানরা জাহেলী ব্যবস্থার জীবন ধারণ দুর্বিসহ করে তুলতে পারতো। এ প্রধান বাণিজ্য পথের ভিত্তিতে শুধু মাত্র মক্কাবাসীদের যে ব্যবসায় চলতো তার পরিমাণ ছিল বছরে প্রায় আড়াই লাখ আশরফী। তায়েফ ও অন্যান্য স্থানের ব্যবসায় ছিল এর বাইরে।

কুরাইশরা এ পরিণতির কথা ভালভাবেই জানতো। যে রাতে আকাবার বাইআত অনুষ্ঠিত হলো সে রাতেই এ ঘটনার উড়ো খবর মক্কাবাসীদের কানে পৌঁছে গেলো। আর সাথে সাথেই সেখানে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলো। প্রথমে তারা চেষ্টা করলো মদীনাবাসীদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের দল থেকে ভাগিয়ে নিতে। তারপর যখন মুসলমানরা একজন দু'জন করে মদীনায় হিজরত করতে থাকলো এবং কুরাইশদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেলো যে, এখন মুহাম্মাদও (সা) সেখানে স্থানান্তরিত হয়ে যাবেন তখন তারা এ বিপদকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য সর্বশেষ উপায় অবলম্বনে এগিয়ে এলো। রসূলের (সা) হিজরতের মাত্র কয়েক দিন আগে কুরাইশদের পরামর্শ সভা বসলো। অনেক আলোচনা পর্যালোচনার পর সেখানে স্থির হলো, বনী হাশেম ছাড়া কুরাইশদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে লোক বাছাই করা হবে এবং এরা সবাই মিলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করবে। এর ফলে বনী হাশেমের জন্য এ সমস্ত গোত্রের সাথে একাকী লড়াই করা কঠিন হবে। কাজেই এ ক্ষেত্রে তারা প্রতিশোধের পরিবর্তে রক্ত মূল্য গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানী এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ও উন্নত কৌশল অবলম্বনের কারণে তাদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেলো। ফলে রসূলুল্লাহ (সা) নির্বিঘ্নে মদীনায় পৌঁছে গেলেন। এভাবে হিজরত প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে কুরাইশরা মদীনার সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে (যাকে হিজরতের আগে মদীনাবাসীরা নিজেদের বাদশাহ বানাবার প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং রসূলের মদীনায় পৌঁছে যাবার এবং আওস ও খায্‌রাজদের অধিকাংশের ইসলাম গ্রহণের ফলে যার বাড়া ভাতে ছাই পড়ে গিয়েছিল) পত্র লিখলো ঃ "তোমরা আমাদের লোককে তোমাদের ওখানে আশ্রয় দিয়েছো। আমরা এ মর্মে আল্লাহর কসম খেয়েছি, হয় তোমরা তার সাথে লড়বে বা তাকে সেখান থেকে বের করে দেবে। অন্যথায় আমরা সবাই মিলে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরক হত্যা ও মেয়েদেরকে বাঁদী বানাবো।" কুরাইশদের এ উস্কানির মুখে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই কিছু দুষ্কর্ম করার চক্রান্ত এঁটেছিল। কিন্তু সময় মত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দুষ্কর্ম রুখে দিলেন। তারপর মদীনার প্রধান সা'দ ইবনে মু'আয উমরাহ করার জন্য মক্কা গেলেন। সেখানে হারম শরীফের দরজার ওপর আবু জেহেল তার সমালোচনা করে বললো ঃ

الا اراك تطوف بمكه امنا وقد اويتم الصباة وزعمتم انكم تنصرونهم وتعينونهم ؟ لولا انك مع ابى صفوان مارجعت الى اهلك سالما -

"তোমরা আমাদের ধর্মত্যাগীদেরকে আশ্রয় দেবে এবং তাদেরকে সাহায্য–সহযোগিতা দান করবে আর আমরা তোমাদেরকে অবাধে মক্কায় তাওয়াফ করতে দেবো ভেবেছ? যদি তুমি আবু সফওয়ান তথা উমাইয়াহ ইবনে খল্‌ফের মেহমান না হতে তাহলে তোমাকে এখান থেকে প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরে যেতে দিতাম না।"

সা'দ জবাবে বললেন ঃ

والله لئن منعتنى هذا لامنعنك ماهو اشد عليك منه طريقك على المدينة -

"আল্লাহর কসম, যদি তুমি আমাকে এ কাজে বাধা দাও তাহলে আমি তোমাকে এমন জিনিস থেকে রুখে দেবো, যা তোমার জন্য এর চাইতে অনেক বেশী মারাত্মক। অর্থাৎ মদীনা দিয়ে তোমাদের যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেবো।"

অর্থাৎ এভাবে মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে যেন একথা ঘোষণা করে দেয়া হলো যে, বায়তুল্লাহ যিয়ারত করার পথ মুসলমানদের জন্য বন্ধ। আর এর জবাবে মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে বলা হলো, সিরিয়ার সাথে বাণিজ্য করার পথ ইসলাম বিরোধীদের জন্য বিপদসংকুল।

আসলে সে সময় মুসলমানদের জন্য উল্লেখিত বাণিজ্য পথের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব মজবুত করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় ছিল না। কারণ এ পথের সাথে কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রগুলোর স্বার্থ বিজড়িত ছিল। ফলে এর ওপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব বেশী মজবুত হলে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে নিজেদের শত্রুতামূলক নীতি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হতে পারে বলে আশা করা যায়। কাজেই মদীনায় পৌঁছার সাথে সাথেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদ্যজাত ইসলামী সমাজে প্রাথমিক নিয়ম–শৃংখলা বিধান ও মদীনার ইহুদী অধিবাসীদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করার পর সর্বপ্রথম এ বাণিজ্য পথটির প্রতি নজর দিলেন। এ ব্যাপারে তিনি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন।

প্রথমত মদীনা ও লোহিত সাগরের উপকূলের মধ্যবর্তীস্থলে এ বাণিজ্য পথের আশেপাশে যেসব গোত্রের বসতি ছিল তাদের সাথে তিনি আলাপ–আলোচনা শুরু করে দিলেন। এভাবে তাদেরকে সহযোগিতামূলক মৈত্রী অথবা কমপক্ষে নিরপেক্ষতার চুক্তিতে আবদ্ধ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ সফলতা লাভ করলেন। সর্বপ্রথম নিরপেক্ষতার চুক্তি অনুষ্ঠিত হলো সাগর তীরবর্তী পার্বত্য এলাকার জুহাইনা গোত্রের সাথে। এ গোত্রটির ভূমিকা এ এলাকায় ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারপর প্রথম হিজরীর শেষের দিকে চুক্তি অনুষ্ঠিত হলো বনী যাম্‌রার সাথে। এ গোত্রটির অবস্থান ছিল ইয়াম্বু ও যুল আশীরার সন্নিহিত স্থানে এটি ছিল প্রতিরক্ষামূলক সহযোগিতার চুক্তি। দ্বিতীয় হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে বনী মুদলিজও এ চুক্তিতে শামিল হলো। কারণ এ গোত্রটি ছিল বনী

যাম্‌রার প্রতিবেশী ও বন্ধু গোত্র। এ ছাড়াও ইসলাম প্রচারের ফলে এ গোত্রগুলোতে ইসলামের সমর্থক ও অনুসারীদের একটি বিরাট গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত কুরাইশদের সওদাগরী কাফেলাগুলোকে ভীত–সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য বাণিজ্য পথের ওপর একের পর এক ছোট ছোট ঝটিকা বাহিনী পাঠাতে থাকলেন। কোন কোন ঝটিকা বাহিনীর সাথে তিনি নিজেও গেলেন। প্রথম বছর এ ধরনের ৪টি বাহিনী পাঠানো হলো। মাগাযী (যুদ্ধ ইতিহাস) গ্রন্থগুলো এগুলোকে সারীয়া হামযা, সারীয়া উবাইদা ইবনে হারেস, সারীয়া সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও গাযওয়াতুল আবওয়া নামে অভিহিত করা হয়েছে।[১] দ্বিতীয় বছরের প্রথম দিকের মাসগুলোয় একই দিকে আরো দু'টি আক্রমণ চালানো হলো। মাগাযী গ্রন্থগুলোয় এ দু'টিকে গাযওয়া বুওয়াত ও গাযওয়া যুল আশীরা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সমস্ত অভিযানের দু'টি বৈশিষ্ট উল্লেখযোগ্য। এক, এ অভিযানগুলোয় কোন রক্তপাতের ঘটনা ঘটেনি এবং কোন কাফেলা লুন্ঠিতও হয়নি। এ থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এর মাধ্যমে কুরাইশদেরকে বাতাসের গতি কোন্‌ দিকে তা জানিয়ে দেয়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য। দুই, এর মধ্য থেকে কোন একটি বাহিনীতেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার একটি লোককেও শামিল করেননি। মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদেরকেই তিনি এসব বাহিনীর অন্তরভুক্ত করেন। কারণ এর ফলে যদি সংঘর্ষ বাধে তাহলে তা যেন শুধু কুরাইশদের নিজেদের পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অন্য গোত্রগুলো যেন এর সাথে জড়িয়ে পড়ে এ আগুনকে চারদিকে ছড়িয়ে না দেয়। ওদিকে মক্কাবাসীরাও মদীনার দিকে লুটেরা বাহিনী পাঠাতে থাকে। তাদেরই একটি বাহিনী কুরয ইবনে জাবের আল ফিহ্‌রীর নেতৃত্বে একেবারে মদীনার কাছাকাছি এলাকায় হামলা চালিয়ে মদীনাবাসীদের গৃহপালিত পশু লুট করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে কুরাইশরা এ সংঘর্ষের মধ্যে অন্যান্য গোত্রদেরকেও জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া তারা কেবল ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছিলো না, লুটতরাজও শুরু করে দিয়েছিল।

এ অবস্থায় ২য় হিজরীর শাবান মাসে (৬২৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বা মার্চ মাস) কুরাইশদের একটি বিরাট বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কার পথে অগ্রসর হয়ে এমন এক জায়গায় পৌছে গিয়েছিল যে জায়গাটি ছিল মদীনাবাসীদের আওতার মধ্যে। এ কাফেলার সাথে ছিল প্রায় ৫০ হাজার আশরফীর সামগ্রী। তাদের সাথে তিরিশ চল্লিশ জনের বেশী রক্ষী ছিল না। যেহেতু পণ্যসামগ্রী ছিল বেশী এবং রক্ষীর সংখ্যা ছিল কম আর আগের অবস্থার কারণে মুসলমানদের কোন শক্তিশালী দলের তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করার আশংকা ছিল অত্যন্ত প্রবল, তাই কাফেলা সরদার আবু সুফিয়ান এ বিপদ সংকুল স্থানে পৌছেই সাহায্য আনার জন্য এক ব্যক্তিকে মক্কা অভিমুখে পাঠিয়ে দিল। লোকটি মক্কায় পৌছেই প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী নিজের উটের কান কেটে ফেললো, তার নাক চিরে দিল, উটের পিঠের আসন উল্টে দিলে এবং নিজের জামা সামনের দিকে ও পিছনের দিকে ছিঁড়ে ফেলে এই বলে চিৎকার করতে থাকলো ঃ

১. ইসলামের ইতিহাসের পরিভাষায় "সারীয়া" বলা হয় এমন ধরনের ছোটখাট বাহিনীকে যাকে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সালাম কোন সাহাবীর নেতৃত্বে পাঠিয়ে ছিলেন আর যে বাহিনীতে তিনি নিজে গিয়েছিলেন তাকে বলা হয় গাযওয়া।

কোরাইশদের বাণিজ্যিক পথ
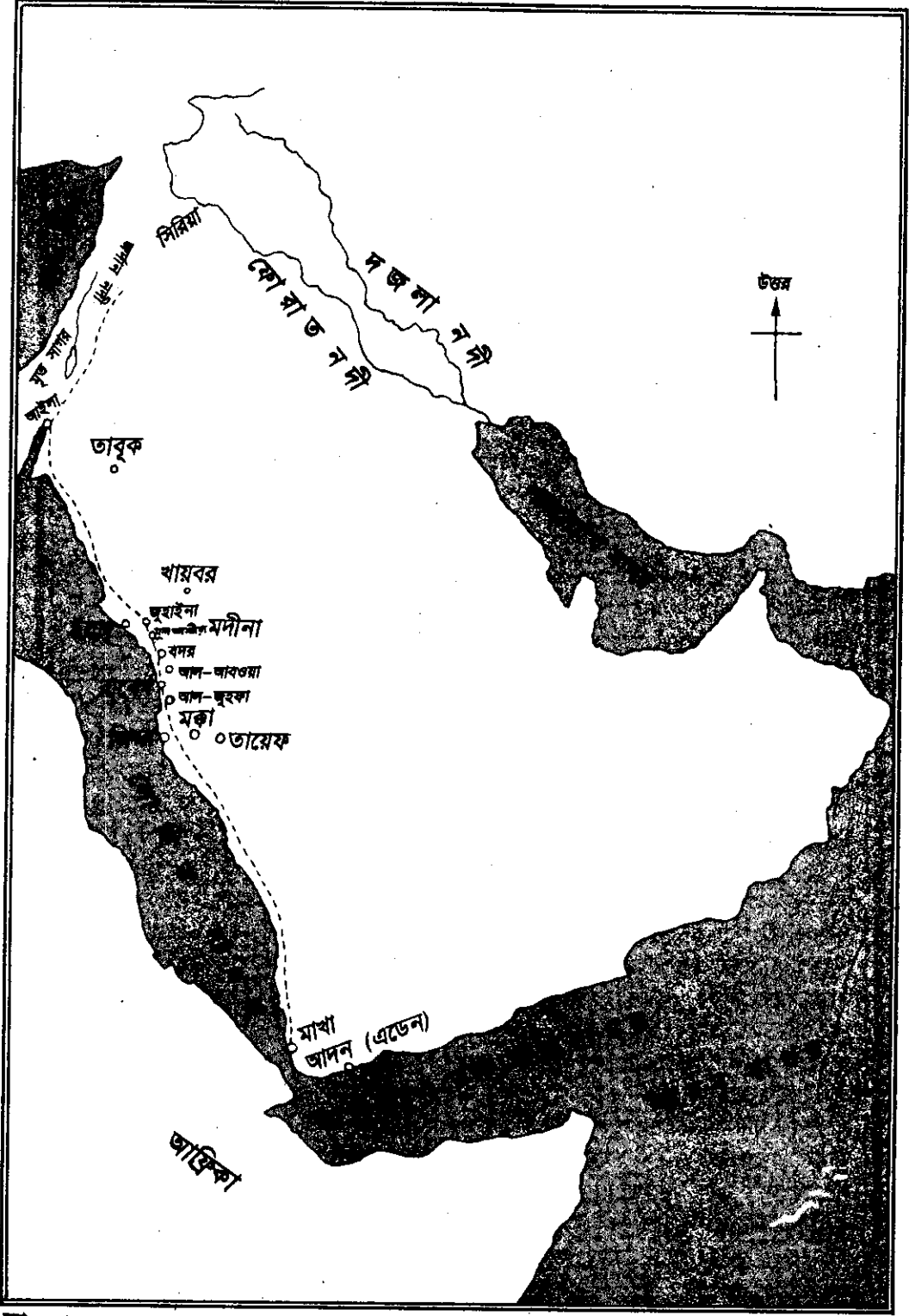
يا معشر قريش اللطيمه اللطيمه ، اموالكم مع ابى سفيان قد عرض لها محمد فى اصحابه ، لا ارى ان تدركوها ، الغوث ، الغوث ،

"হে কুরাইশরা! তোমাদের বাণিজ্য কাফেলার খবর শোনো। আবু সুফিয়ানের সাথে তোমাদের যে সম্পদ আছে, মুহাম্মাদ তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে তার পেছনে ধাওয়া করেছে। তোমাদের তা পাবার আশা নেই। সাহায্যের জন্য দৌড়ে চলো! সাহায্যের জন্য দৌড়ে চলো।!"

এ ঘোষণা শুনে সারা মক্কায় বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেলো। কুরাইশদের বড় বড় সরদাররা সবাই যুদ্ধের জন্য তৈরী হলো। প্রায় এক হাজার যোদ্ধা রণসাজে সজ্জিত হয়ে পূর্ণ আড়ম্বর ও জাঁক-জমকের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রওয়ানা হলো। তাদের মধ্যে ছিল ৬শ বর্মধারী এবং একশ' জন অশ্বারোহী। নিজেদের কাফেলাকে শুধু নিরাপদে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসাই তাদের কাজ ছিল না বরং এই সংগে তারা নিত্য দিনের এ আশংকা ও আতংকবোধকে চিরতরে খতম করে দিতে চাচ্ছিল। মদীনায় এ বিরোধী শক্তির নতুন সংযোজনকে তারা গুঁড়িয়ে দিতে এবং এর আশপাশের গোত্রগুলোকে এত দূর সন্ত্রস্ত করে তুলতে চাচ্ছিল যার ফলে ভবিষ্যতে এ বাণিজ্য পথটি তাদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলমান ঘটনাবলীর প্রতি সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অনুভব করলেন যেন চূড়ান্ত মীমাংসার সময় এসে গেছে। তিনি ভাবলেন এ সময় যদি একটি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয় তাহলে ইসলামী আন্দোলন চিরকালের জন্য নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। বরং এরপর এ আন্দোলনের জন্য হয়তো আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার আর কোন সুযোগই থাকবে না। মক্কা থেকে হিজরত করে এ নতুন শহরে আসার পর এখনো দু'টি বছরও পার হয়ে যায়নি। মুহাজিররা বিত্ত ও সরঞ্জামহীন, আনসাররা অনভিজ্ঞ, ইহুদিগোত্রগুলো বিরুদ্ধবাদিতায় মুখর খোদ মদীনাতেই মুনাফিক ও মুশরিকদের একটি বিরাট গোষ্ঠী উপস্থিত এবং চারপাশের সমস্ত গোত্র কুরাইশদের ভয়ে ভীত। আর সেই সংগে ধর্মীয় দিক দিয়েও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এ অবস্থায় যদি কুরাইশরা মদীনা আক্রমণ করে তাহলে মুসলমানদের এ ক্ষুদ্র দলটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি তারা মদীনা আক্রমণ না করে শুধু মাত্র নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করে বাণিজ্য কাফেলাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় এবং মুসলমানরা দমে গিয়ে ঘরের কোণে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে তাহলেও সহসাই মুসলমানদের প্রতিপত্তি এমনভাবে আহত হবে এবং তাদের প্রভাব এত বেশী ক্ষুণ্ন হবে যার ফলে আরবের প্রতিটি শিশুও তাদের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। সারাদেশে তাদের কোন আশ্রয় স্থল থাকবে না। তখন চারপাশের সমস্ত গোত্র কুরাইশদের ইংগিতে কাজ করতে থাকবে। মদীনার ইহুদী, মুনাফিক ও মুশরিকরা প্রকাশ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। মদীনায় জীবন-ধারণ করাও সে সময় দুসাধ্য হয়ে পড়বে। মুসলমানদের কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকবে না। ফলে তাদের ধন-প্রাণ-ইজ্জত-আবরুর ওপর আক্রমণ চালাতে কেউ ইতস্তত করবে না। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃঢ় সংকল্প নিলেন যে, বর্তমানে যতটুকু শক্তি-সামর্থ আমাদের আছে তাই নিয়েই আমরা বের হয়ে পড়বো।

দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকার ও টিকে থাকার ক্ষমতা কার আছে এবং কার নেই ময়দানেই তার ফায়সালা হয়ে যাবে।

এ চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবার সংকল্প করেই তিনি আনসার ও মোহাজিরদের একত্র করলেন। তাদের সামনে পরিস্থিতি পরিষ্কার করে তুলে ধরলেন। একদিকে উত্তরে বাণিজ্য কাফেলা এবং অন্যদিকে দক্ষিণে এগিয়ে আসছে কুরাইশদের সেনাদল। আল্লাহর ওয়াদা, এ দু'টির মধ্য থেকে কোন একটি তোমরা পেয়ে যাবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ বলো, এর মধ্য থেকে কার মোকাবিলায় তোমরা এগিয়ে যেতে চাও? জবাবে বিপুল সংখ্যক সাহাবী মত প্রকাশ করলেন, কাফেলার ওপর আক্রমণ চালানো হোক। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ছিল অন্য কিছু অভিপ্রায়। তাই তিনি নিজের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। একথায় মোহাজিরদের মধ্য থেকে মিকদাদ ইবনে আমর (রা) উঠে বললেন ঃ

মদীনা থেকে বদর পর্যন্ত
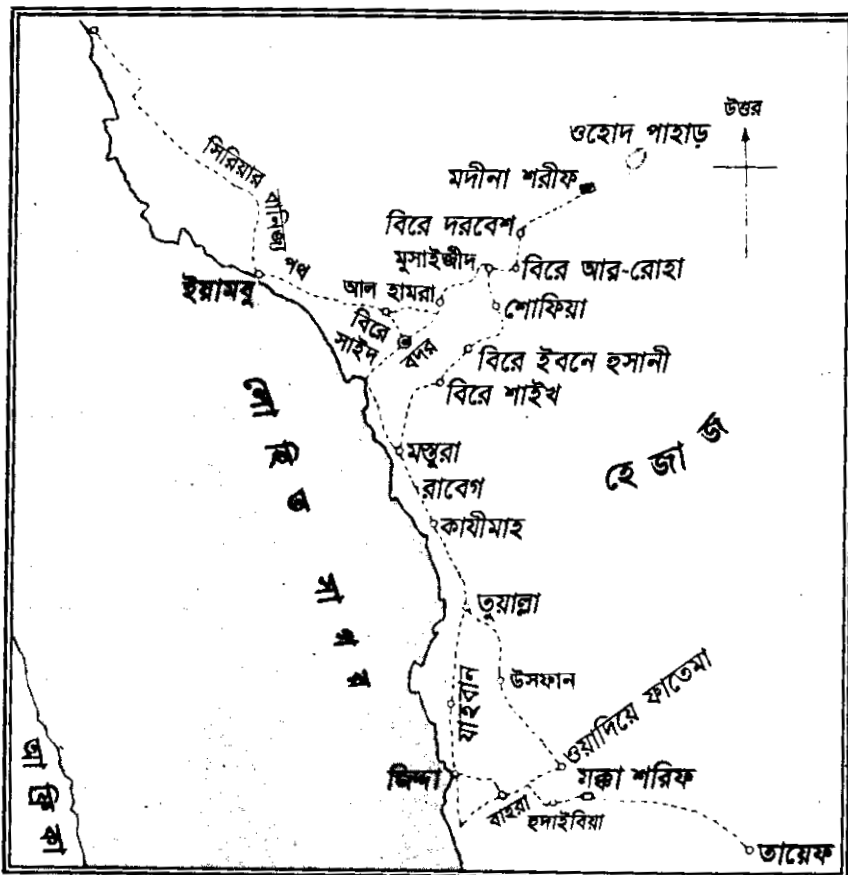
উপরোক্ত মানচিত্র কাফেলাদের মক্কা এবং মদীনা থেকে বদর পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তা প্রদর্শিত হইল।

يا رسول الله ! امض لما امرك الله ، فانا معك حيثما احببت ، لا نقول لك كما قال بنوا اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون ، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون مادامت عين منا تطرف -

"হে আল্লাহর রসূল! আপনার রব আপনাকে যেদিকে যাবার হুকুম দিচ্ছেন সেদিকে চলুন। আপনি যেদিকে যাবেন আমরা আপনার সাথে আছি। আমরা বনী ইসরাঈলের মত একথা বলবো না ঃ যাও, তুমি ও তোমার আল্লাহ দু'জনে লড়াই করো, আমরা তো এখানেই বসে রইলাম। বরং আমরা বলছি ঃ চলুন আপনি ও আপনার আল্লাহ দু'জনে লড়ুন আর আমরাও আপনাদের সাথে জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করবো। যতক্ষণ আমাদের একটি চোখের তারাও নড়াচড়া করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত।"

কিন্তু আনসারদের মতামত না জেনে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। কারণ এ পর্যন্ত যেসব সামরিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল তাতে তাদের সাহায্য গ্রহণ করা হয়নি এবং প্রথম দিন তারা ইসলামকে সমর্থন করার যে শপথ নিয়েছিল তাকে কার্যকর করতে তারা কতটুকু প্রস্তুত তা পরীক্ষা করার এটি ছিল প্রথম সুযোগ। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সা) সরাসরি তাদেরকে সম্বোধন না করে নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। একথায় সা'দ ইবনে মু'আয উঠে বললেন, সম্ভবত আপনি আমাদের সম্বোধন করে বলছেন? জবাব দিলেন ঃ হাঁ। একথা শুনে সা'দ বললেন ঃ

لقد امنا بك وصدقناك وشهدنا ان ماجئت به هوا الحق واعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة - فامض يارسول الله لما اردت فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد - ومانكره ان تلقى بنا عدونا غدا انا لنصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا مانقربه عينك فسربنا على بركة الله -

"আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি। আপনি যা কিছু এনেছেন তাকে সত্য বলে ঘোষণা করেছি। আপনার কথা শুনার ও আপনার আনুগত্য করার দৃঢ় শপথ নিয়েছি। কাজেই হে আল্লাহর রসূল! আপনি যা সংকল্প করেছেন তা করে ফেলুন। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন তাহলে আমরাও আপনার সাথে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের একজনও পিছনে পড়ে থাকবে না। আপনি কালই আমাদের দুশমনের সাথে যুদ্ধ শুরু করুন। এটা আমাদের কাছে মোটেই অপছন্দনীয় নয়। আমরা যুদ্ধে অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকবো।

মোকাবিলায় আমরা সত্যিকার প্রাণ উৎসর্গীতার প্রমাণ দেবো। সম্ভবত আল্লাহ আমাদের থেকে আপনাকে এমন কিছু কৃতিত্ব দেখিয়ে দেবেন, যাতে আপনার চোখ শীতল হবে। কাজেই আল্লাহর বরকতের ভরসায় আপনি আমাদের নিয়ে চলুন।"

এ আলোচনা ও বক্তৃতার পরে সিদ্ধান্ত হলো, বাণিজ্য কাফেলার পরিবর্তে কুরাইশ সেনা দলের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এটা কোন যেনতেন সিদ্ধান্ত ছিল না। এ সংক্ষিপ্ত সময়ে যারা যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন, তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ'র কিছু বেশী (৮৬ জন মোহাজির, ৬১ জন আওস গোত্রের এবং ১৭০ জন খাযরাজ গোত্রের)। এদের মধ্যে মাত্র দু'তিন জনের কাছে ঘোড়া ছিল। আর বাকি লোকদের জন্য ৭০ টির বেশী উট ছিল না। এগুলোর পিঠে তারা তিন চারজন করে পালাক্রমে সওয়ার হচ্ছিলেন। যুদ্ধাস্ত্রও ছিল একেবারেই অপ্রতুল। মাত্র ৬০ জনের কাছে বর্ম ছিল। এ কারণে গুটিকয় উৎসর্গীত প্রাণ মুজাহিদ ছাড়া এ ভয়ংকর অভিযানে শরীক অধিকাংশ মুজাহিদই হৃদয়ে উৎকণ্ঠা অনুভব করছিলেন। তারা মনে করছিলেন, যেন তারা জেনে বুঝে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিছু সুবিধাবাদী ধরনের লোক ইসলামের পরিসরে প্রবেশ করলেও তারা এমন ইসলামের প্রবক্তা ছিল না যাতে ধন-প্রাণের সংশয় দেখা দেয়। তারা এ অভিযানকে নিছক পাগলামী বলে অভিহিত করছিল। তারা মনে করছিল, ধর্মীয় আবেগ উচ্ছ্বাস এ লোকগুলোকে পাগলে পরিণত করেছে। কিন্তু নবী ও সাচ্চা-সত্যনিষ্ঠ মুমিনগণ একথা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, এটিই প্রাণ উৎসর্গ করার সময়। তাই আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাঁরা বের হয়ে পড়েছিলেন। তারা সোজা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলেন। এই পথেই কুরাইশদের বাহিনী মক্কা থেকে ধেয়ে আসছিল। অথচ শুরুতে যদি বাণিজ্য কাফেলা লুট করার ইচ্ছা থাকতো তাহলে উত্তর পশ্চিমের পথে এগিয়ে যাওয়া হতো।[১]

রমযান মাসের ১৭ তারিখে বদর নামক স্থানে উভয় পক্ষের মোকাবিলা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, তিনজন কাফেরের মোকাবিলায় একজন মুসলমান দাঁড়িয়েছে এবং তাও আবার তারা পুরোপুরি অস্ত্র সজ্জিত নয়। এ অবস্থা দেখে তিনি আল্লাহর সামনে দোয়া করার জন্য দু' হাত বাড়িয়ে দিলেন। অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে ও কান্না বিজড়িত স্বরে তিনি দোয়া করতে থাকলেন :

اللهم هذه قريش قد اتت بخيلائها تحاول ان تكذب رسولك ، اللهم
فنصرك الذى وعدتنى ، اللهم ان تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد -

১. উল্লেখ্য, বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে ইতিহাস ও সীরাত লেখকরা যুদ্ধ কাহিনী সংক্রান্ত হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থগুলোয় উদ্ধৃত বর্ণনাসমূহের ওপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু এই বর্ণনাগুলোর বিরাট অংশ কুরআন বিরোধী ও অনির্ভরযোগ্য। শুধুমাত্র ঈমানের কারণেই আমরা বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত কুরআনী বর্ণনাকে সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতে বাধ্য হই না বরং ঐতিহাসিক দিক দিয়েও যদি আজ এ যুদ্ধ সংক্রান্ত সবচাইতে নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা থেকে থাকে তাহলে তা হচ্ছে এ সূরা আনফাল। কারণ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এটি নাযিল হয়েছিল। যুদ্ধে যারা শরীক ছিলেন এবং যুদ্ধের স্বপক্ষের বিপক্ষের সবাই এটি শুনেছিলেন ও পড়েছিলেন। 'নাউযুবিল্লাহ' এর মধ্যে কোন একটি কথাও যদি সত্য ও বাস্তব ঘটনা বিরোধী হতো তাহলে হাজার হাজার লোক এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতো।

"হে আল্লাহ! এই যে কুরাইশরা এসেছে, তাদের সকল ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা নিয়ে তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করতে। হে আল্লাহ! এখন তোমার সেই সাহায্য এসে যাওয়া দরকার, যার ওয়াদা তুমি করেছিলে আমার সাথে। হে আল্লাহ! যদি আজ এ মুষ্টিমেয় দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে এ পৃথিবীতে আর কোথাও তোমার ইবাদাত করার মত কেউ থাকবে না।"

এ যুদ্ধের ময়দানে মক্কার মোহাজিরদের পরীক্ষা ছিল সবচেয়ে কঠিন। তাদের আপন ভাই-চাচা ইত্যাদি তাদের বিরুদ্ধে ময়দানে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারোর বাপ, কারোর ছেলে, কারোর চাচা, কারোর মামা, কারোর ভাই দাঁড়িয়েছিল তার প্রতিপক্ষে। এ যুদ্ধে নিজের কলিজার টুকরার ওপর তরবারি চালাতে হচ্ছিল তাদের। এ ধরনের কঠিন পরীক্ষায় একমাত্র তারাই উত্তীর্ণ হতে পারে যারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে হক ও সত্যের সাথে সম্পর্ক জুড়েছে এবং মিথ্যা ও বাতিলের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে পুরোপুরি উদ্যোগী হয়েছে। ওদিকে আনসারদের পরীক্ষাও কিছু কম ছিল না। এতদিন তারা মুসলমানদেরকে শুধুমাত্র আশ্রয় দিয়ে কুরাইশ ও তাদের সহযোগী গোত্রগুলোর শত্রুতার ঝুঁকি নিয়েছিল। কিন্তু এবার তো তারা ইসলামের সমর্থনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিল। এর মানে ছিল, কয়েক হাজার লোকের একটি জনবসতি সমগ্র আরব দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। এ ধরনের দুঃসাহস একমাত্র তারাই করতে পারে যারা সত্য আদর্শের ওপর ঈমান এনে তার জন্য নিজের
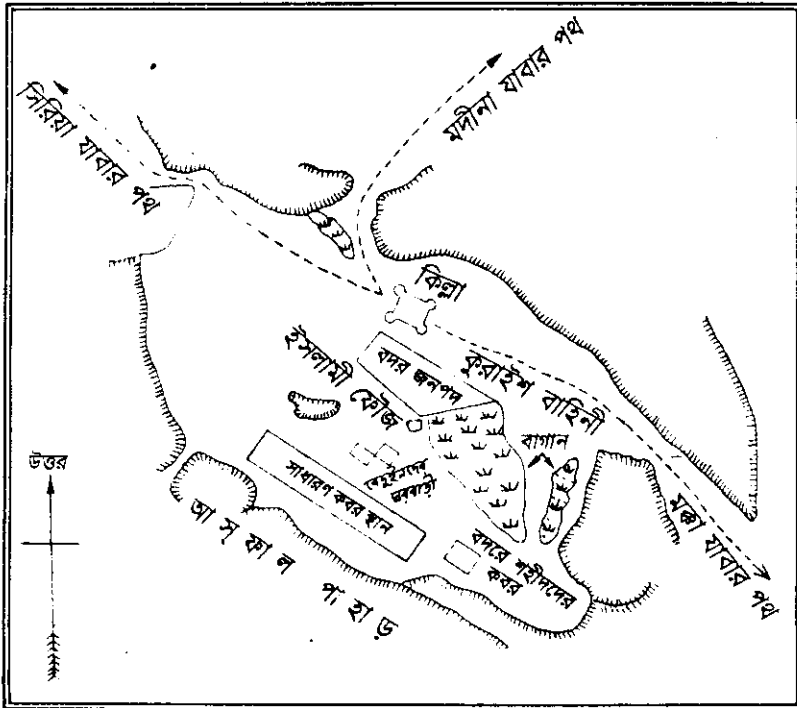
বদর যুদ্ধের মানচিত্র

ব্যক্তিগত স্বার্থকে পুরোপুরি জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হতে পারে। অবশেষে তাদের অবিচল ঈমান ও সত্যনিষ্ঠা আল্লাহর সাহায্যের পুরস্কার লাভে সফল হয়ে গেলো। আর নিজেদের সমস্ত অহংকার ও শক্তির অহমিকা সত্ত্বেও কুরাইশরা এ সহায় সম্বলহীন জানবাজ সৈনিকদের হাতে পরাজিত হয়ে গেলো। তাদের ৭০ জন নিহত হলো, ৭০ জন বন্দী হলো এবং তাদের সাজসরঞ্জামগুলো গনীমাতের সামগ্রী হিসেবে মুসলমানদের দখলে এলো। কুরাইশদের যেসব বড় বড় সরদার তাদের মজলিস গুলজার করে বেড়াতো এবং ইসলাম বিরোধী আন্দোলনে যারা সর্বক্ষণ তৎপর থাকতো তারা এ যুদ্ধে নিহত হলো। এ চূড়ান্ত বিজয় আরবে ইসলামকে একটি উল্লেখযোগ্য শক্তিতে পরিণত করলো। একজন পাশ্চাত্য গবেষক লিখেছেন, "বদর যুদ্ধের আগে ইসলাম ছিল শুধুমাত্র একটি ধর্ম ও রাষ্ট্র। কিন্তু বদর যুদ্ধের পরে তা রাষ্ট্রীয় ধর্মে বরং নিজেই রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গেলো।"

আলোচ্য বিষয়

কুরআনের এ সূরাটিতে এ ঐতিহাসিক যুদ্ধের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার রাজা বাদশাহরা যুদ্ধ জয়ের পর যেভাবে নিজেদের সেনাবাহিনীর পর্যালোচনা করে থাকেন এ পর্যালোচনার ধারাটি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

মুসলমানরা যাতে তাদের নৈতিক ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে, সে উদ্দেশ্যে এখানে সর্বপ্রথম সে সব নৈতিক ত্রুটি নির্দেশ করা হয়েছে। যেগুলো তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান ছিল। তারপর তাদের জানানো হয়েছে, এ বিজয়ে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন কি পরিমাণ ছিল। এর ফলে তারা নিজেদের সাহসিকতা ও শৌর্য–বীর্যের মিথ্যা গরীমায় স্ফীত না হয়ে বরং এ থেকে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

এরপর যে নৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলমানদের হক ও বাতিলের এ সংঘাত সৃষ্টি করতে হবে তা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। এই সংগে এ সংঘাতে যেসব নৈতিক গুণের সাহায্যে তারা সাফল্য লাভ করতে পারে সেগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তারপর মুনাফিক, মুশরিক ও ইহুদিদের এবং এ যুদ্ধে বন্দী অবস্থায় আনীত লোকদের সম্বোধন করে অত্যন্ত শিক্ষণীয় বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

অতপর যুদ্ধের ফলে যেসব সম্পদ দখলে এসেছিল সেগুলো সম্পর্কে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেগুলোকে যেন তারা নিজেদের নয় বরং আল্লাহর সম্পদ মনে করে আল্লাহ তার মধ্য থেকে তাদের জন্য যতটুকু অংশ নির্ধারিত করেছেন ঠিক ততটুকুই যেন তারা কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করে নেয় এবং আল্লাহ নিজের কাজের জন্য এবং নিজের গরীব বান্দাদের সাহায্য করার জন্য যতটুকু অংশ নির্দিষ্ট করেছেন সন্তোষ ও আগ্রহ সহকারে যেন তা মেনে নেয়।

এরপর যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কে কতিপয় নৈতিক বিধান দেয়া হয়েছে। ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে এগুলো ছিল একান্ত জরুরী। এর মাধ্যমে নিজেদের যুদ্ধ বিগ্রহ ও সন্ধির ক্ষেত্রে মুসলমানরা জাহেলী পদ্ধতি থেকে দূরে থাকতে পারবে এবং দুনিয়ার ওপর তাদের নৈতিক

শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সংগে সারা দুনিয়াবাসী একথা জানতে সক্ষম হবে যে, ইসলাম তার আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকেই নৈতিকতার ওপর বাস্তব জীবনের ভিত্ কায়েম করার যে দাওয়াত দিয়ে আসছে তার নিজের বাস্তব জীবনেই সে যথার্থই তা কার্যকর করেছে।

সবশেষে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইনের কতিপয় ধারা বর্ণনা করা হয়েছে এতে দারুল ইসলামের মুসলমান অধিবাসীদের আইনগত মর্যাদা দারুল ইসলামের সীমানার বাইরে অবস্থানকারী মুসলমানদের থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে।